কবিশেখর কালিদাস রায়
সঙ্গ ও প্রসঙ্গ

—ঃ সম্পাদকমণ্ডলী ঃ—

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য ডঃ প্রদ্যোৎ ঘোষ

ঃ পরিবেশক ঃ

দে বুক স্টোর

১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কলিকাতা-৭৩

এন. ভট্টাচার্য এণ্ড কোং
১৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯
সৌজন্যে প্রকাশিত

প্রকাশক :

শ্রী কবিরঞ্জন রায় ও শ্রী কবিকঙ্কণ রায়
কবিশেখর কালিদাস রায় স্মৃতিরক্ষা কমিটি
১০।১৩, চারু এভিনিউ, কলিকাতা-৭০০০৩৩
ফোন নং ৪৬-৬২১০

প্রচ্ছদশিল্পী :

শ্রীভূনাথ মুখোপাধ্যায়

প্রথম প্রকাশ
জুন, ১৯৬০

মুদ্রক :

এশিয়ান প্রিন্টার্স
পি, ১২, নিউ সি. আই. টি. রোড
কলিকাতা-৭০০০১৪
ফোন নং ৪৪-২১৪০

তোমার কবিতা বাংলাদেশের মাটির মতই স্নিগ্ধ ও শ্যামল। বাংলাদেশের প্রতি গভীর ভালবাসায় তোমার মনটি কানায় কানায় ভরা—সেই ভালবাসার উচ্ছলিত ধারায় তোমার কাব্যকানন সরস হইয়া কোথাও-বা মেদুর, কোথাও-বা প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। তোমার এই কাব্যগুলি পড়িলে বাংলার ছায়াশীতল নিভৃত আঙিনার ভিতরকার তুলসীমঞ্চ ও মাধবীকুঞ্জ মনে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১১ই কার্ত্তিক, ১৩২৮

প্রস্তাবনা

কবিশেখর কালিদাস রায়ের জীবনান্তের পর তাঁর কর্মজীবন ও সাহিত্যজীবনের পরিচায়ক একখানি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশের প্রয়োজন অনেকেই বিশেষভাবে অনুভব করছিলেন। আলোচ্য সংকলনটি সেই পথে একটি লক্ষণীয় প্রয়াসরূপে গণ্য হবে। এতে বঙ্গভূমির বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সমাজসেবী, শিক্ষাব্রতী ও জননেতাদের লেখনীনিঃসৃত প্রবন্ধ নিবন্ধ, চিঠিপত্র, সমালোচনা এবং অভিমত একত্র সংগৃহীত হয়েছে, আশা করি তা থেকে শিক্ষক, সাহিত্যিক ও সহৃদয় সামাজিক ব্যক্তিরূপে কবিশেখরের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় আহরণের সুযোগ হবে সন্ধিৎসু নরনারীর। এর পৃষ্ঠাগুলি ওলটালেই তাঁরা উপলব্ধি করবেন যে, নিরভিমান, প্রচারবিমুখ উদারচিত্ত কবিশেখর সমাজের সর্বস্তরের বোদ্ধা ও বিদগ্ধ মানুষের কাছে কি পরিমাণ শ্রদ্ধেয় এবং সম্মানার্হ ছিলেন, তাঁর পাণ্ডিত্য এবং প্রতিভাও কিরূপ বৃহৎ ও কত বিচিত্রমুখে প্রবাহিত ছিল। রবীন্দ্রদর্শনের প্রাণরসে পুষ্ট, অথচ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল এই বহুকলা মানুষটি যে তাঁর জীবৎকালে দেশের কাছ থেকে সমুচিত প্রাপ্য পেয়ে যান নি একথা বিলম্বে হলেও দেশবাসী হৃদয়ঙ্গম করলে, সম্পাদকবর্গের এই উদ্যম সাফল্যমণ্ডিত হবে।

কবিশেখর সম্পর্কিত কয়েকটি রচনা বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও পুস্তক থেকে গৃহীত। এজন্য ঐ সকল পুস্তক ও পত্রিকাগুলির নিকট কমিটি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছেন। এন. ভট্টাচার্য এণ্ড কোং-এর শ্রী ভুবন ভট্টাচার্য এই বইটি প্রকাশে সহায়তা করায় তাঁকেও কমিটি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছেন।

কালিদাস রায় স্মৃতিরক্ষা কমিটি,
১০।১৩, চারু এভিনিউ,
কলিকাতা-৩৩

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

কবিশেখরের ভ্রাতা

রাধেশচন্দ্র রায়

ও

কবিশেখরের সহধর্মিণী

সুকৃতি দেবীর

পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে

সূচীপত্র

কাব্যাঞ্জলি

সাহিত্য প্রসঙ্গ

স্মৃতিচারণ

পত্রাবলী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধুশেখর শাস্ত্রী, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, নজরুল ইসলাম, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ও বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়।



মধ্যবয়সে কবি



যৌবনে কবি



প্রৌঢ়বয়সে কবি

পরিজনসান্নিধ্যে কবি



কবিশেখরের শেষ ছবি

কবিশেখর কালিদাস রায়

কবিরঞ্জন রায় ও কবিকঙ্কণ রায়

কবিশেখর কালিদাস বাংলা বাঙালী পাঠকের কাছে একটি অত্যন্ত পরিচিত নাম। বহুমুখী সারস্বতপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন কবিশেখর। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, পণ্ডিত, ছান্দসিক, সংস্কৃতবেত্তা, বৈয়াকরণ, শিক্ষাবিদ, প্রবন্ধিক, সাহিত্য সমালোচক, বাংলার তথা ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মগ্রাহী ব্যাখ্যাতা। প্রতিটি শিক্ষিত বাঙালী তার কোন-না কোন রচনার সঙ্গে পরিচিত।

বর্ধমান জেলার কাটোয়া থানার অন্তর্গত বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীখণ্ডের নিকটবর্তী কড়ুই গ্রামে এক মধ্যবিত্ত বৈদ্য বৈষ্ণব পরিবারে কবিশেখর ১২৯৬ সালের ৭ই আষাঢ় (১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ২২ই জুলাই তারিখে) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের পূর্বনিবাস ছিল অজয়ের কূলে কোগ্রামে। অজয়ের ভাঙনের জন্য কোগ্রাম থেকে দশ মাইল দূরে কড়ুই গ্রামে এসে রায়মশাইরা বসবাস করেন। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবি লোচনদাস ঠাকুর এই পরিবারেই জন্মগ্রহণ করেন। কবিশেখর লোচনদাস ঠাকুরের অনুজের প্রত্যক্ষ বংশধর। কবির পিতামহী ছিলেন 'পদকল্পতরু' সংকলয়িতা গোকুলানন্দ সেনের পরিবারের কন্যা। কবির মাতামহী ছিলেন টেঞার পদকর্তা উদ্ধবদাসের বংশের কন্যা। শিক্ষাসংস্কৃতিতে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে শ্রীখণ্ড বৈদ্যসমাজের, বিশেষ করে এই প্রাচীন বৈষ্ণব কবিরাজ পরিবারের চিরকালই সবিশেষ সুনাম ছিল।

কবিশেখরের পিতার নাম যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়। মাতার নাম রাজবালা দেবী। যোগেন্দ্রনারায়ণ কাশিমবাজার মহারাজার জমিদারির বিভাগে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। তিনি দানশীলা মহারাণী স্বর্ণময়ীর আমল থেকে শুরু করে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সময় পর্যন্ত রাজপরিবারের সঙ্গে অভিভাবক রূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

কবিশেখর পাঁচ বৎসর বয়স থেকে এগারো বৎসর বয়স পর্যন্ত গ্রামে কাকা কাকীমার কাছে থেকেই লালিত হন এবং মাইনর স্কুলের উচ্চশ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন।

গ্রামের পড়াশুনা শেষ করে ১৯০৭ সালে কাশিমবাজারে এসে বহরমপুরের লণ্ডন মিশনারী সোসাইটি স্কুলে ভর্তি হন। কাশিমবাজারে খাটি গঙ্গা কাটি গঙ্গায় পরিণত হওয়ায় কাশিমবাজারে ম্যালেরিয়ার উপদ্রব হয়েছিল অত্যন্ত বেশী। সেজন্য কবিশেখর ছাত্রজীবনে বৎসরে তিন-চার মাস ম্যালেরিয়ায় ভুগতেন। স্বাস্থ্য খারাপ হওয়া সত্ত্বেও কবিশেখর ছাত্রজীবনে বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। আগাগোড়া সমস্ত পরীক্ষাতেই তিনি প্রথম হয়েছিলেন। ঐ স্কুলে তিনি সরকারী বৃত্তি লাভ করে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। স্কুলে ডঃ এইচ এ স্টারসবার্গ, জেমস হেনরি ব্রাউন, রেভাঃ কে পি মুখার্জী রেভাঃ এ. বি. চাটার্জী ইত্যাদি শিক্ষকের কাছে ইংরেজি ভাষায় শিক্ষালাভের সুযোগ লাভ করেছিলেন।

স্কুলে পড়ার সময়েই কালিদাস পণ্ডিত পশুপতিনাথ শাস্ত্রীর 'আশুতোষ চতুষ্পাঠীতে' সংস্কৃত পড়তে আরম্ভ করেন। পরবর্তীকালে তিনি পণ্ডিত রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থের কাছে বৈষ্ণবশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

কাশিমবাজারের ধ্বংসাবশেষপূর্ণ প্রাচীন ইতিহাসের নানাচিহ্নে লাঞ্ছিত অরণ্য আবেষ্টনীও কবির কাব্যকে প্রভাবান্বিত করেছিল। কাশিমবাজারের অরণ্য প্রকৃতি বর্ধমান জেলার প্রান্তর-বিভ্রান্ত প্রকৃতির ঠিক বিপরীত। দুয়ে মিলে সম্পূর্ণাঙ্গ বাংলা দেশের শস্য শ্যামল প্রকৃতির সঙ্গে কবিশেখরের পূর্ণ পরিচয় ঘটেছিল। কাশিমবাজার অঞ্চলের অজস্র পুষ্প, লতা, গুল্ম, বৃক্ষ এবং বনানী, নদীতীর, খোলামাঠ, প্রভাতে সূর্যোদয়, সন্ধ্যার সূর্যাস্ত, পূর্ণিমা রজনীর জ্যোৎস্না কালিদাসের কবিমনে দোলা দিয়ে যেত। সেই সঙ্গে বর্ধমানের উদার উদাস শস্যক্ষেত্র তাকে উন্মনা করে দিত।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কবিশেখর বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে অধ্যয়ন করেন। এ সময়ে কবির পিতা শহরের উপকণ্ঠ থেকে শহরের ভিতরে এসে বাস করতে থাকেন।

স্কুলে পড়বার সময় থেকেই তিনি কাব্যরচনা অনুশীলন করতে আরম্ভ করেন। কলেজে প্রবেশ করবার আগেই তাঁর কোন-কোন কবিতা সেকালের বিভিন্ন মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯০৬ সালে কংগ্রেসের ভলেন্টিয়ার হয়ে তিনি কলকাতায় আসেন। গুপ্তপ্রেসের সাহিত্যানুরাগী ম্যানেজার চরণদাস ঘরাট আগে থাকতেই কালিদাসের কবিতার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। কালিদাসের অনুরাগে তিনি নিজে থেকেই উৎসাহিত হয়ে তার একখানা কাব্য পুস্তিকা ছাপিয়ে দেন। সত্তরটি কবিতা নিয়ে এই ক্ষুদ্র পুস্তকই 'কুন্দ' নামে প্রকাশিত। বাংলা সাহিত্যে তিনি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের দ্বারাই প্রথম কবি খ্যাতি লাভ করেন। এই গ্রন্থ তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গ করেন এবং কবিগুরুকে একখানি বই পাঠিয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথ তার উত্তরে লিখেছিলেন, 'এগুলি তোমার কাঁচা বয়সের লেখা, এর উপর বেশী নির্ভর করো না। কবিতা রচনায় যদি তোমার অন্তরের অনুরাগ থাকে আপাতত স্তুতিনিন্দার দিকে দৃকপাত না ক'রে সাধনা কর।"

'কুন্দ' কিন্তু সে আমলের দেশের বহু মনীষীর শুভাশীবাদ লাভ করেছিল।

এই 'কুন্দ' পাঠ করে কবিবর দেবেন্দ্রনাথ তার "অপূর্ব নৈবেদ্যে' কবির উদ্দেশে কবিতা লিখে কবিকে উৎসাহিত করেন।

এই 'কুন্দ' উপহার পাঠিয়েই কবিবর নবীনচন্দ্র সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, চন্দ্রনাথ বসু, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অশ্বিনীকুমার দত্ত, রজনীকান্ত সেন প্রমুখ সেকালের সাহিত্যরথীদের আশীর্বাদ তিনি পেয়েছিলেন।

১৯০৭ সালে কাশিমবাজারের রাজবাড়িতে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি ছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেই সম্মেলনে ভলেন্টিয়ার হয়ে কাজ করেন কালিদাস। ইতিহাসের অধ্যাপকের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল। রবীন্দ্রনাথ পরামর্শ দিলেন, একশোটি ইংরেজি কবিতার তর্জমা করে পরে মৌলিক কবিতা লিখবে। কালিদাস মাথা পেতে নিলেন কবিগুরুর উপদেশ। তারপর

কবিগুরুর কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে একনিষ্ঠভাবে কবিতা রচনায় মনোযোগ দিলেন। কবির কলেজের প্রিন্সিপাল রেভারেণ্ড ই. এম. হুইলার কবিকে ইংরেজী কবিতাগুলি নির্বাচিত করে দেন। এই অনুবাদ কার্যের মাধ্যমে কবির প্রকৃত সাহিত্যসাধনার সূত্রপাত।

কলেজে পড়বার সময়ে কবিশেখরের বহু কবিতা প্রবাসী, ভারতী, মানসী, উপাসনা ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এইসময়ে কবি উপাসনা পত্রিকার সম্পাদক এবং 'উদভ্রান্ত প্রেম'-এর লেখক চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, টডের 'রাজস্থানের' বঙ্গানুবাদক যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায়, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রমুখ সাহিত্যরথীর সংস্পর্শে আসেন এবং স্নেহলাভ করেন। কবির সাহিত্য জীবন গঠনে তাঁদের অবদান অবিস্মরণীয়।

১৯১১ সালে কবি ডিষ্টিংশনে বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে বি. এ. পাস করেন। অনার্স পরীক্ষায় ফিলজফিতে ফার্ষ্ট ক্লাশ মার্ক ছিল। কাজেই তিনি ফিলজফিতে এম এ. পড়বার জন্য কলকাতায় এসে ভর্তি হলেন স্কটিশচার্চ কলেজে। কবি এই সময় কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটুটে 'মেরিগোল্ড ক্লাবের' সদস্য হন। এই ক্লাবের সদস্যদের মধ্যে অবিস্মরণীয় ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শিশিরকুমার ভাদুড়ী, নরেশচন্দ্র মিত্র, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডঃ সুশীলকুমার দে এবং অমল হোম। কবির সমগ্র সাহিত্য জীবন তাঁদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে অতিবাহিত। এ সময় থেকেই সমস্ত বিখ্যাত মাসিক পত্রিকায় নিয়মিতভাবে তিনি লিখতে আরম্ভ করেন। ইতিপূর্বে কবি বহরমপুরের পত্রিকা কণিকা এবং উপাসনায় সমানে গদ্য-পদ্য লিখে এসেছেন। প্রবাসী, ভারতী, মানসীতেও প্রতিমাসেই তাঁর নবনব কবিতার আবির্ভাব ঘটতে থাকল। ইতিমধ্যে সমগ্র বঙ্গে তাঁর কবিখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

এ সময় বাছা বাছা সংস্কৃত শ্লোকের মত এপিগ্রামাটিক কবিতা রচনা শুরু করেন। শ্লোকের মত ছোট ছোট কবিতাগুলি নিয়ে ১৯১১ সনে 'কিশলয়' নামে পুস্তক প্রকাশিত হয়। এটিই তাঁর দ্বিতীয় কাব্যপুস্তক। রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র এর ভূমিকা লেখেন। পরে ১৯১৩ সালে 'কুন্দ' ও 'কিশলয়ে'র অধিকাংশ কবিতা একত্রে 'বল্লরী' নামে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকটি কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের 'মেরি গোল্ড ক্লাবের' বন্ধুগণের নামে উৎসর্গ করেন।

১৯১২ সালে ফাল্গুন মাসে ডাল্টনগঞ্জের ডিষ্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ার ভূপেন্দ্রচন্দ্র মল্লিকের কন্যা শ্রীমতী সুরুচি দেবীর সঙ্গে কবির বিবাহ হয়। ভূপেন্দ্রচন্দ্রের ভ্রাতা হাইকোর্টের জজ নগেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক বিলাতফেরত আই. সি এস. ছিলেন। এই কারণে পশ্চিমবঙ্গের বৈদ্যসমাজের এক অংশ এই বিয়েতে যোগদান করেন নি। তাদের মধ্যে কবির অনেক নিকট আত্মীয়ও ছিলেন। বৌভাতের পরদিনই কবির মাতা রাজবালা দেবীর মৃত্যু হয়। এই মৃত্যু উপলক্ষে শ্মশানে শবানুগমন, পারলৌকিক কার্যাদি ব্যাপারে পল্লীগ্রামের সেই সামাজিক গণ্ডগোলের অবসান ঘটল।

কংগ্রেস নেতা ব্যবহারজীবী রায় বাহাদুর বৈকুণ্ঠনাথ সেনের জামাতা হরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় কাশিম-বাজার রাজএষ্টেটের বাহারবন্দ পরগনার ম্যানেজার হয়ে রংপুরে ছিলেন। তাঁর আহ্বানে কবি হঠাৎ অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়া ছেড়ে এ্যাসিষ্ট্যান্ট হেডমাষ্টার পদে রংপুর জেলার উলিপুর গ্রামে মহারাণী স্বর্ণময়ী স্কুলে মাসিক ৭৫ টাকা মাইনেতে যোগদান করেন। রংপুরের ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট হঠাৎ একদিন তাঁর কবিখ্যাতির কথা শুনে এসে তাঁর সঙ্গে অযাচিতভাবে আলাপ করলেন, নিজে তাঁর কবিতার ইংরেজি অনুবাদ করলেন। তাঁর সুপারিসে তিনি হেডমাষ্টার পদে নিযুক্ত হন। মাইনে হল ১০০ টাকা। খরচ ছিল খুব কমই। ওখানকার লোন অফিসে টাকা জমতে থাকে। একদিন সেই ব্যাঙ্ক ফেল করল।

উলিপুরে কবির স্বাস্থ্য ভাল হয়ে গেল। জীবনের সবচেয়ে সুস্থ দেহমনের দিনগুলি সেখানেই তাঁর কেটেছে। আর লেখাও অবিশ্রান্ত গতিতে চলেছে। ১৯১৪ সালে কবির বন্ধুদের উৎসাহে, প্রয়াসে ও অর্থসাহায্যে 'পর্ণপুট' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। এই পর্ণপুটেই কবিশেখর কবিখ্যাতি লাভ করেন। এই পুস্তক এখন বিস্মৃতপ্রায়। এই গ্রন্থের পল্লীকবিতা ও ব্রজকবিতা-গুলি সকলের চিত্তাকর্ষণ করে। এরপর তিনি ১৯১৫ সালে 'ব্রজবেণু' নামে ব্রজ কবিতার একখানি সংকলন বার করেন। ১৯১৬ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'ঋতুমঙ্গল'—প্রধানত প্রকৃতি প্রেমাত্মক কবিতার সংগ্রহ। এই কবিতাগুলিতে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব খুবই প্রবল। ব্রজবেণু প্রকাশের পর কবিশেখর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও মহারাজ জগদিন্দ্রনাথের স্নেহদৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ তার কাব্যশিষ্য পরিমণ্ডলীতে কবিশেখরকে সাদরে গ্রহণ করেছেন। ব্রজবেণু ও পর্ণপুট পাঠে কবিগুরু কবিশেখরের কবিতা সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন . —"তোমার কবিতা বাংলা দেশের মাটির মতোই স্নিগ্ধ ও শ্যামল। বাংলা দেশের প্রতি গভীর ভালবাসায় তোমার প্রতিটি কানায় কানায় ভরা—সেই ভালবাসার উচ্ছলিত ধারায় তোমার কাব্যকানন সরস হইয়া কোথাও বা মেদুর, কোথাও বা প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। তোমার এই কাব্যগুলি পড়িলে বাংলার ছায়াশীতল নিভৃত আঙিনার ভিতরকার তুলসীমঞ্চ [illegible] মনে পড়ে।"

উলিপুরে বাস করার সময়ে ১৯২০ সালে [illegible] সাহিত্য পরিষদ (রংপুর শাখা) কবিকে কবিশেখর উপাধি দান করেন এবং সেসময় থেকে তিনি ঐ নামেই সর্বত্র পরিচিত হয়ে আসছেন। আজ সেই প্রতিষ্ঠান অবলুপ্ত কিন্তু কবিশেখর তার পরিচয় বহন করে চলেছেন।

কাব্যসাধনার সুবিধার জন্য ড. দীনেশচন্দ্র সেনের অনুরোধে ১৯২০ সালে কলিকাতার দক্ষিণে বড়িষা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষকরূপে তিনি চলে আসেন। কলকাতায় তখন তাকে ঘিরে এক সাহিত্য রসচক্র গড়ে উঠেছে। কবি শ্যামাপ্রসাদের অনুরোধে নানাদিক চিন্তা করে বড়িশা ছেড়ে মিত্রতে যোগদান করলেন ১৯৩১ সালে। দীর্ঘ চল্লিশ বছরের শিক্ষকতা জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করেন ১৯৫২ সালে। শিক্ষকরূপে তাঁর অবদানের সাক্ষ্য সারাদেশের অসংখ্য কৃতবিদ্য ছাত্র। আর শিক্ষাব্রতীরূপে তাঁর অবদানের নিদর্শন বহু পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধাদি।

শিক্ষকতা করতে গিয়ে প্রথম যে বৃহৎ অসুবিধার সম্মুখীন হন, তা হচ্ছে উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তকের অভাব। কবিশেখর নিজেই এবার পাঠ্যপুস্তক রচনায় হাত দিলেন এবং অসামান্য সাফল্য অর্জন করলেন। বাংলা সাহিত্য, ব্যাকরণ, রচনা, দ্রুতপাঠ্য সাহিত্য ইত্যাদি বহুবিধ পুস্তকপুস্তিকা তিনি রচনা ও সম্পাদনা করেছেন।

কবিশেখর শিক্ষাবিভাগের সঙ্গে নানাভাবে জড়িত ছিলেন। কলিকাতা, ঢাকা, বিশ্বভারতী, বর্ধমান এবং পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় পরীক্ষক হয়েছেন ও প্রশ্নপত্র রচনা করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. ও বি. এ. (পাশ ও অনার্স) পরীক্ষায় ১৮ বছর ধরে প্রশ্নপত্র রচনা করেছেন। তাছাড়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বোর্ড অব সেকেণ্ডারি এডুকেশনে নানা দায়িত্বপূর্ণ কাজেও

বহুবৎসর ধরে নিযুক্ত ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাট্রিকুলেশন ও ইন্টারমিডিয়েটের বাংলা ব্যাকরণের পাঠ্যসূচি রচনার জন্য অন্যতম মেম্বার মনোনীত হন এবং ম্যাট্রিক ও ইন্টারমিডিয়েট বাংলা সিলেকসন কমিটির অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হন। পরে বোর্ড অব সেকেণ্ডারি এডুকেশনের বাংলা সিলেবাস কমিটির চেয়ারম্যানও হন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার অধ্যাপকের পদের জন্য কবিশেখরের কথা একসময়ে চিন্তা করা হয়। কবিশেখরের জন্য নির্বাচনী সমিতির ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ অন্যান্য সকল সদস্যের সুপারিশ থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত কবি মোহিতলাল মজুমদারই সেই পদে নিযুক্ত হন। 'ঢাকার কথা'র লেখক কন্ট্রাকটর জিতেন্দ্রনাথ মজুমদারের আগ্রহে চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় এবং কবি গৃহিণীর উৎসাহে ও অনুপ্রেরণায় বর্তমান চারু এভিন্যু, টালিগঞ্জে 'সন্ধ্যার কুলায়', প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩৮ সালে।

কলকাতা আসার পর তাঁর পরপর কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় যথা—পর্ণপুট (২য়), ক্ষুদকুঁড়া, লাজাঞ্জলি, চিত্রচিতা, আহরণী, হৈমন্তী, বৈকালী, আহরণ, সন্ধ্যামণি, গাথাঞ্জলি, শ্রেষ্ঠ কবিতা, গাথাকাহিনী, পূর্ণাহুতি, তৃণদল, গাথামঞ্জরী ইত্যাদি। কৌতুকরসের কবিতাগুলি নিয়ে রসকদম্ব ও দন্তরুচি কৌমুদী নামে দুখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

প্রমথ চৌধুরী, দীনেশচন্দ্র সেন, বিজয়চন্দ্র মজুমদার ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সাহিত্যরথীদের উৎসাহে কবিশেখর গদ্যপ্রবন্ধ রচনা করতে আরম্ভ করেন। ১৯২১ সালে 'বঙ্গবাণী' পত্রিকা প্রকাশ হ'লে তিনি তাতে নিয়মিত প্রবন্ধ প্রকাশ করতে শুরু করেন। তারপর থেকে তিনি অজস্র গদ্য প্রবন্ধ ও ভাষাতত্ত্ব নিবন্ধ রচনা করেছেন। গদ্যসাহিত্য, বিশেষত সমালোচনা সাহিত্যরচনায় ও নানা শ্রেণীর প্রবন্ধরচনায় তিনি যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর সমালোচনা সাহিত্য গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য :—সাহিত্য প্রসঙ্গ ম ও ২য়, প্রাচীনবঙ্গ সাহিত্য ম, ২য় ও ৩য়, পদাবলী সাহিত্য, বঙ্গসাহিত্য পরিচয় ১ম, ২য়, ৩য়, শরৎসাহিত্য ১ম ও ২য়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কবিতা ও গান।

সুনীতিকুমার ও শিশিরকুমারের উৎসাহে কবি সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদও শুরু করেন। চিত্রে গীতগোবিন্দ, কাব্যে শকুন্তলা, কুমারসম্ভব, গীতালহরী, ইন্দুমতী, মেঘদূত, ব্রজবাঁশরী কবির কাব্যানুবাদের নিদর্শন। এই ক্ষেত্রে বৈদিক দেবতাগণকে আশ্রয় করে তাঁদের লীলামাহাত্ম্যের নূতন ব্যাখ্যা দিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির নানাভাবে বাণীরূপ দান করেন। তাছাড়া গঙ্গা, হিমালয়, তুলসী ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে ভারতীয় সংস্কৃতির সর্ব্বাঙ্গীণ পরিচয় দেন ছন্দে। প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যেরও নূতন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এই সকল কবিতায়। এগুলি ছাড়া তিনি অন্যান্য সংস্কৃত কাব্যনাট্যের বৈদিক সূক্ত ও উপনিষদের কোন কোন অংশের অনুবাদ করেছেন।

শতাধিক ইংরেজী কবিতা এবং বহু আরবী ও ফারসী কবিতাও তিনি অনুবাদ করেছেন। রামায়ণ, মহাভারত, অন্যান্য পুরাণ, বৌদ্ধজাতক, কথাসরিৎসাগর, বৃহৎকথা, রাজতরঙ্গিনী, পঞ্চতন্ত্র, বেতাল পঞ্চবিংশতি ইত্যাদি প্রাচীন কথাসাহিত্যের পুস্তক অবলম্বনে তিনি বহু কাহিনীও রচনা করেছেন।

শিশুসাহিত্যেও কবিশেখরের অবদান কম নয়। তাঁর রচিত শিশুসাহিত্যপুস্তকগুলির মধ্যে কুরুরাজ, লঙ্কেশ্বর, গল্পমালিকা, কথামালিকা, ভক্তের ভগবান, ভক্তমালিকা, জাতকের গল্প, জাতক কাহিনী, জাতক মালিকা, পুরাণ কাহিনী, গল্পকাহিনী, গল্পমালা, তৃণদল ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। বঙ্গসাহিত্যে গাথামূলক কাহিনী অবলম্বনে এক নতুন ধরনের কাব্যধারার তিনিই পথপ্রদর্শক। তাঁর গাথাঞ্জলি, গাথামঞ্জরী, গাথাকাহিনী প্রভৃতি পুস্তকগুলি শিশু ও কিশোরদের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত। এপিগ্রামাটিক কবিতা রচনায় তাঁর সমকক্ষ বোধহয় কেউ নেই। বাংলাদেশে শিশুপাঠ্য এমন গ্রন্থ বোধহয় পাওয়া যাবে না যাতে কবিশেখরের কোন-না-কোনো রচনা গৃহীত হয়নি।

কবিশেখর অগণিত প্রশস্তিমূলক কবিতাও লিখেছেন। সেগুলির মধ্যে ভারত বন্দনা, আদিত্য-মঙ্গল, পরমহংস, বিবেকানন্দ, রামপ্রসাদ, বুদ্ধদেব, জয়দেব, কৃত্তিবাস, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, ব্রাউনিং, শেলী, বৈশ্বানর বরুণ, সোম, হিমাদ্রি ইত্যাদির নাম করা যায়। 'মনীষী বন্দনা' তাঁর প্রশস্তিমূলক কবিতার সংকলন গ্রন্থ। গীতরচনাতেও কবিশেখর নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। তার বিখ্যাত গান—'নন্দপুরচন্দ্রবিনা বৃন্দাবন অন্ধকার' সেকালে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তাঁর গানগুলির একটি সংকলন প্রকাশের অপেক্ষায় আছে।

কবিশেখরের কবিতার বিষয়বস্তুও বিচিত্র। এগুলির বিস্তৃতিও অশেষ, যেমন — (১) বাংলার পল্লীজীবন, (২) ব্রজলীলা, (৩) বৈদিক ও বৌদ্ধযুগের ভারতীয় সংস্কৃতি, (৪) পৌরাণিক উপাখ্যান, (৫) মুসলমানী সাহিত্যের ভাবচিন্তা, (৬) প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের রসবস্তু, (৭) সংস্কৃত সাহিত্যের রসবস্তু, (৮) বাঙালীর সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবন, (৯) ধর্ম, (১০) ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, ১১) প্রেম, মাতৃস্নেহ ও গার্হস্থ্য মাধুর্য।

কবিশেখর ছিলেন সংস্কৃত ব্যাকরণশাস্ত্রের একজন বিশেষজ্ঞ। ব্যাকরণ ও অলঙ্কারশাস্ত্রে যথেষ্ট জ্ঞান ছিল বলে কবিশেখর উচ্চমানের গদ্যরীতি আয়ত্ত করেছিলেন। তাঁর রচিত 'রচনাদর্শ' ও রচনাদর্শিকা বিখ্যাত পুস্তক। তাঁর রচনাদর্শ সম্পর্কে শরৎচন্দ্র যে মন্তব্য করেছিলেন তা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন :-

"শ্রীমান কালিদাস রায় আজ বাইশ বছর শিক্ষকতা করিতেছেন এবং দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরব্যাপী সাহিত্যসেবা করিয়া আসিয়াছেন; বাঙ্গালা ভাষা রচনায় ছাত্রগণকে আদর্শরীতি শিক্ষা দেওয়ার অধিকার তাঁহার যতখানি আছে বলিয়া জানি, তাহা কম লোকেরই দেখিয়াছি। এত বড় কথাটা অকপটে বিশ্বাস করি বলিয়াই লিখিতে পারিলাম, না হইলে পারিতাম না, বলিতে নিজেরই লজ্জা করিত। তাঁহার এই রচনার বইখানি আমি আদ্যোপান্ত মনোযোগের সহিত, শ্রদ্ধার সহিত পড়িয়াছি এবং উপকৃত হইয়াছি। যে কেহ বাঙ্গালা ভাষা বিশুদ্ধ ও সরস করিয়া লিখিতে চাহেন, তাঁহাকেই পড়িতে অনুরোধ করি। পড়া ব্যর্থ হইবে না।"

সংস্কৃতরসশাস্ত্রেও কবির অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁর পিতার কাছ থেকেই তিনি সংস্কৃত কাব্যপ্রীতি লাভ করেছিলেন।

শেষ বয়সে কবি রম্যরচনার আকারে লঘুসাহিত্যের প্রবন্ধ ও কথিকা শ্রেণীর গল্প লেখায়

মনোনিবেশ করেন। এগুলি পাঠকসাধারণের অকুণ্ঠিত সমাদর লাভ করেছে। এগুলির রচনাশৈলী কবির সম্পূর্ণ নিজস্ব। এগুলি কতকটা নাটকীয়, কতকটা গল্পধর্মীয়, কতকটা প্রবন্ধধর্মীয় ও কতকটা কৌতুকরসাশ্রিত। এসব রচনার মূল কবিশেখরের কবিতাতেও আছে। হাস্যরস, ব্যঙ্গরস, সামাজিক ও সাংসারিক অভিজ্ঞতার চিত্র এসব রচনায় প্রকাশ পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'চনক সংহিতা', 'রঙ্গচিত্র', 'চালচিত্র' প্রভৃতি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। এই জাতীয় অসংখ্য লেখা পুস্তকাকারে এখনও প্রকাশিত হয়নি।

কাব্যসমালোচক হিসাবে কবিশেখরের স্থান প্রথম সারিতে। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের রস বিশ্লেষণ তাঁর মত আর কেউ করেছেন বলে আমরা জানি না। ভারতীয় সংস্কৃতি ও বাংলার নিজস্ব সাহিত্য ও চিরাচরিত জীবনযাত্রার সঙ্গে বর্তমান যুগের পাঠকদের পরিচয় অতি ক্ষীণ, বোধহয় সেজন্যই কবিশেখরের কবিতার যথাযোগ্য আদর আজও হয়নি। কারণ, তিনি ছিলেন এই দুই-এর প্রাণরসে উচ্ছল ও অভিষিক্ত।

কবিশেখর অত্যন্ত মজলিসী রসিক ও হৃদয়বান ব্যক্তি ছিলেন। সামাজিকতা ও সহৃদয়তার জন্য তিনি সকলের শ্রদ্ধেয় ছিলেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও বিভিন্ন জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর অন্তরের যোগ ছিল। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তিনি বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। একসময়ে 'বসুধারা' নামক একটি পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি নিজে প্রাচীন ও নবীনদের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষার জন্য 'রসচক্র সাহিত্য সংসদ' নামে একটি সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন রসচক্রের অন্যতম কর্ণধার। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল। এখনকার আমলের সকল প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকই তখন তরুণবয়স্ক সাহিত্যব্রতী ছিলেন। তাঁরা অনেকেই রসচক্রে আসতেন। কবির জীবনে এটি একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। কবিকে জানতে হলে এই অধ্যায়ের সঙ্গে বিশেষরূপে পরিচিত হতে হবে। তাঁর সম্পাদিত প্রসিদ্ধ বারোয়ারী উপন্যাস 'রসচক্র' শরৎচন্দ্রই সূত্রপাত করেছিলেন। এ ছাড়া 'অষ্টরম্ভা' নামক একটি গল্পগ্রন্থও তাঁর সম্পাদনায় রসচক্র সাহিত্য সংসদ থেকে প্রকাশিত হয়। করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুমুদরঞ্জন মল্লিকের কাব্য সংকলনের সম্পাদনা তিনিই করেছিলেন।

সাহিত্যসৃষ্টিই শুধু নয়, সাহিত্য পরিবেশ সৃজনই ছিল তাঁর জীবনের অন্যতম ব্রত। নবীন সাহিত্যিকরা চিরকালই তাঁর উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে এসেছেন। পল্লীগ্রামের দূর-দূরান্ত থেকে আগত কবিযশোপ্রার্থীদের জন্য তাঁর দ্বার ছিল উন্মুক্ত।

কবির শেষজীবনে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার কাহিনী "শরৎ সান্নিধ্যে" প্রকাশিত হয়েছে। কবিশেখরের আত্মজীবনী সমেত অসংখ্য গ্রন্থ পাণ্ডুলিপি অবস্থায় পড়ে আছে। কবির অপ্রকাশিত কবিতা, রচনাসংগ্রহ ছন্দ, অলঙ্কার, সাহিত্যাদর্শ, ধর্ম, সমাজতত্ত্ব, শিক্ষা, ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কীয় প্রবন্ধগুলির নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও গ্রন্থাকারে আজও প্রকাশিত হয়নি। অবিলম্বে এগুলি প্রকাশের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

দেশবাসীর কাছ থেকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কবিশেখর জীবনে বহুবিধ সম্মান লাভ করেছেন। কাব্যচর্চার প্রথম যুগেই তিনি "কবিশেখর" উপাধি পান। ১৯৪৭ সালে গদ্য সাহিত্য রচনায়

কৃতিত্বের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কবিশেখর 'লীলা লেকচারার' পদে বৃত হন। লীলা লেকচারে প্রদত্ত প্রবন্ধগুলি 'পদাবলী সাহিত্য' নামে পুস্তকে প্রকাশিত হয়। ১৯৫৩ সালে সাহিত্য ও কাব্যে শ্রেষ্ঠ কীর্তির জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' দান করেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম এই পদকে বিভূষিত হয়েছিলেন। ১৯৫৯ সালে অল ইণ্ডিয়া রেডিও কর্তৃক দিল্লীতে আয়োজিত কবি সম্মেলনে কালিদাস রায় বাংলার প্রতিনিধি কবি রূপে যোগদান করেন। ১৯৬১ সালে কলিকাতায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে কবিশেখর মূল সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সাহিত্যসেবীদের মধ্যে কবিশেখরই সর্ব প্রথম এই সম্মান লাভ করেন। কবিশেখর ১৯৬১ সালে আরো দুটি ঐতিহ্যমণ্ডিত সাহিত্য সংস্থা কর্তৃক সংবর্ধিত হন। তার মধ্যে একটি কলকাতার অন্ধ্র সাহিত্য সমিতি এবং অপরটি গঙ্গাটিকুরিতে (বর্ধমান) অনুষ্ঠিত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানে। ১৯৬০ সালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে মৌলিক গবেষণার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'সরোজিনী স্বর্ণপদক' দিয়ে সম্মানিত করেন। ১৯৬৩ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আহুত হয়ে তিনি নবীনচন্দ্র সেন স্মৃতি বক্তৃতার উদ্বোধনী বক্তৃতামালা প্রদান করেন ১৯৬৩ সালে আনন্দবাজার পত্রিকা সে বৎসরের শ্রেষ্ঠ লেখকরূপে তাঁকে "আনন্দ পুরস্কার" দিয়ে সম্মানিত করেন। ১৯৬৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক "ডি. এল. রায় লেকচার" দেবার-জন্য আমন্ত্রিত হন। ডি. এল. রায় লেকচারে প্রদত্ত প্রবন্ধগুলি নিয়ে 'দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কবিতা ও গান' নামে পুস্তক প্রকাশিত হয়। ১৯৬৮ সালে কবিশেখর তাঁর 'পূর্ণাহুতি' কাব্যগ্রন্থের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত রবীন্দ্রস্মৃতি পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৭০ সালে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর সারাজীবনের সাহিত্যকৃতির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সম্মান 'দেশিকোত্তম' উপাধিতে সম্মানিত করেন। ১৯৭২ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি. লিট উপাধি দেন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে ১৯৭৬ সালে মরণোত্তর ডি. লিট উপাধি দেওয়া হয়।

১৯৬৮ সালে জানুয়ারী মাসে কবিশেখরের স্ত্রীবিয়োগের পর তাঁর স্বাস্থ্যের বিশেষ অবনতি হয়। তাছাড়া শেষ জীবনে ভুল অস্ত্রোপচারের ফলে কবিশেখর দৃষ্টিশক্তি হারান, পরে আংশিক দৃষ্টিশক্তি ফিরে এলেও শরীর আর সেরে ওঠে নি। শেষের কয়েক বছর তিনি মুখে মুখে বলে লেখাতেন। ১৯৭৫ সালে ২৫শে অক্টোবর (৭ই কার্তিক ১৩৮২) সন্ধ্যার কুলায় বাসভবনে কবি পরলোকগমন করেন তাঁর চার পুত্র ভবভূতি, জয়দেব, কবিরঞ্জন ও কবিকঙ্কণ এবং তিন কন্যা কবিতা, সঙ্গীতা ও রঞ্জিতা বর্তমান। সঙ্গীতার সঙ্গে কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মধ্যম পুত্রের বিবাহ হয়।

—::—

কবি কালিদাস

নবীন চন্দ্র সেন

পর্ণপুটে স্বর্ণপুটে কবি বিতরণ,
হে কবি, সার্থক হোক তোমার জীবন।
জননীর বক্ষ হতে স্তন্যসুধা হরি
অর্ঘ্য তব ওগো কবি উঠিতেছে ভরি,
অক্ষয় অব্যয় হোক ভাণ্ডার তোমার,
হে বাণীর বরপুত্র লহ নমস্কার।

কোন্ অতীতের যুগে যমুনা পুলিনে
উঠেছিল বংশীরব কোন্ শুভদিনে।
ছিনু, বহুদিন ভুলি নিদ্রায় মগন
তুমি জাগাইলে কবি করুণ বেদন।
অতীতের চিতাভস্ম করি অপসার,
দীনা পল্লীভূমি পানে চাহ একবার।

ঐ দীর্ঘ অট্টালিকা মানব বিরল;
সহস্র শ্বাপদপূর্ণ ঐ বনস্থল,
লতা গুল্ম পরিবৃত ঐ জলাশয়,
ধূপভস্ম শুষ্ক পুষ্প ঐ দেবালয়,
ঐ তব জন্মভূমি দীনা কাঙালিনী
বক্ষে ধরি যুগান্তের নীরব কাহিনী
চাহিছে তোমার দান হে কবি তোমার
মুক্ত করো মুক্ত করো অক্ষয় ভাণ্ডার।

কবি কালিদাস রায়ের প্রতি

দেবেন্দ্রনাথ সেন

তোমার সৌন্দর্যকুঞ্জে-যত বার পশি আমি, কবি !
হেরি তথা শোভা নব নব !—
গলাগলি করি তথা হাসে চাঁদ আর বালরবি !
অফুরন্ত ফুলের বৈভব !
দোয়েলের, কোকিলের কলরব অফুরন্ত মরি,
অফুরন্ত ময়ূর-নাচন !
যাদুকর, এগো কোন্ মায়াপুরী ! দিবা বিভাবরী,
অফুরন্ত আনন্দ-স্বপন ॥

তোমার কবিতারাণী মরি মরি অনিন্দ্যসুন্দরী,
মূর্তিমতী উষারাণীসমা !
প্রভাত-পবন-স্পর্শে অঞ্চল কাঁপিছে থরথরি,
লাল চেলী একি নিরুপমা !
পদ্মগন্ধ ভুরভুর মুখে ছোটে !—সীমন্তে সিন্দুর,
প্রাণচোরা, গালভরা হাসি !
শিশির-মুকুতা-হার কণ্ঠে দোলে ! মধুর, মধুর,
একি শোভা !—লাবণ্যের রাশি !

তোমার কবিতারাণী মরি মরি অনিন্দ্যসুন্দরী,
মূর্তিমতী শারদী-শর্বরী !
রূপবন্যা জ্যোৎস্না-সম উছলিছে ! বিশ্ব আলো করি
তরঙ্গিছে ভাবের লহরী !
ভুরভুর মুখে ছোটে, আহা মরি, চিত্ত-বিমোহন
শেফালীর দুরন্ত সৌরভ !
অরসিক কি বুঝিবে ? বোঝে শুধু রসিক সুজন,
পৌর্ণমাসী নিশির গৌরব ॥

---

*কবিশেখরের 'কুন্দ' কাব্যগ্রন্থ পাঠে

আশীর্ব্বাণী

করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

কবিশেখর, পর'গো তব প্রাপ্য ফুলহার,
বাণীর বরে পাইলে তুমি এ প্রীতি-উপহার।
দূর প্রবাসে যেখানে যাই
নামটি তব শুনিতে পাই,
অপরিচিত ভক্তচিত করেছ অধিকার।

ভাগ্যবান্ কবির মন পেয়েছো তুমি ভাই,
জীবনে আর যার চে' বড় অভিলষিত নাই।
রাজায় যারা পূজার ভেরী
সত্য-শিব-সুন্দরেরি,
পঁহুছে তারা অমৃতেরি সে ধারা-গিরির ঠাঁই।

রসের পরিবেশনে তুমি প্রথম-যৌবনে
শোনাতে মোরে তোমার লেখা, সেকথা আছে মনে;
গরবী হ'য়ে আদর-ভরে
দাদার মত জড়ায়ে ধ'রে
অন্তরেরি মুরতি তব দেখেছি স্মৃলগনে।

ভরিলে চারু কবিতা-রসে রুচিরা বল্লরী
পুরানো ভোলা স্মৃতির দোলা কাঁপে গো থরথরি';
খুলিয়া তব 'পর্ণপুটে'
স্বর্ণ-রেণু ভরেছি মুঠে,—
বাঁশীটি তব ঝঙ্কারিত ললিত সুরে ভরি'।

স্বপনে যাহা গোপনে ছিল, মিটিল সেই সাধ
আহ্লাদিত করেছে চিত এ' শুভ সংবাদ,
বস'গো এসে' হে সম্মানী,
পেতেছি মান-আসনখানি,
সর্ব্ব-সুখী হওগো ভ্রাতঃ করি আশীর্ব্বাদ।

আশীর্ব্বাদ

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

দাদা বলে' ডেকেছিলে-সে যখন প্রথম যৌবন ;
সাহিত্যের তীর্থ পথে সবেমাত্র যাত্রা আয়োজন
যেদিন করেছি শুরু। পথের পাথেয় কিছু নাই ;
সহযাত্রী বন্ধুদলে সতীর্থ-সন্ধান যেন চাই
একান্ত আত্মীয়রূপে, হেনকালে তুমি এলে সাথে
অগ্রজসম্ভাবী মুখে, শ্রদ্ধাদৃষ্টি নম্র আঁখি পাতে,
ললাটে জ্ঞানের দীপ্তি, অধ্যয়ন-যজ্ঞ করি' শেষ ;
'আমি তব সঙ্গী হব'—শ্রদ্ধাভরে চাহিলে নির্দ্দেশ !
আশায় ভরিল চিত্ত, উৎসাহে উঠিল মাতি প্রাণ,
চলিনু যুগল-যাত্রী দূরে শুনি বাণীর আহ্বান।

তারপরে দীর্ঘদিন একত্র চলেছি দুইজনে,
বাহুপাশে বাহু বাঁধি' আশা-নিরাশায় সংবেদনে
বাণীর মন্দির পানে নিশিদিন লক্ষ্য শুধু রাখি,
কভু বাষ্পাকুল নেত্র, কভু উদ্দীপনাদীপ্ত আঁখি,
ঝঞ্ঝা ঝঞ্ঝাটের দিনে অভাবের শত ক্ষতি-ক্ষয়ে,
উৎসাহে বা আশঙ্কায় অন্তর কম্পিত বিস্ময়ে।
কার চক্ষে উগ্র দৃষ্টি, কেহবা করিল পরিহাস,
কটাক্ষ-কঠিন কণ্ঠে কারো গুপ্ত কণ্টক-আভাষ
বিঁধি চলে মর্ম্মতলে ; কেহবা জানায় আশীর্ব্বাদ
আগন্তুক পান্থশিরে, স্নিগ্ধবাক্যে বিতরি' প্রসাদ।

যুগ্মকণ্ঠে চলে গান, পায়ে পায়ে গতিবেগ ফুটে
একে একে দুয়ে-দুয়ে আগন্তুক যাত্রী এসে জুটে
আগে-পিছে সগোত্র সারদাতীর্থকামী,
নব নব পরিচয় কাটে দিন, হাসে অন্তর্য্যামী।

কিন্তু বড় ক্লান্ত আমি, পথই মোর হল বুঝি শেষ,
কাব্যের কমলকুঞ্জে মিলিল না দেবীর উদ্দেশ।
আশার ছলনা সে কি? দরিদ্রের ভগ্ন মনোরথ?
চলাই কেবল সার, কোথা হায় মন্দিরের পথ?
সেবায় আছে বা ত্রুটি, সাধনায় আছে অপরাধ,
গীতোচিতকণ্ঠহীনে ফলিল না সিদ্ধি আশীর্বাদ।

জীবনে জাগিল জরা, সে মন্দির আরো কত দূর?
গীতশেষে সন্ধ্যা নামে, অবসাদে ভেঙে পড়ে সুর।
স্খলিতা কণ্ঠের ভাষা, নয়নে নামিছে অন্ধকার,
বিদায় চাহি যে বন্ধু, সঙ্গ তব সাঙ্গ যে এবার।
হও তুমি সিদ্ধকাম, বাণীর নির্মাল্য বহি' শিরে,
ললাটে জয়ের টিকা দেখে যাই এ জীবনতীরে।
সাধনার বন্ধু তুমি, জীবনের কাব্যসহচর,
হৃদয়ের সুখে দুঃখে দীর্ঘদিন সোদর দোসর,
তুমি শুধু কবি নহ, একাধারে কবি ও কোবিদ,
রসস্রষ্টা, রসদ্রষ্টা-পরাণের পরম সুহৃদ্।

দাদা বলে' ডেকেছিলে সেই কবে প্রথম যৌবনে,
সেই মমত্বের ডাক ভুলিব না কভু এ জীবনে।

———

শ্রীমান

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

তোমার জীবন ধন্য করেছে শ্যাম চন্দ্রের ভাতি,
শ্যাম সোহাগিনী অনুরাগীদের তুমি যে নিকট জ্ঞাতি।
বহুভাবে সদা তোমার চিত্ত
তাঁরি উপাসনা করিছে নিত্য।
ঘোর অমারাতে চন্দ্রের সাথে জাগো কোজাগর রাতি ॥

অজাতশত্রু সবার বন্ধু সবাকার তুমি প্রিয়।
যাঁর তৃপ্তিতে জগৎ তৃপ্ত তাঁহার আশিস্ নিয়ো।
স্নিগ্ধ মেদুর-শুচি সুন্দর—
তুমি আষাঢের নব জলধর।
ভক্তি এবং প্রজ্ঞা তোমার হইয়াছে চিরসাথী ॥

প্রতিভা তোমার মণীষা তোমার সত্য লোকোত্তর।
নদীয়ার সাথে ব্রজ মণ্ডল সেথানে বেঁধেছে ঘর।
ভাগ্যের তব নাহিক যে সীমা,
পল্লীকে দাও ব্রজের মহিমা।
পর্ণপুটেতে সুধাপান কর, চরণে লুটায় খ্যাতি ॥

———

সুহৃদ্বরেষু

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

আমারও ডাক পড়েছে আজি তোমার অভিনন্দনে,
বুঝিছ সখা, প'ড়েছি তাহে কেমনই খইয়ে-বন্ধনে।

তোমার মানা না মেনে যারা
তোমারে টেনে ক'রেছে খাড়া

বনের পাখী খাঁচায় রাখি' সাজাতে স্রক্-চন্দনে
তাদেরি দলে কর্ম্মফলে পড়িনু খইয়ে-বন্ধনে।

তুমি যে জান, ভালই জান, আমিও জানি কি এর দাম,
এ কলিযুগে কেন যে বড় হরির চেয়ে হরির নাম।

তোমারে ভালবাসে গো যারা
বেশী কি ভালবাসিবে তারা ?

মুফতে-সারা রসিকজন কিনিবে বই দিয়ে কি দাম ?
মজামারারা মারিবে মজা, শ্রদ্ধাহীন সিদ্ধকাম।

খ্যাতির পথে খাতির পেতে বন্ধু জানি এ পথ নয়,
জীবনে হয় যে লালায়িত করে না সে ত মৃত্যু জয়।

তবুও তব ভক্ত মোরা
অর্ঘ্য হানি কাগজ-ঘোড়া,

কবির ভালে যা হয় হোক্, ভক্তি যেন তৃপ্ত হয়।
কথার হাওয়া লাগায়ে পালে যুগের খেয়া হুজুগে বয়।

যে নাম ধরি' তোমারে ডাকি সখ্যতার অহংকারে
বিনা পালে ও বিনা লগিতে সে নাম চলে যুগের পারে।

সে কথা যদি নীরবে স্মরি'
কবিরে ছেড়ে কাব্য পড়ি

এড়ায়ে যেতে পারি গো সখা জীবনে বহু লাঞ্ছনারে।
কবিও যদি কাঙাল হয় মানুষ যাবে কাহার দ্বারে?

তবুও আমি বন্ধু আজ তোমারি নামে কবিতা বাঁধি,
ক্ষম গো ক্ষম প্রলাপ মম পরস্পর বিসংবাদী।

জানি গো তব মহৎ চিত
এ-সবে কত সংকুচিত,

স্তবের বাণী সমযোচিত জুটে না, মিছে ছন্দ ছাঁদি।
দেশের দশা কবির দশা কাঁদায তোমা আমিও কাঁদি।

রবীন্দ্র পুরস্কার

নরেন্দ্র দেব

আসে আশীতেও কবিদের পিছু,
সম্মান সহ দক্ষিণা কিছু ;
এটা জেনে আজ প্রীত হল মন,
লহ প্রীতিভরঃ এ আলিঙ্গন ।
খুশীতে উছলি উঠিয়াছে হিয়া,
শুধু ব্যথা আজ পাশে নাই প্রিয়া ।
রোগ শয্যায় শুয়ে পড়ে আছি,
নচেৎ যেতাম ছুটে কাছাকাছি ।
শতায়ু হইয়া বেঁচে থাকো ভাই,
ধাতার চরণে এই শুধু চাই ।

———

পরম পূজ্যপাদেষু

শ্রীবিমলচন্দ্র ঘোষ

মাথা নত ক'রে গ্রহণ করেছি তোমার আশীর্বাদ ।
হে কবি, হে গুরু, পিতৃকল্প শুভানুধ্যায়ী ঋষি,
পথ ও মতের শতেক দ্বন্দ্বে আমার সাম্যবাদ
আমার বস্তুচেতন প্রজ্ঞা সজাগ অহর্নিশি,
তোমাদেরই প্রেমসাধনাদীপ্ত ঐতিহ্যের পথে
বিশ্বদৃষ্টি জেগেছে আমার বিপ্লবী মনোরথে ।

———

কবিশেখর

যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য

তুমি দাদা, একেবারে আপন-ভোলা গম্ভীর।
শিশুর মতো দিলদরিয়া, ধার ধারো না গম্ভীর।
ভক্ত কবি প্রেমিক তুমি, বেজায় খোলা অন্তর।
হিন্দু খাঁটি, ভণ্ড নহ, নয়কো গতি মন্থর॥

দরদ বোঝো, দীন দুখিনীর আঁকছো ছবি উজ্জ্বল।
পেয়লে কোথায় এমন ধাবা পুণ্য প্রেমের কজ্জল।
তুমি শরৎ চাঁদের আলো, আমি মেঘের পল্টন।
তবু যেচে বাসলে ভালো, করলে হিয়া লুণ্ঠন॥

ক্ষুদকুঁড়াতে তৃপ্ত হয়ে শোনাই হাসির সঙ্গীত,
মনের কথা রইলো চাপা, মিছাই করি ইঙ্গিত।
দুঃখে সুখে মারছি তুড়ি, যাচ্ছি হেসে দুর্দম
হেসেই যাবো, হুতোম প্যাঁচা, দিক না ধূলি কর্দম॥

তিরিশ এবং চারটি বছর কাটলো হাসির হল্লায়
কাটবে বাকী জীবনটুকু কারুর বিনা সল্লায।
চুপ মেরে যাই, নইলে আগেই পড়বে গাঢ় নিশ্বাস
গোস্তাকি মাপ করবে তুমি আমার দৃঢ় বিশ্বাস॥

———

কবিশেখর

সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

বাণীর বীণায় সুর ছিল যে মূর্চ্ছনাতে ভরা
সেই সে সুরে তরঙ্গিত স্বর্গ মর্ত্ত ধরা ;
সেই সুরেরই রঙের খেলা সারা আকাশময়,
ইন্দ্রধনুর সঙ্গে তাহার পূর্ণ পরিচয়।
বাতাসে তার স্পর্শ জাগে, ঢেউ খেলে যায় মাঠে,
সেই সুরেতে নৌকা চলে গাঁয়ের ঘাটে ঘাটে।
গাঁয়ের বধু নাইতে এসে থম্‌কে দাঁড়ায় একা,
ঘোমটা খুলে তাকিয়ে থাকে যদি বা পায় দেখা
ছেলেবেলার সাথী কেহ, যৌবনেরই সখী—,
এপার ওপার সুরে বাঁধা, ডাকৃছ চখাচখী।
সেই সুরেতে মন
আত্মভোলা কবি তুমি করলে সমর্পণ।

বৃন্দাবনের পথে পথে দিয়েছ আল্‌পনা
কৃষ্ণচূড়ার রঙে রঙীন মনেরই কল্পনা,
নয়নজলে অঞ্জলি দাও কৃষ্ণরাধার পায়
শতনামের নামাবলী তাইত তোমার গায়।
শ্যামের বাঁশী যে সুর সাধে, যমুনা সেই সুরে
উজান বহে লোকাতীত কোন্‌ সে গোলক পুরে,
এ অন্ধকার বৃন্দাবনে তাহারই সন্ধান
তুমিই দিলে নানান ছন্দে ; সুরেরই আঘ্রাণ
ছড়িয়ে দিলে, উড়িয়ে দিলে, কুড়িয়ে নিল যারা
রসোৎসবে রাসোৎসবে তারাই আত্মহারা ;
বৃন্দাবনের কবি,
চির উজল চিত্তে তোমার দীপ্তি জোগায় রবি।

———

প্রণাম

বনফুল

দেহের পিঞ্জরে বদ্ধ থাকি
হে মুক্তি পিয়াসী পাখি।
পেয়েছিলে বহু কষ্ট
গেয়েছিলে তবু বহু গান,
মুগ্ধ করি রসিকের প্রাণ ।।

ভেঙে গেছে সে পিঞ্জর,
উড়ে গেছে পাখী।
তবুও উৎকর্ণ হয়ে থাকি
হয়ে থাকি সতত উন্মনা।
সে গান কি যা'বে নাকো শোনা?
সে বৈদগ্ধ্য অনন্ত অম্লান
হল তাহা চির-অবসান?

হয়নি হয়নি বন্ধু,
সে পাখী গাহিছে অনুক্ষণ—
সীমাবদ্ধ মোদের শ্রবণ।
শুনিতে পাই না তাই
কবিশেখরের কণ্ঠ মুখর সদাই ॥

রসিকের চিত্ত যাহা সতত ভুলালো
আজ তাহা ছন্দোময় আলো।
অপরূপ সে আলোক
দেখিবার মত নাই চোখ।
আছে শুধু সমুজ্জ্বল স্মৃতি
তাহারই উদ্দেশে আজ
জানালাম আমার প্রণতি ॥

———

দাদা

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বিচিত্র ভুবন বিশ্ব ; জীবন বিচিত্র আরও,
তারও চেয়ে বিচিত্র সে ভুবন জীবন কার ;
পটুয়া কি নাটুয়া সে জানিনা ঠিকানা তারও,
তবে খেলা তার অপরূপ। আনিল আবার
জন্মদিন খেলা-খেলা। অজানা মৃত্যুর রথ
সূর্য্যোদয় সূর্য্যাস্তের বাঁকগুলি হয়ে পার
তোলে চক্রের ঘর্ঘর, বলে—শেষ হল পথ।
তার মাঝে ফিরে এল আটুই শ্রাবণ তার—
স্মৃতিমাল্য নিয়ে। এই তো কালের আশীর্ব্বাদ।
তারই সাথে দাও তুমি জ্যেষ্ঠের প্রসাদ স্নেহ
ধরিত্রীর ধূলায় মেলে-জননীর মমতা আস্বাদ
জুড়ায় তোমার স্নেহে জর্জ্জর এ মনোময় দেহ॥
আমি আছি যত দিন তুমি যেন থেকো তত দিন।
অশ্রুজলে শোধ করো অনুজের আনুগত্য ঋণ
যুধিষ্ঠির সম-তারপর মহা প্রস্থানের পথে
মুক্ত স্বর্গ দ্বারে আরোহিবে তুমি তব বৈজয়ন্তী রথে॥

দাদা কালিদাস

সুনির্ম্মল বসু

গাদা গাদা কবিতার চাষ
করেছেন দাদা কালিদাস,
সে ফসলে গজায়নি ঘাস,—
আগাছার পাইনি আভাস ;
সুমধুর রসে ভরপুর
কত শত পরিপক্ক ফল—
মনের পিপাসা করে দূর,
হৃদয় জুড়ায় অবিরল ;
দাদার ক্ষেতের এলাকায়—
কভু কেহ হয় না নাকাল।
যে যা' চায় অনায়াসে পায়,
নাহি পায় অসার মাকাল।
চাষ হোলো সারাটি জীবন—
বহু বিঘা, অনেক 'একর্',—
উল্লাসে দেশের জনগণ
নাম দিল 'শ্রীকবিশেখর'।
বেঁচে থাকো কালিদাস রায়,—
ফসল ফলাও আজীবন,—
শ্রদ্ধাভরে প্রণাম জানায়
ছোট ভাই চাষী একজন।

———

কবি প্রণাম

রাধারাণী দেবী

পল্লী-মায়ের ছায়া সুশীতল শ্যামল আঁচলে ঢাকা
তোমার পূজার ডালাখানি কবি তুলসী সুরভি মাখা।
গঙ্গামাটিতে নিকানো তোমার কাব্য-আঙিনা' পরে
কুন্দ করবী চম্পক জবা ফুটে আছে থরে থরে।
পল্লী-বধূর সলাজ কোমল সেবাব্রতা রূপখানি
বিভাসিলে তুমি পর্ণপুটের স্বর্ণ কিরণে আনি।
তোমার কাননে বাজে ব্রজবেণু, ফোটে রাখালিয়া-গান,
নন্দপুরের চন্দ্র বিহনে হা হা করে কাঁদে প্রাণ।
মাথুর বেদনা নিখিল বিশ্বে আজিও রয়েছে পূরে
চিরন্তন সে বিরহের সুর বাঁশিতে তোমার ঝুরে।
বাংলার কবি, বাঙালীর কবি, তুমি পল্লীর প্রিয়,
বঙ্গবাণীর পূজা-অঙ্গনে মোদের প্রণতি নিয়ো।
'কুড়ানি'র কথা ভুলিবে না গ্রাম, আর যাই ভুলে যাক্।
হাল-লাঙলের বদলে যদিও এসেছে সেখানে 'ট্রাক'।

কবিশেখর

শ্রীসুধীর গুপ্ত

কবিশেখরের সারস্বত সাধনার
সার-ভাগ সন্তর্পণে সংগ্রথিত করি'
সবার সম্মুখে দিলে নম্র চিত্তে ধরি'
তৃপ্তি কত। কাব্যামৃতে অমর সংসার।
বৈচিত্র্য যে অব্যাহত বঙ্গ কবিতার,—
সহস্র বর্ষের কাব্যে ভাণ্ড যায় ভরি'।
বিষণ্ণ সায়াহ্নে যত পূর্ব কথা স্মরি'
ভাবি,—দেশ লীলা ধন্য হোলো সারদার।
বিদ্যামঠে—গৃহাঙ্গনে—শান্ত দেবস্থানে
বহমান ঐতিহ্যের শুভ্র স্নিগ্ধ তারে
প্রসারিত করি' দিতে চাহি মনে-প্রাণে
রহিল যে আজীবন বাণী—সাধনারে—
সে কাব্যের মর্যাদার মূল্যায়ন দানে
প্রণোদিত করে যেন বিদগ্ধ সবারে॥

———

শ্রদ্ধাঞ্জলি

ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত

গদ্যে পদ্যে সব্যসাচী, গৃহমেধী, হে মেধিষ্ঠ কবি !
রসধ্বনিময় কাব্য মন্থনিয়া তুলি বহুছবি
'সন্ধ্যার কুলায়ে' তব সন্ধ্যারতি, ষোড়শোপচারে
কর ভারতীরে, বসি ব্যাসাসনে অশীতির পারে,
আজও তুমি সুধীবর ! ধীবরের মত ধৈর্য ধরি
সুগভীর রত্নাকরে মজ্জি তোলো অঞ্জলিতে ভরি
মুক্তা-মণি রত্ন রাজি। 'পর্ণপুটে' শ্যাম শস্পদল—
শুভ্র সুরভিত পুষ্পে মালা গাঁথিতেছো অবিরল
নিদ্রাজয়ী মালাকর। লেখনী তোমার তীক্ষ্ণধার
কৌতুকে যৌতুকপ্রথা প্রয়াস করেছ নাশিবার।
আপাত-মধুর নহে পরিণাম রম্য উপদেশ,
আদ্যোপান্ত সুধাস্বাদে কাব্য তব নিষিক্ত সন্দেশ।
আচারে আচার্য নীতি। 'ব্রজবেণু' বাজাইলে আসি
'নন্দ-কুল-চন্দ্র'-সুধালুব্ধ তুমি বৃন্দাবনবাসী।
'দন্তরুচি-কৌমুদী,—সে সুসমৃদ্ধ পরিহাসরসে
'তাতল সৈকত'-চিত্ত স্নিগ্ধ করে কৌমুদীপরশে।
'লাজাঞ্জলি', 'কুঁদকুঁড়া', 'বৈকালী'-র আনন্দ-সম্ভার
বর্ণে গন্ধে রসে ভরা 'আহরণী' নিদর্শন তা'র।
কবিশেখরের শিখা রবিতীর্থে জ্বলিবে অম্লান
'রবিবাসরে'র অর্ঘ্য লহ বর্ধমান-সুসন্তান।

———

কবিশেখর কালিদাস রায়

শ্রীমতী সুনীতি ঘোষ

নয়নের অন্তরালে নির্জন কাননতলে
বিবিধ বরণ কত ফুটে পুষ্প রয়,
তার মাঝে মনোহর থাকে পরিমল যার
বায়ু আনি করে তাহা বিমুগ্ধ হৃদয়।
নারী কি অথবা নর থাকে যদি গুণ তার
যত দুরদুরান্তর থাকুক সে জন,
লোকমুখে কি পুস্তকে প্রকাশিয়া দিকে দিকে
যশঃ পরিমলে করে আকৃষ্ট তেমন,
লভেছ এ মহাশক্তি নাহি জানি কতভক্তি
কত যে মা ভারতীর দিয়া প্রেমপায়
তাই কবিবর এত হয়কি বাসনা চিত
বারেক হেরিতে মোর নয়নে তোমায়।
হৃদয় কাননে তব, নিতি নিতি নব নব,
ভাবের ফুটিয়া নানা পুষ্প অগনন,
নন্দনের মনোহর সৌরভ হইয়া বার
জুড়ায় ব্যথিত কত তাপিত জীবন।
করি আনন্দিত নরে ছন্দে ছন্দে পড়ে ঝরে,
এত মধু সুধারাশি যার কবিতায়,
ধন্য তিনি ধন্য আর যে নারী ধরায়
করেন ধারণ তাঁর গর্ভে হেন সুকুমার
ভক্তিভরে শত শত নমি তাঁর পায়।

সাগরদাঁড়ী, যশোহর, ১৯৫২

বিলুপ্ত প্রান্তরের গান

—নচিকেতা ভরদ্বাজ

* * * উদাত্ত দৃপ্ত মহাজীবনের
উদ্দাম অনাহত অজস্র তরঙ্গমালা
উন্মুখর হয়ে আছে তোমার গানের কূলে কূলে।
যে গান মনোহর অথচ কোনোদিন
আর আমরা শুনব না,
তুমি তার শেষ স্বরকার ;
যে পৃথিবী মুগ্ধ মধুর—অথচ আর আর
কোনোদিন দেখব না,
কোনোদিন আর আমরা সেখানে ফিরে যেতে পারব না,
তুমি তার শেষ রূপকার—
দাবদগ্ধ রুদ্র নিদাঘের লেহি লেহি অগ্নিবর্ষণের মাঝখানেও
কোনো দলছাড়া কোকিলের কণ্ঠে যেমন
হঠাৎ শুনতে পাওয়া যায় শেষ বসন্তের গান,
আজকের এই প্রলয় পয়োধি জলে—এই ধ্বংসের তাণ্ডবেও
এই মহৎ বিনষ্টির মাঝখানে
অবিশ্বাস আবর্তের ঘন অন্ধকারে ডুবে যেতে যেতেও'
পায়ের নীচে বিশ্বাসের শেষ অবলম্বন
হারিয়ে যেতে যেতেও'
তোমার কণ্ঠে শুনতে পেয়েছি আমরা
শেষ বিশ্বাসের রাগিনী,
হারিয়ে যাওয়া মিলিয়ে যাওয়া নিভে যাওয়া
বিনষ্ট অতীতের শেষতম ধূসর সংলাপ,
অমোঘ স্মিত শান্তির অনন্য শান্ত উচ্চারণ।
তাই শেষ প্রদোষের অন্তিম আহত লগ্নে
আজ এই সমূহ ধ্বংসের দায়ভাগে দাঁড়িয়েও
তোমাকে আমরা শ্রদ্ধায় স্মরণ করি।
তোমাকে আমাদের সশ্রদ্ধ বিনম্র প্রণাম।

ঃ কবিশেখর ঃ
মনন ও চিন্তন

মোহিতলাল মজুমদার

আপনার নতুন কাব্যসংগ্রহ 'আহরণ' উপহার পেলাম। প্রথমেই চোখে পড়ল রচনার প্রাচুর্য ; তবু এই সংগ্রহ সম্পূর্ণ নয়। মনে পড়ল, সেকালের মাসিক-পত্রিকায় আপনার সেই প্রথম আবির্ভাবের কথা। খুব আকস্মিকভাবে এবং অল্পদিনের মধ্যেই আপনি কবিখ্যাতি লাভ করলেন। আমি তখন কেউ নই—কবি তো নই-ই। তখন দুইটি কারণে আপনার দিকে সকলের দৃষ্টি পড়েছিল, প্রথম—আপনার কবিতায় সেই অজস্রতা, অনর্গল প্রবাহ, দ্বিতীয়—প্রাচীন বাংলা ও পল্লীবাংলার কাব্যস্মৃতিকে এক নতুন ভঙ্গিতে, নতুন সুরে ও নতুন ভাষায় সঞ্জীবিত করা। আপনার 'নন্দপুরচন্দ্রবিনা বৃন্দাবন অন্ধকার'—শুধুই ছন্দে ও বাগ্‌বন্ধে নয়—সেই প্রাচীন কবিদের প্রাণের প্রতিধ্বনিতে সেকালের বাঙালীকেও সহজে রসাবিষ্ট করেছিল। ঐ কবিতার যে ধ্বনি, তাই হ'ল মূল, ভাবে ও সুরে, ঐ বিয়োগ-বিধুরতাই আজও আপনার এই আহরণের পাতা ওল্টাবার সময়ে আমার চক্ষু বারবার অশ্রুসিক্ত করেছে। নন্দপুরচন্দ্র বাংলার কাব্য বৃন্দাবন থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন, আপনার বাঙালী প্রাণ সেই ব্যথা কখনো ভুলতে পারেনি, সে ব্যথা বৈষ্ণব-সাধকদের ভাব-ব্যাকুলতাই নয়, গোটা বাঙালী-জীবনের—সেই সর্বস্ব হারানোর ব্যথা। তাই বারবার মনে হয়েছে আপনিই একহিসাবে শেষ খাঁটি বাঙালী কবি—কনিষ্ঠতম ও শেষতম। আপনার কবিতায় আধুনিক কাব্যের সূক্ষ্ম কলাচাতুর্য নেই, সমাজ-বিদ্রোহের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য নেই ; কল্পনা বা দৃষ্টিভঙ্গির দৃপ্ত মৌলিকতা নেই, তার বদলে আছে দেশের মাটিকে, দেশের মানুষকে ও দেশের সমাজ জীবনকে বুকে জড়িয়ে ধরা, যা হারিয়েছি তাই ধ্যান করার সুখ, যা বুকে চাপা আছে—একালে এই সমাজে যা মুখ ফুটে বলবার যো নেই—তারি হাসি-কান্নায় নিজের প্রাণে নিজেই দোল খাওয়া।

তবু এই যে 'কবিশেখর' উপাধিটি অনেক আগেই আপনাকে দিয়েছিল, তার মূল্য একালে যেমনই হোক, তেমন সত্যিকার উপাধি আর কেউ লাভ করেনি। আপনার কবিতায় যে প্রাচীন সংস্কৃতির ধারাটি আজ পর্যন্ত অব্যাহত আছে—শুধু গান নয়, সেই সাহিত্যিক রীতি, সেই বৈদগ্ধ্য ও আলঙ্কারিক প্রসাধন—অথচ ভাব-অর্থের অতিশয় সরল ও সচ্ছন্দ ব্যঞ্জনা, তেমনটি আর কারো কাব্যে নেই ; প্রাচীন সংস্কৃত ও মধ্যযুগের বাংলা—এই দুই কাল্‌চারই,—একের আর্ট ও অপরের প্রাণ—আপনার কবিতায় মিতালি করেছে। আপনার কাব্য নব্যতন্ত্রের কাব্য না হতে পারে, কিন্তু তাই বলে আজকালকার বিদ্বানেরা তাকে অবহেলা করতে পারবেন না ; করবে তারাই যারা মাতৃজঠরেই সকল শিক্ষা শেষ করে এসেছে, এবং যারা দেশের অতীতকে একেবারে মুছে ফেলেছে ; কিম্বা 'নেশন' হয়ে উঠেছে—সংস্কৃত ও বাংলা পুরাণ ইতিহাসকে, ভারতের ও বাংলার সংস্কৃতিকে যারা আর্ট বা পুরাতত্ত্বের বাইরে স্বীকার করতে চায় না, যেমন হিন্দী-হিন্দু ভারত-

প্রেমিকের দল। কিন্তু ঐ উপাধিটি আপনাকে যারা দিয়েছিল তারা সেই বস্তুকে এখনও তাদের রক্তে অনুভব করে, তাই তাদেরই ভাষায় আপনাকে তারা ঐ 'কবিশেখর' নামটি দিয়েছিল।

ঐ দেখুন, কি বলতে কি সব অকথা-কুকথা বলছি—লোকে শুনলে হাসবে। "ছেড়ে গেছে মোর বীণাপাণি", বীণাপাণির দোষ নেই; তাঁর বীণাখানি পরখ করবার জন্যে যে টানা-হেঁচড়া শুরু করেছিলাম, তাতে দেবী-অতিশয় ভদ্রমহিলা হলেও বেশীদিন সহ্য করতে পারেন নি, শেষে একেবারে নিরুদ্দেশ। দেবী যদি ভদ্রমহিলা না হয়ে রুদ্র-মহিলা হতেন, তাহ'লে কি করতেন বলা যায় না, নিরুদ্দেশ নিশ্চয়ই হতেন না, হয়তো কাব্য ছেড়ে উপন্যাসকে আশ্রয় করতেন, এবং খুব ক'রে খানকতক উপন্যাস লিখিয়ে নিয়ে, নিজেরই সেই মহিষমর্দিনীরূপে এক উপন্যাস ভৈরবীকে খাড়া ক'রে এমন মার খাওয়াতেন যে, বাপের নাম ভুলতে হ'ত। কিন্তু দেবী আমাকে দয়া করেছেন, একেবারে ত্যাগ করে গেছেন। তাছাড়া, আমি যে একদা কবিতা লিখেছিলাম, তা যৌবনের গুণে,—আপনার মত স্বভাবের বশে নয়। এই রকম স্বভাব কবিত্ব বা জন্ম-কবিত্ব একালে আরেকজনের মাত্র দেখতে পাই—কবি কুমুদরঞ্জনের। এমন কেউ কেউ হয়তো আছেন—যাঁদের কবিতা লিখতেই হবে, কবি হবার জন্যে, কলমও নিরঙ্কুশ হুকুম কবলেই চলে, কেবল চাৎকার ক'রে জানাতে হবে, তাঁরাও কবি। আমি তাঁদের কথা বলছিনে। কিন্তু আপনার সেই কবে শুরু, এখনও সমানে চলেছে। সংসার ও সমাজের সকল দাবি মাথায় পেতে নিয়ে, সেই রথচক্র-তলে ক্রমাগত পিষ্ট হয়ে এবং জরা ও ব্যাধির নির্যাতন সহ্য করে—আপনার কবিজীবন এখনও সর্বংসহা পৃথিবীর মতই শ্যামল। আবার একদিকে সরস্বতীর বেত্রপাণি-মূর্তি, আরেক দিকে বীণাপাণি; এই দুইয়েরই সমান পরিচর্যা এমন নির্বিকার ভাবে কেউ করতে পেরেছে বলে তো জানিনে। এই সদানীরা স্রোতস্বতীকে আপনি প্রাণের কোন্ কন্দর থেকে লাভ করেছিলেন. তাই ভাবি আর আশ্চর্য হই।

আপনি বয়সে আমার চেয়ে ছোট—তা' সে যতই কম হোক, তবু কবি হিসেবে আপনিই জ্যেষ্ঠ। আপনার 'পর্ণপুটে'র সেই দীর্ঘ রস পরিচয় যখন করেছিলাম—কয়েকখানি পত্রে, তখন আপনি ছিলেন কবি, আমি ছিলাম ভক্ত পাঠক। আমি আরম্ভ করেছিলাম পরে, ফুরিয়ে গিয়েছি অনেক আগে। আমার কবি-জীবন একরাত্রির একটা আতসবাজির মত; আপনার কবিত্ব—একটি স্থির দীপশিখা, এখনও তার রশ্মি ম্লান হয়নি, হবেও না; সজ্ঞানে গঙ্গালাভের মত ঐ কবিত্ব শেষ পর্যন্ত জেগে থাকবে, তারকব্রহ্ম নামের সঙ্গে এক হয়ে যাবে। কি সৌভাগ্য আপনার!

এই সব কথা প্রায় মনে হয় আপনার সম্বন্ধে। নতুন করে' আবার আপনার 'আহরণ' পড়ব। আজ বাঙালীর কান্না ছাড়া আর কিছু নেই; যারা এখনও উল্লাস করে তারা পিশাচগ্রস্ত। বাঙালীর সকল গৌরব সকল গর্বের আজ অবসান হয়েছে—কি জীবনে, কি সাহিত্যে। কবিত্বের অহঙ্কার আর নেই,—শ্মশান-কুকুরদের কোলাহলে কাব্যের কালোয়াতি বিবাদ হ'য়ে উঠেছে। এখনও যে-কবিতা প্রাণে কথা কয়, সে ঐ আপনারই কয়েকটি কবিতা,—তাতে পিতৃ-পিতামহদের আত্মার সেই আকুতি আছে; সে হচ্ছে খাঁটি বাঙালী-প্রাণের বাংলা কবিতা;—সৌন্দর্যের রসাবেশ নয়, কল্পনার অলকা-স্বপ্ন নয়, কাব্য-সুন্দরীর স্বয়ম্বর-সভায় লক্ষ্যভেদের অপূর্ব কৌশল নয়। এখন চাই

সেই সুর, যাতে সকল অভিমান, সকল গর্ব দূর হয়, প্রাণের তুলসীমূলে দীপ জেলে সন্ধ্যা-সংকীর্তন-শেষে, এই আমার দেশের মাটিতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়তে পারি। ইহকাল তো গেছেই হিন্দুস্থানী-নেশনের পদসেবা ক'রে পরকালটাও যেন খোয়াতে না হয়।

জানি, আপনার কবিতার আদর হয়নি, আপনি যুগের পিছনে প'ড়ে আছেন ব'লে। একদিন সে অভিযোগের একটা কারণ হয়তো ছিল, কিন্তু আজ? বাংলায় আর কোন যুগ কখনো ছিল না, এই বর্তমান যুগ ছাড়া, উনবিংশ শতাব্দীটাও বাতিল হয়ে গেছে। আবার, এযুগে কথাসাহিত্যই একমাত্র সাহিত্য—গণসাহিত্য কিনা। সেই কথাসাহিত্যের সম্রাট যাঁরা (একজন তো নয়! আবার মেয়ে পুরুষের লড়াই আছে।) তাঁরাই পরাধীনতার দীর্ঘ শীতঋতুর পরে আজ স্বাধীনতার বসন্ত সমাগমে যে মধু পান করছেন, তার এক কণাও—খ্যাতি বা অর্থ কবিদের প্রাপ্য নয়। সম্প্রতি তা নিয়ে সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর মধ্যে দারুণ যুদ্ধ লেগেছে। সেখানে তুমি-আমি কোথায়? বরং—'রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলু-খাগড়ার প্রাণ যায়'। **"The paths of poetry lead but to the grave"**—এই কথাই আরও সত্যি, একালে এ সমাজে ঐ সব সাহিত্য সম্রাটই গণভোট পায়, বই বিক্রী ক'রে বাড়ীগাড়ী করে, সভায় সভায় সভাপতি হয় (আপনি কখনো সভাপতি হয়েছেন?), সিনেমার সিন্নিও তাদেরই একচেটে। কবিরা এদের সঙ্গে পেরে উঠবে কি ক'রে? বিশেষ করে—যারা সেই শীতঋতুতেই কাব্যের অগ্নি-সেবন করেছিল,—অতিশয় ঘৃণ্য ঋতু। এই বসন্তের এক কোকিল তাঁর সেই শীতঋতু-যাপনের যে রিয়ালিষ্টিক কাহিনী ভক্তমহলে প্রচার করেছেন, তা' পড়ে সত্যিই বমি আসে। —কি **vulgar**। আজকের দিন, আর সেইদিন! —সত্যিই তো। সেই শীতঋতুর কবি যাঁরা এখনও বেঁচে আছেন, তাঁদের কেউ-বা জীবন্মৃত হয়ে আছেন, একে বৃদ্ধ, তায় বসন্তকাল। বাইরে মুখ দেখাবার যো নেই। কেউ বা কবি-নাম ত্যাগ ক'রে মান বাঁচিয়েছেন, আবার কেউ বা বেগতিক দেখে, আদাজল খেয়ে গান্ধী-ভজন সুরু করেছেন। কেবল দু'জন এখনও কবিতার মায়া ত্যাগ করেন নি—আপনি আর কুমুদরঞ্জন। একজন 'নদীতীরে বৃন্দাবনে' একমনে তাঁর একতারাটি বাজিয়ে চলেছেন; আর আপনি এই শহরের বুকে ব'সে, সম্পূর্ণ নিস্পৃহ ও নিরভিমান হ'য়ে সেই 'পর্ণপুট'-কেই স্বর্ণপুট ক'রে তুলছেন। নাই বা কেউ স্বীকার করলে, নাই বা জয়মাল্য পরিয়ে দিলে। সে জয়মাল্য দেবে কারা? আজকের বাঙালী তো হিন্দুস্থানীর গোলাম হ'তে চলেছে? রাজর্ষি ট্যান্ডন বলেছেন, হিন্দীই ভারতের শ্রেষ্ঠ ভাষা, পাতা-চাটুয্যের দলও বলেছেন—এমন বনেদী ভাষা আর নেই, এ সেই শৌরসেনী অপভ্রংশের একমাত্র পিণ্ডাধিকারী—ভারত নেশনের রাজভাষা। ট্যান্ডনজীর সেই ফতোয়া আনত মস্তকে স্বীকার করে নিয়েছেন আমাদের বঙ্গসরস্বতীর ঢোল আর কাঁসি বাজান যাঁরা; রবীন্দ্রনাথের ভাষাও যে হিন্দীর তুলনায় কিছু নয়—এমন ইঙ্গিতও তাঁরা ভক্তিগদগদভাবে মাথায় পেতে নিয়েছেন। এরপর, আপনার মত কবি কি আশা করতে পারে? আবার এদিকেও তো বাংলা-সাহিত্যের নামে ফেরঙ্গ-সরস্বতীর কুৎসিত লীলা চলছে; এ সবের মধ্যেও বঙ্গ-সরস্বতীর বুকের বীণাখানি এখনও যার হাতে নীরব হয়নি, তার কি কোন অভিমান করা সাজে? ঐ অনাদর অপমানই যে তার ভূষণ!

সর্বশেষে একটা প্রাণের কথা বলি। সেই কবে আমরা যাত্রা করেছিলাম, ঠিক একজায়গা থেকে নয়—একজন গাঁয়ের পথে, আর একজন শহরের গলিতে। আজ তুমি শহরে—আমি বনে। তুমি শহরে বসেই গ্রামের গান গাইছ; আর আমি ?—আমি বনে বসে সেই শহরের পাপজীবনকে অভিশাপ দিচ্ছি; আমার কণ্ঠে আর গান নেই; বাংলা ও বাঙালীর যে মহা বিনষ্টি আসন্ন তারই ভয়ে অবসন্ন হ'য়ে, মর্মান্তিক আক্ষেপে আর্তনাদ করছি। তবু সেই দুই পথ কোথায় যেন এক হয়ে গেছে। আমার কালের কেউ আর নেই; সেকালের সেই আত্মীয়সমাজ, সেই ধর্ম, সেই সাহিত্যমন্ত্র আর নেই। কিন্তু সেই আমার পথের প্রান্তে তোমাকেই পেলাম একমাত্র সহচর—ভাঙ্গনের মুখে দুইজনেই একস্থানে এসে দাঁড়িয়েছি। মহাযাত্রার আর বিলম্ব নেই, কে আগে যাবে—বেশি আগে নয়—তারও ঠিক নেই। তাই আমি আগে থেকেই তোমার ললাটে বিদায়-চন্দন পরিয়ে দিলাম।

ঃ বৈষ্ণব কাব্যরসিক কালিদাস

—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সপ্তদশ শতকের ইংরাজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি ড্রাইডেন একদা তাঁহার রচনা সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছিলেন—

"ভাবসমূহ এত দ্রুতগতিতে আমার চিত্তে উদিত হয় যে, আমার দ্বিধা জাগে উহাদিগকে কাব্যের ছন্দোরূপ দিব, না গদ্যের যে অপরবিধ ছন্দোধ্বনি (other harmony of prose) তাহার মধ্যেই গাঁথিয়া তুলিব।"

আমাদের সমসাময়িক বাঙ্গালী কবি কালিদাস রায়ও বোধহয় সময় সময় অনুরূপ দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া থাকেন। গদ্যে পদ্যে এই সমশক্তিসম্পন্ন সব্যসাচিত্বেই তাঁহার অনন্যসাধারণতা।

স্বর্গগত কবিসমালোচক মোহিতলাল মজুমদারেরও এই উভয়বিধ পটুত্ব ছিল, কিন্তু তাঁহার রচনা কাব্যগুণে শ্রেষ্ঠ মৌলিকতার অধিকারী হইলেও পরিমাণে অপেক্ষাকৃত স্বল্প। মনে হয় যে, তাঁহার পরিণত মনীষা ও কাব্য সম্বন্ধে অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি সমালোচনাকে অবলম্বন করিয়াই আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল।

কবি কালিদাস তাঁহার জীবনের পঞ্চাশৎ বৎসর পর্যন্ত প্রধানতঃ কাব্যরসেই বিভোর ও কবি আখ্যায় পরিচিত ছিলেন। পঞ্চাশোর্ধ্বে তাঁহার কবিমন কাব্যরস-বিশ্লেষণের বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়াছে। এ যেন কাব্যরচনার প্রত্যক্ষ রাজৈশ্বর্যভোগ পরিত্যাগের পর তাহার পরোক্ষ রহস্য অনুধ্যানের পালা কবিজীবনে আবির্ভূত হইয়াছে।

কালিদাসের কবিতার রস আমরা পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করিয়াছি। এখন তাঁহার নূতন রচনার মধ্যে পুরাতন সুরেরই পুনরাবৃত্তি দেখা যায়। কিন্তু তাঁহার কাব্য-সমালোচনার ভিতর দিয়া তাঁহার যে নূতন পরিচয় উদঘাটিত হইয়াছে তাহা আমাদিগকে যেমনি বিস্মিত, তেমনি পুলকিত করিয়াছে। ব্রজরাখালের বেণু আজ সমালোচকের মানদণ্ডে পরিবর্তিত হইয়াছে, যিনি বাঁশী বাজাইয়াছেন তিনি বাঁশীতে সপ্তস্বর বিন্যাসরহস্য ব্যাখ্যা করিতেছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রূপান্তর সত্ত্বেও ইহার স্বভাবসুলভ মাধুর্যের কোন ব্যত্যয় ঘটে নাই, কবির কাব্যরস আস্বাদন কখনও গুরুমহাশয়ের বেত্রদণ্ড আস্ফালনের রূপ লইয়া আমাদের ভীতি উৎপাদন করে নাই।

কালিদাস যেরূপ মুগ্ধ অন্তর্মুখী মন লইয়া নিজের কবিতা রচনা করিয়াছেন তাহা লইয়াই অপরের কবিতারও আলোচনা করিয়াছেন। কবির সমালোচনা কাব্যসৌন্দর্যমণ্ডিত হইয়া কবিমনের রহস্য উদঘাটনের গোপন মন্ত্রটি আয়ত্ত করিয়াই আমাদের সম্মুখে দ্বিতীয় কাব্যসৃষ্টিরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। স্বভাবসুন্দরী শকুন্তলার অনভ্যস্ত প্রসাধন-সজ্জা তাঁহার দেহসৌষ্ঠবকে বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ করে নাই।

রচনার উৎকর্ষ ও স্থায়িত্বের দিক দিয়া কবি কালিদাস সমালোচক কালিদাসকে অতিক্রম করিয়াছেন, ইহা নিঃসন্দেহ; কিন্তু এই সঙ্গে ইহাও সত্য যে, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের দিক্ দিয়া সমালোচকেরই প্রাধান্য। সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

কবির প্রথম যৌবনের যে সুরভিত মদির আবেশে কবিতাগুচ্ছ থরে থরে ফুটিয়া উঠে, কবি-চিত্তের সেই ক্ষণবসন্ত ঠিক তাঁহার ইচ্ছাধীন নহে, ইহা এক নিগূঢ় রসোচ্ছলতার উপর নির্ভরশীল; কিন্তু যাঁহার কাব্যানুভূতি আছে, তাঁহার পক্ষে ইহার যুক্তিগত অনুশীলন কেবলমাত্র অবসর-সাপেক্ষ ও রুচি সাপেক্ষ। কালিদাস এই অবসর ও রুচির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পর্যালোচনা করিয়া কবির দৃষ্টিতে ইহার ক্রমবিকাশের ধারাটি সুবিন্যস্ত করিয়াছেন। তাঁহার এই সাহিত্যালোচনার মধ্যে কবিসুলভ সহানুভূতি ও রসোপলব্ধির প্রচুর পরিচয় মিলে।

সাহিত্য আলোচনার বিভিন্ন রীতি ও স্তর আছে। সমালোচনার মধ্যে সব সময় যে মৌলিক আবিষ্কারশক্তি বা বিচারকের কঠোর দোষগুণ বিচারে তীক্ষ্ণদৃষ্টি, অপক্ষপাত মূল্য নির্ধারণ থাকিতেই হইবে এমন কোন কথা নাই। সমালোচনার অপ্রীতিকর দায়িত্ব, নির্ভীক দোষ উদ্ঘাটন, অপাত্র-ন্যস্ত অতি প্রশংসার প্রতিরোধ সকল সমালোচকের লেখার মধ্যে দেখা যায় না। কালিদাস কবির কোমল সৌন্দর্যমুগ্ধ মনোভাব লইয়াই সমালোচনাকার্যে ব্রতী হইয়াছেন।

সাহিত্যের সহজ মর্মোদ্ধার, সরস রুচিকর আস্বাদন, বিন্যাস কৌশলের দ্বারা উহার অন্তর্নিহিত ভাবধারা ও আদর্শের সুস্পষ্ট নির্দেশ—ইহাই কালিদাসের বিশেষত্ব। তিনি হয়তো কোন চমকপ্রদ কথা বলেন নাই, কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শান্তকরুণ আবেদন, ইহার ভক্তিরসাশ্রিত, গভীর অনুভূতিসিক্ত ও পরিচ্ছন্ন রচনা-পরিপাট্য তাঁহার রচনার প্রসাদগুণে, তাঁহার কবিমনের সরস স্পর্শে ও স্বচ্ছ প্রতিবিম্বনে আরো মনোজ্ঞ ও চিত্তাকর্ষক হইয়া পাঠকের সাহিত্যরুচির তৃপ্তিবিধান করিয়াছে।

কালিদাস যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লীলা বক্তৃতামালার অঙ্গীকৃত ভাষণদানে ব্রতী ছিলেন, তখন তাঁহার সবগুলি বক্তৃতায় সভাপতিরূপে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল। বৈষ্ণব পদাবলী-সাহিত্যের রস বিশ্লেষণ তাঁহার বক্তৃতার বিষয় ছিল। এই বক্তৃতাগুলির রসসিক্ত কাব্যা-লোচনা শুনিতে শুনিতে বৈষ্ণব কবিদের সহিত তাঁহার নিগূঢ় ভাব-ঐক্য নূতন করিয়া আমার মনে প্রতিভাত হইতেছিল। কালিদাসের কাব্যে পদাবলী সাহিত্যের প্রভাব অতি গভীর, প্রায় সর্বব্যাপী। বৃন্দাবন লীলার দাস্য, বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর রস আধুনিক কবির রূপক-সন্ধানী পুরাতন ভাবাসঙ্গের মধ্য হইতে নূতন তাৎপর্য গভীরতা ভাবনিবিড়তা অনুসন্ধানে তৎপর, বিচিত্রসঞ্চারী কল্পনাজালের আকস্মিক ঐককেন্দ্রিক সংবরণে অন্তরগুপ্রবেশশীল মনোধর্মের মাধ্যমে এক অভিনব প্রগাঢ়তা অন্ত-র্মুখিতা লাভ করিয়াছে। বৈষ্ণব কবিতার ভাবধ্বনি আধুনিক কবির মনোগহনের গহ্বরে এক গভীরতর প্রতিধ্বনির অনুরণন তুলিয়াছে।

পদাবলী-সাহিত্যের সহিত বৈষ্ণবভাবাশ্রয়ী আধুনিক কবিতার পার্থক্যটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবির সমস্ত বেদনার্তির, সমস্ত অশ্রুসজল বিলাপ বিস্তারের মধ্যে এক নিশ্চিন্ত আশ্বাস, এক প্রশান্ত মধুর রমণীয় পরিণাম বর্তমান। তাহা না হইলে ইহার খেদোচ্ছ্বাস, ইহার

ক্ষোভ, অনুযোগের মধ্যে ভক্তিবিহ্বল আত্ম-নিবেদনের নিঃসন্দিগ্ধ সুরটি শোনা যাইত না।

সাধনায় স্থির বিশ্বাস, আদর্শের অবিচল অনুসরণ সমস্ত ব্যর্থতার উপরে অটুট মহিমায় বিরাজিত। বৈষ্ণবের খেদ দয়িতের অপ্রাপ্যতার, ভালবাসার প্রতি অবিশ্বাসে নহে। উহার "হৃদয়মন্দিরে কানু ঘুমাওল প্রেমপ্রহরী রহু জাগি।"

শ্রীরাধার নিরাশ-প্রণয়জ্বালা, বেদনার বুকফাটা হাহাকার পড়িতে পড়িতে হঠাৎ মনে হয় যে এ সবই যেন লীলারহস্য, মায়ার কুহক; এ বিরহ যেন চিরমিলনেরই একটা কল্পিত দীর্ঘশ্বাস, শাশ্বত প্রেমেরই হৃৎস্পন্দনের একটা ছদ্মবেশী ছন্দ, সদাজাগ্রত ভালবাসার নিমীলিত আঁখিপল্লবের ছলনা।

আধুনিক কবির মনে বেদনা ও আত্মবিলাপের নানা উপাদান সঞ্চিত,—আদর্শচ্যুতি, মানস উদভ্রান্তি, মোহ-মরীচিকার দিশাভুলানো ইঙ্গিত, নিরাশ্রয় চিত্তবিক্ষেপের অপার শূন্যতা। সুতরাং তাঁহার কণ্ঠে যখন বৈষ্ণব কবির খেদোক্তি উচ্চারিত হয়, তখন তাহাতে এক অনভ্যস্ত অস্বস্তির সুর ফুটিয়া উঠে।

কমলাকান্ত যখন বৈষ্ণব পদাংশ উদ্ধৃত করিয়াছে, তখন তাহা এক অপ্রত্যাশিত তির্যক্‌ পথচারী বিলাপমূর্চ্ছনার মর্মভেদী আক্ষেপে পরিণত হইয়াছে। "এস এস বঁধু এস, আধ আঁচরে বস, নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।" পরিপূর্ণ প্রেমের এই মহিমময় প্রশস্তি পরবর্তী যুগে এক অভিনব রূপকদ্যোতনায়, এক জটিলতর অতৃপ্তিবোধে তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। প্রিয়াকণ্ঠের সোহাগবাণী দেশমাতৃকার প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে, অন্তরের ভাবময় আকুতি বহির্জগতের গ্লানিকর পরাভবে আরোপিত হইয়া খানিকটা আতিশয্য-অসঙ্গতির সৃষ্টি করিয়াছে। বর্তমান যুগের কবিমানসের পক্ষে দয়িতের প্রতি এই আবাহনের আন্তরিকতা, তাহাকে আধ আঁচরে বসাইবার একাত্মতা ও তাহার প্রেমোপলব্ধির বহিশ্চৈতন্যহীন আত্মমগ্নতা সবই অনায়ত্ত আদর্শ। কাজেই উপরি-উক্ত পদটির আধুনিক প্রয়োগ যে ব্যাকুলতায় উন্মনা হইয়া উঠিয়াছে, তাহার মধ্যে সংশয়াকীর্ণ চিত্তের অনির্দেশ্য বেদনা-বিষাদের সুরটি মিশিয়া গিয়াছে।

কবি কালিদাস বৈষ্ণব কবিগোষ্ঠীর অতি নিকট আত্মীয়, তাঁহার মধ্যে আধুনিক চিত্তের দোলাচলতা ও সমস্যাবিহ্বলতা তাঁহার প্রকৃতিবৈশিষ্ট্যের জন্যই অনেকটা অনুপস্থিত। মধ্যযুগীয় ভাব-ও-রস-সর্বস্বতা একটা আদর্শানুগামী যুক্তি প্রতিষ্ঠা-প্রবণতার ও অভিজাত প্রকাশ-রীতির সহিত সংযুক্ত হইয়া তাঁহার বৈষ্ণবভাবাশ্রয়ী কবিতার বিশিষ্ট রূপের হেতু হইয়াছে। তথাপি আধুনিক মনোধর্মের যে অপরিহার্য লক্ষণ, রূপাত্মক ও দেহধর্মী কল্পনার মধ্যে অরূপ ভাবব্যঞ্জনার অনুসরণ, তাই তাঁহার মধ্যেও অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছে।

তাঁহার মাথুরবিরহ বৈষ্ণব কবির মাথুরবিরহের নানামুখী সম্প্রসারণ, মনের প্রকোষ্ঠে-প্রকোষ্ঠে অনুভূতির স্তরে স্তরে ইহা একটা সূক্ষ্ম অনুরণন জাগায়। ইহার ভাবকেন্দ্র বৈষ্ণবী নিষ্ঠার পরিধি অতিক্রম করিয়া গভীরতার আপেক্ষিক অভাব ব্যাপকতার দ্বারা পূর্ণ করিয়াছে।

তাঁহার নৌকাবিলাসের কবিতায় এই সুরের নূতনত্ব সুপরিস্ফুট। বৈষ্ণব কবির কাছে ইহা তরুণ-তরুণীর লীলাবিহার, ঐশী প্রেমের ক্রীড়াকৌতুকবৈচিত্র্য। উপরে মেঘের ভ্রূকুটি, নিম্নে তীব্র-বায়ুপ্রখর যমুনাতরঙ্গের ফেনিল রুদ্রবিকাশের বিভীষিকা, মধ্যে টলমল তরীর উপর কপটক্রীড়ার

মুখর, ব্যাজতর্জনে রুষ্ট, ছদ্ম আশঙ্কায় ত্রস্ত কিশোরীর চক্ষে প্রেমের স্থির দীপ্তি, বিশ্বাসের অবিচল নির্ভর। তরী করে টলমল পশরায় উঠে জল—এই সঙ্কটময় দৃশ্য বিপদের সঙ্কেতরূপে নহে, কাণ্ডারীর উপর একান্ত আস্থাশীলতার পটভূমিকারূপেই কল্পিত হইয়াছিল। জ্ঞানদাসের নৌকা-বিহারের দুই-একটি পদে ভবভয়ক্লিষ্ট, মুক্তি কামনায় উদগ্র ব্যাকুল, অনিশ্চয়তার গোধুলিরহস্তে অভিভূত আধুনিক মনের পূর্বাভাস পাওয়া যায়। কিন্তু সাধারণত, বৈষ্ণব কবিরা সংশয়াতীত বিশ্বাসে আত্মপ্রতিষ্ঠিত। কবি কালিদাসের পদে বৈষ্ণবভাবাদর্শ অনুসরণের সহিত আধুনিক শঙ্কাভীরুতার স্বরও মিশিয়াছে।

তাঁহার 'নন্দপুরচন্দ্রবিনা বৃন্দাবন অন্ধকার' কবিতায় বৈষ্ণব-ভাব-পরিবেশের অনবদ্য পুনর্গঠন থাকিলেও এই অন্ধকার কেবল বৃন্দাবনলীলার উপর যবনিকাপাতের জন্যই নহে, ইহার সহিত আদর্শ অবলম্বন হারানোর বিমূঢ়তা, স্থিরজ্যোতি অস্তমিত হইবার পর আলোর সন্ধানে লক্ষ্যহীন সঞ্চরণের অস্থিরত্ব খানিকটা মরীচিকা-কম্পনের করুণ বিভ্রান্তি যুক্ত করিয়াছে।

বৈষ্ণবভাবমণ্ডলের সহিত তাহার এই অন্তরঙ্গ সম্পর্কই তাঁহাকে পদাবলীর রসবিশ্লেষণের অধিকার দিয়াছে। তাহার আলোচনার প্রধান উদ্দেশ্য হইল এই সাহিত্যের বিভিন্ন পর্যায়ের সুষ্ঠু বিন্যাসের দ্বারা ইহার বিরাট আয়তন ও বিচিত্র রসসম্ভারের মধ্যে সাধারণ পাঠকের স্বচ্ছন্দ পদচারণার পথরচনা। তাঁহার আলোচ্য গ্রন্থে তিনি বৈষ্ণব পদাবলীর তত্ত্বের দিক্ ও রূপরসের দিকটা পাশাপাশি রাখিয়া উহাদের পারস্পরিক প্রভাব নির্ণয় করিয়াছেন। তত্ত্ব কেমন করিয়া একান্ত ভক্তিবিহ্বলতা ও দ্রবকারী অনুভূতির সাহায্যে অপরূপ রসপরিণতি লাভ করিয়াছে ও মাধুর্য কেমন করিয়া তত্ত্বের সুদৃঢ় বেষ্টনে আপনাকে অপচয় ও অসংযম হইতে রক্ষা করিয়াছে, তাহা তাঁহার আলোচনায় চমৎকারভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সাধনার ক্রম, দর্শনের সত্যানুভূতি, ভক্তিশাস্ত্রের যত্নরচিত অনুশাসন এক নির্মল ভাবনির্ঝরে স্নাত হইয়া এক অপরূপ রূপ-মুগ্ধতার অনুলেপ অঙ্গে মাখিয়া কেমন করিয়া করুণ প্রেমের সুকুমার শ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠিয়া মানবচিত্তবিহারী আদর্শ সৌন্দর্যস্বপ্নের অনবদ্য বিগ্রহরূপ ধারণ করিয়াছে, তাহা আমরা অনুভব করি। গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায় কবির হাতে কাব্যসমালোচনা কাব্যে গহনশায়ী প্রেরণাকে আমাদের প্রত্যক্ষগম্য করিয়াছে। সময়ে সময়ে কবির অসংবরণীয় ভাবোচ্ছ্বাস ও নিগূঢ় মর্মানুভূতি গদ্যরচনার পায়ে-হাঁটা পথ ছাড়িয়া কাব্যাভিব্যক্তির পরাগসুরভিত গীতিমর্মরিত বনবীথির অনুসরণ করিয়াছে। দীপ হইতে দীপান্তর প্রজ্বলিত করার মত মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবিতা আধুনিক কবির মনোমন্দিরে এক নূতন অর্ঘ্য নিবেদনের প্রেরণা জাগাইয়াছে। কবি গদ্যসমালোচনার কুণ্ঠিত অস্ত্র ফেলিয়া তাঁহার কাব্যের দীপ্ত মন্ত্রপূত আয়ুধ নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার উদ্দিষ্ট লক্ষ্য ভেদ করিয়াছেন।

তাঁহার এই লীলা-বক্তৃতামালার স্বল্প পরিসরে বৈষ্ণব সাহিত্যের সর্বাঙ্গীণ আলোচনা স্থান পায় নাই। কিন্তু তিনি যেটুকু বলিয়াছেন তাহা কবির অনুভূতি লইয়া কাব্যময় ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। বৈষ্ণব রস-মাধুরীর প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম প্রীতি ও সহানুভূতি গদ্যপদ্যের দ্বিমুখী গঙ্গাযমুনাধারায় প্রবাহিত হইয়া আবেগধর্মী ও বিশ্লেষণাকাঙ্ক্ষী উভয়বিধ পাঠকেরই রুচিকে তৃপ্ত করিয়াছে।

ঃ বৈষ্ণব কবিঃ
কালিদাস

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত

বাংলাদেশের অধিকাংশ পাঠকের ন্যায় কবি কালিদাস রায়ের কবিতার সহিত আমার পরিচয় 'নন্দপুরচন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার' কবিতার ভিতর দিয়া। কিছুদিনের ভিতরেই স্কুল-জীবনে কবির 'পর্ণপুট' হাতে পড়িল; তাঁহার সহজ-সরল পল্লী-প্রীতি, প্রকৃতির সহিত তাঁহার চিত্তের নিবিড় যোগ, অন্যান্য অনেক কাব্যগুণ মনকে মুগ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু তাহা হইলেও 'নন্দপুরচন্দ্র'কে বহুদিন পর্যন্ত ভুলিতে পারি নাই। যে বয়সে 'নন্দপুরচন্দ্রে'র সহিত আমার প্রথম পরিচয় সে বয়সটি নন্দপুরচন্দ্রের অথবা অন্ধকার বৃন্দাবনের কোনও তত্ত্বরূপ গ্রহণ করার পক্ষে অনুকূল ছিল না; কবিতাটির প্রতিটি পংক্তির ভাবানুসরণ বা অর্থানুসরণের ক্ষমতাও তখন ছিল না; এখন বুঝি, মন তখন মুখ্যত করিয়াছিল অপূর্ব একটি সুরের অনুসরণ। এই সুরের একটা সহজ অথচ সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনাশক্তি থাকে—যাহা সমস্ত জড়াইয়া মনকে ভরিয়া দিত।

এখন অবশ্য বুঝি, 'নন্দপুরচন্দ্র' ভাল কবিতা, এবং কবি কালিদাস রায়ের কবিতাগুলির মধ্যে সর্বাধিক প্রিয় এবং প্রচলিত কবিতা বটে—কিন্তু ইহাই কবির শ্রেষ্ঠ কবিতা নহে। কবি নিজেই পরবর্তী কালে এই কবিতাটি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

> প্রথম যৌবনে কবে গাহিনু তোমার নান্দী ক্ষীণ কণ্ঠে মম,
> শিবচতুর্দশী রাতে কিরাতের বিল্বপত্রবর্ষণের সম।
> অন্তরে ছিল না ভক্তি, বচনে ছিল না শক্তি,—অকৈতব ধন।
> অনুপ্রাসে বাগ্বিলাসে সুলভে করেছি তৃপ্ত তৃষিত শ্রবণ।

কবির এই উক্তি যেমন সত্য, তেমনই এই কবিতাটির পরবর্তী অংশটিও সত্য।—

> আজি তাই মনে হয়, তব পদরেণুকণা নাই যেই ফুলে—
> যতগন্ধ শোভা থাক্—ব্যর্থ তা জীবন-কুঞ্জে এ কালিন্দী কূলে।
> পরশপাথরে কবে ছন্দের শৃঙ্খলে মোর করিলে কাঞ্চন,
> সারাটি জীবন তারে উপলে উপলে খুঁজি ক্ষ্যাপার মতন।।

প্রথম যৌবনে কবি যখন 'নন্দপুরচন্দ্র-বিনা' কবিতাটি লিখিয়াছিলেন তখন তাহার ভিতরে ছন্দ, অনুপ্রাস এবং বাগ্বিলাসের দ্বারা মানুষের মনকে সুলভে ভুলাইবার যতই চেষ্টা থাক্, কবিতাটির ভিতরে আরও একটি গভীর সত্য ছিল, তাহা এই, কবির সকল ছন্দোনৈপুণ্য বাগ্বৈদগ্ধ্যের উপরে 'নন্দপুরচন্দ্রে'র একটি সত্যকার স্পর্শ পড়িয়াছিল, সেই স্পর্শই স্পর্শমণির মতন কবির সকল কবি-চেষ্টাকে স্বর্ণজ্যোতিতে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে।

প্রথম যৌবনের সবুজ মনের উপরে এই যে ঘনশ্যামলের লীলাস্পর্শ ইহা শুধু এই কবিতাটি সম্বন্ধে নয়, কবি কালিদাস রায়ের সমগ্র কবিজীবন সম্বন্ধেই একটি গভীর সত্য। সেই দিক হইতে বিচার করিলে এই কবিতাটির ভিতরে কবি প্রতিভার সমগ্ররূপের কোন ইঙ্গিত না পাইলেও কবি-প্রতিভার একটি প্রধান প্রবণতা এবং বিকাশ সম্ভাবনার ইঙ্গিত মেলে।

কাব্য প্রতিভার নানা বৈচিত্র্য সত্ত্বেও মনে হয়, একটি নিগূঢ় বৈষ্ণব প্রেরণা কবি কালিদাস রায়ের কাব্য প্রেরণার একটি মূল উৎস। সত্যকারের ভাল সাহিত্য যুগে যুগে যুগানুরূপ পরিবর্তনের ভিতর দিয়া নবনব রূপে আবর্তিত হয় এবং এই আবর্তনের ভিতর দিয়াই সে তাহার রসধারা—এমন কি প্রকাশ-ধারারও একটি অখণ্ডতা বহন করে। এইরূপেই ভারতবর্ষের রামায়ণ-মহাভারত আজ পর্যন্তও এক একটি অখণ্ড ধারা বহন করিয়া চলিয়াছে। বাঙলাদেশে 'বৃন্দাবনের কানু'কে লইয়া গীত-রসধারারও এমনই একটি অখণ্ড প্রবাহ রহিয়াছে। দ্বাদশ-শতকের জয়দেব কবির মধুর কোমল কান্ত পদাবলী লইয়া বাঙলাদেশে যে কাব্যধারার উৎসারণ, আজ পর্যন্ত বাঙলাদেশে সেই কাব্যধারার একটি অখণ্ড প্রবাহ চলিয়াছে। কবি কালিদাস রায়কে আমরা সেই কাব্যধারারই একজন উপযুক্ত ধারক বলিয়া বিবেচনা করি।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙলা-কাব্য-সাহিত্যের মোড় ফিরিয়াছিল; সব কীর্তন পাঁচালী শেষ হইয়া বীররসের মহাকাব্যের পালা আরম্ভ হইয়া গেল। কিন্তু মধুসূদন বৈষ্ণব কবিগণকে মুখে যতই অশ্রদ্ধা করুন না কেন, বৈষ্ণব কবিতার অমোঘ-আকর্ষণকে তিনিও উপেক্ষা করিতে পারেন নাই; তাই হ্যাটকোটের উপরেই ফোঁটা তিলক কাটিয়া তাঁহাকেও 'ব্রজাঙ্গনা-কাব্য' রচনা করিতে হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপরে বৈষ্ণব কবিতা কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাঁহার উপন্যাসের জন্য রচিত কয়েকটি গানে তাহার পরিচয় আছে। রবীন্দ্রনাথ এক সময়ে এই বৈষ্ণব-কবিতার ভাব, ভাষা ও ছন্দের ভিতরে একেবারে ডুবিয়া গিয়াছিলেন। তাহারই পরিচয় 'ভানুসিংহ-ঠাকুরের পদাবলী'তে। এই বৈষ্ণব-গীতি কবিতার ধারা উনবিংশ শতাব্দীকে অতিক্রম করিয়া বিংশ শতাব্দীতেও আসিয়া কবিচিত্তে দোলা দিয়াছে; সেই দোলায় এই বিংশ শতাব্দীতেও সার্থক বৈষ্ণব কবিতা সম্ভব হইয়া উঠিয়াছে, কবি কালিদাস রায়ের অনেকগুলি কবিতার ভিতরে আমরা পাই তাহারই প্রমাণ।

কালিদাস রায়ের এই জাতীয় কবিতাগুলির সার্থকতার ভিতরে আমরা দুইটি জিনিস লক্ষ্য করিতে পারি; প্রথমত দেখিতে পাই, তাঁহার এই জাতীয় কবিতাগুলির ভিতরে বৈষ্ণব কবিতার সত্যকারের প্রাণবস্তুটি প্রকাশ লাভ করিয়াছে,—সুর ভাব ভাষা সকল দিক হইতেই, কিন্তু এই প্রাণ-বস্তু লাভের জন্য তাঁহার যে কাব্যসাধনা তাহার ভিতরে কোনও কৃত্রিমতা নাই। তিনি বৈষ্ণব কবি হইতে গিয়া ভাষা ও ভাবের কোনও ছদ্মাবরণে নিজেকে ঢাকিয়া রূপান্তর গ্রহণ করিতে প্রয়াস পান নাই, বিংশ শতাব্দীর একজন কবির মনে বৈষ্ণব কবিতা অতি স্বাভাবিক ভাবেই যে ভাবানুরণন তুলিতে পারে কালিদাস রায়ের কবিতার ভিতরে আমরা তাহারই গীতবদ্ধ রূপ দেখিতে পাই। ভাবের দিক হইতে, ছন্দের দিক হইতে—ভাষার দিক হইতে তিনি পূর্বতন বৈষ্ণব-কবিতা হইতে অনেক কিছু গ্রহণ করিয়াছেন; এবং যাহা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা নিঃসঙ্কোচেই গ্রহণ করিয়াছেন এই গ্রহণ তাঁহার কাব্যপ্রতিভাকে কোথাও ক্ষুণ্ণ বা মলিন করে নাই; পূর্বপুরুষগণের সঞ্চিত ধনের গ্রহণ অধিকার-

তাঁহার প্রতিভার মহিমাই বর্ধিত করিয়াছে। এই পূর্বধন গ্রহণ কাব্যে বিনি তাঁহার স্বকীয় বিশিষ্টতাকে বিসর্জন দেন নাই; তাঁহার রচিত বৈষ্ণব কবিতার ভিতরে মধ্য যুগের বাঙলা কবিতার সহিত বিংশ শতাব্দীর বাঙলা কবিতার একটি সহজ সঙ্গতি স্থাপিত হইয়াছে। এই সহজ যোগে পূর্ববর্তী কবিগণও মহিমান্বিত—পরবর্তী কবিও প্রাচীন ঐতিহ্য এবং কাব্য-ধারার সহিত অখণ্ড যোগে মহিমান্বিত।

কালিদাস রায়ের এই জাতীয় কবিতাগুলির ভিতরে পূর্বাপরের যোগ কিভাবে সম্ভব হইয়াছে এবং সহজ হইয়াছে তাহা অনুসন্ধান করিতে গেলে একটি সুন্দর জিনিস লক্ষ্য করিতে পারি। কালিদাস রায়ের পল্লী কবি বলিয়া খ্যাতি আছে। তিনি যে শুধু পল্লীর প্রকৃতিকেই ভালবাসেন তাহা নহে, পল্লীর সহজ সাদা মানুষগুলি—তাহাদের অনাড়ম্বর অথচ প্রাণ-চঞ্চল প্রীতি-স্নিগ্ধ জীবন যাত্রাকেও তিনি ভালবাসেন। তাঁহার রচিত বহু কবিতার ভিতরেই এই পল্লীর প্রতি একটা শুধু প্রীতি নয়, একটা 'মোহ' প্রকাশ পাইয়াছে। একদিকে পল্লীর সহিত তাঁহার কবিচিত্তের যেমন একটা সহজাত মোহ-বন্ধন, অন্য দিকে তেমনই নগরের প্রতি তাঁহার চিত্তের রহিয়াছে একটা অনুরূপ সহজাত বিমুখতা। আমার মনে হয়, তাঁহার কবিচিত্তের ভিতরে পল্লীর এই সহজ সরল শ্যামল ও কোমল, প্রাণ-চঞ্চল, প্রীতিস্নিগ্ধ রূপটিই বৃন্দাবনধামের সহিত মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে; আর ঐশ্বর্যগর্বিত শক্তি-প্রমত্ত নীরস এবং প্রাণহীন নাগরিক জীবনই তাঁহার নিকট মথুরা ভূমি। কবি নিজেও যেন এই পল্লীর বৃন্দাবন হইতে নগরের মথুরায় স্থাপিত হইয়া কেমন যেন বেদনা ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছেন; তাঁহার দু'একটি কবিতায় যেন এই বেদনাই মাথুর-বেদনায় রূপান্তরিত হইয়া উঠিয়াছে। রাখালরাজা কবিতাটির ভিতরে কৃষ্ণকে বৃন্দাবনের যে সব লোভের কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে তাহাতেই এই সত্যটি রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে :—

অবুঝ কানু, ফেলে ব্রজের খেলা
কার মায়াতে পালিয়ে গেলি ভাই?
সেথায় কেবল হাতী-ঘোড়ার মেলা,
তোর ত সেথা খেলার সাথী নাই।
কোথায় সেথায় দূর্বাঘন গোঠ,
রাখালদলে খেলার হেন জোট,
ননীর মত কোমল ধবল দেহ
কোথায় সেথা এমন দুধল গাই।
এমন রাখাল-রাজ্যখানি কেহ
হেলায় ঠেলে পালায় কি রে ভাই?

* * *

দুপুররোদে সেথায় তরুর তলে
কোথায় পাবি মধুর মৃদু হাওয়া?
কোথায় সেথা নীল কালিন্দীজলে
কলকলিয়ে সাঁতার কেটে নাওয়া?

সেথায় কি রে গভীর কালীদ'য়
কমল-কুমুদ নিত্য ফুটে রয় ?
গায়ের ঘামেও ঘনায় ঘুমের ঘোর,
কোথায় এমন ঘুমে নয়ন ছাওয়া ?
রোদের তাতে তাত্‌লে তনু তোর
গাছের ছায়ায় কোথায় পা'বি হাওয়া ?

'মথুরাদ্বারে' কবিতাটির ভিতরে গোকুল হইতে আগত কৃষ্ণ দর্শনপ্রার্থী যে লোকটির বর্ণনা দেখিতে পাই, সেও-কি প্রাণের টানে ছুটিয়া আসা নাগরিক কায়দা কানুন না জানা মলিন বসন ধূলামাখা গ্রাম্য লোকটি ?

ছেঁড়া ধড়া পরা, পথধূলি ভরা শরীরে ঘামের রেখা,
তাই ব'লে কি রে যেতে হবে ফিরে, পাব না কানুর দেখা ?
তুমি ত জান না, প্রহরি, তোমার রাজাটি মোদের কে !
এই ধূলিমাখা বুকে মাথা রেখে মানুষ হয়েছে সে।
আমরা কাঙাল অবোধ গোয়াল, সে আজি অনেক বড়।
ও চরণে ধরি তোরণ প্রহরি, তাড়ায়ো না, দয়া কর।

প্রতিভাশালী কোন কবি পূর্বতন কোন সাহিত্য-ধারাকে পরবর্তীকালে যখন গ্রহণ করেন তখন তিনি শুধু মাত্র অন্ধ অনুকরণ করেন না, পূর্বধারাকে তিনি তাঁহার নবপ্রতিভা স্পর্শে নূতন করিয়া সৃষ্টি করিয়া লন। এই নব ভাবে সৃষ্টির ভিতর দিয়া তিনি পরবর্তী ভাবধারাকে যুগোপযোগী করিয়া ঈষৎ পরিবর্তন করিয়াই লন না, এই পরিবর্তনের ভিতর দিয়া তিনি প্রাচীন কাব্যরূপের ভিতরে নূতন এবং বিচিত্র অর্থ সঞ্চার করিয়া দেন। এই নূতন অর্থ সঞ্চারই পুরাতন কাব্যরূপে নূতন প্রাণ সঞ্চার করে, নতুবাই হয় প্রাণহীন অনুকরণ। কবি কালিদাস রায়ও যে বৈষ্ণব-কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহার ভিতরে নূতন অর্থ সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। 'নৌকাবিলাস' সম্বন্ধে কবিতা রচনা করিতে গিয়া কবি বলিয়াছেন,—

মানভার লজ্জাভার ঋণভার, সজ্জাভার,
মায়া-মোহ-শৃঙ্খলের বোঝা
সাথে মোর হাতে ঘাড়ে, শির পৃষ্ঠ ন্যুব্জ ভারে,
পার হওয়া মোর নয় সোজা।
ভারমুক্ত নাহি হ'লে 'মোরে পার ক'র ব'লে
কাণ্ডারিরে ডাকিব কি করি' ?
বাহি' দাঁড় যায় আসে, কোন ভার লয় না সে,
কোন ভার সয় না সে তরী।
সবচেয়ে গুরুভার লালসার বাসনার
ভারী যেন বিশাল পাষাণ,

কেমনে এ ভার কাটে ভাবি ব'সে পার-ঘাটে,
স্মরি নৌকা-বিলাসের গান।

আমরা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের তত্ত্বদৃষ্টি লইয়া যদি বিচার করিতে বসি তবে বলিতে পারি, উপরের নৌকাবিলাসতত্ত্ব ঠিক ঠিক বৈষ্ণব কবিগণেব নৌকা-বিলাসতত্ত্ব নহে; তাঁহাদের নৌক-বিলাস অপ্রাকৃত বৃন্দাবনধামে রাধাকৃষ্ণের অনন্ত-বিচিত্র নিত্য বিলাসেরই একটি প্রকারভেদ মাত্র। কিন্তু রাধাকৃষ্ণের সেই রস-বিলাসের বর্ণনাই কবির চিত্তে নূতন ভাব ও ভাবনার অনুরণন তুলিয়া দিয়াছে। তাই নৌকা-বিলাসেব পদ অবলম্বন কবিয়া কবি বলিতেছেন—

আজি খেয়াঘাটে পড়ি অই চিত্র শুধু স্মরি,
চোখে মোর ঝরে অশ্রুজল।
বেদনা-বিধুর চিতে সেই অশ্রুজলে তিতে
বাসনা-বসন হয় ভারী।
বসনে গুণ্ঠিত-মন বাসনা কুণ্ঠিত জন
অকূলে কেমনে দিবে পাড়ি?

মাথুর বেদনার স্বরূপটি প্রকাশ করিতে গিয়া কবি বলিয়াছেন, কৃষ্ণ যে বৃন্দাবন ছাড়িয়া মথুরায় প্রস্থান করিয়াছেন, ইহা আসলে—

গন্ধে মিলাইল ধূপ, অরূপ হইল রূপ,—অনির্বচনীয়,
ইন্দ্রিয়েব রসানন্দ ভাবে হ'যে নিমগন হ'ল অতীন্দ্রিয়।

ইহা হইল রবীন্দ্রযুগের বৈষ্ণবতা, সে বৈষ্ণবতা ঠিক রাধাকৃষ্ণকে লইয়া নহে, সে বৈষ্ণবতা হইল রূপ-অরূপকে লইয়া। এ যুগেব কবি কালিদাস রায়ও তাই বলিলেন,—

অরূপ ফিরেনি রূপে, গন্ধ ফিরেনি ক' ধূপে, শ্যাম বৃন্দাবনে,
তাই আজো রাধিকার বিলাপন হাহাকার ধ্বনিছে ভুবনে,
গুমরে গিরির বুকে, উৎসের উৎসের মুখে, তটিনী-প্রপাতে,
মর্মরিছে বনে বনে, মন্দ্রিতেছে ঘনে ঘনে জলদ-সংঘাতে।
জীবনে জীবনে ব্যথা জাগায় কি ব্যাকুলতা অজানার টানে,
মুখে অন্ন নাহি রুচে, চোখে ঘুমঘোর ঘুচে চাহি কার পানে?
সে বিরহ আজো বাজে, মন নাহি লাগে কাজে, কারে যেন চায়,
কারে নাহি পেয়ে বুকে সংসারের কোন সুখে প্রাণ না জুড়ায়।
মান যশ ধন জন তৃপ্ত করে নাক' মন, মিটে নাক' সাধ,
একজনে না পাওয়ায় সবি ব্যর্থ হ'য়ে যায়, সকলি নিঃস্বাদ।

বৈষ্ণবকবিতার ভিতরে প্রেমের গভীরতা অনেক আছে, কিন্তু এমনতর ব্যাপকতার ব্যঞ্জনা কম। প্রেমকে বৈষ্ণব কবিগণ অপ্রাকৃত পরাব্যোমেস্থিত এক বৃন্দাবনের সামগ্রী করিয়াই রাখিয়াছিলেন, উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর কবিগণ সেই অপ্রাকৃত বৃন্দাবনের সামগ্রীকে আবার প্রাকৃত জগৎ এবং জীবনের ভিতরেই ছড়াইয়া দিয়া তাহাকে নূতনভাবে নিবিড় করিয়া আস্বাদন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

কালিদাস রায়ের কাব্যপ্রতিভা

ডঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

জন্মেছিনু সূক্ষ্ম তারে বাঁধা মন নিয়া
চারিদিক হতে শব্দ উঠিত ধ্বনিয়া
নানা কম্পে নানা স্বরে।

বলতে কি প্রতি কবিরই মন সূক্ষ্ম তারে বাঁধা থাকে; তা না হলে তিনি কবি হতে পারতেন না। কারও বেশী থাকে, কারও কম থাকে, যাঁর থাকে না, তিনি কবি হতে পারেন না। কারণ, কবিতার মূল উপাদান হল অনুভূতি। কবির কাজ হল নিজে যে তীব্র অনুভূতির অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গিয়েছেন; তাকে ভাষায় রূপ দেওয়া। আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলি আমাদের অহরহ নানা অভিজ্ঞতা এনে দিচ্ছে। তাদের যেগুলি সংবেদনশীল মানুষের হৃদযে আলোড়ন সৃষ্টি করে, সেগুলিই পরে তাঁর লেখনীর মাধ্যমে কবিতার আকারে আত্মপ্রকাশ করে। যাঁর মন সংবেনশীল তিনিই মেঘের গায়ে অস্তগামী সূর্যের রাঙিমা প্রতিফলিত হতে দেখে তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হন। তিনি সেই অনুভূতিকে বিষয় করে কবিতা লিখতে পারেন। যাঁর মন সংবেদনশীল নয়, তাঁর মনে মেঘের রাঙিমা কোনও আলোড়ন সৃষ্টি করে না। তিনি কবি হবার ক্ষমতা রাখেন না।

এখন এই কাব্যশক্তির বিকাশ নির্ভর করে সংবেদনশীলতার গভীরতায়, অভিজ্ঞতার ব্যাপকতায়, মননশক্তির তীক্ষ্ণতায় এবং রচনাশৈলীর বৈচিত্র্যে। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সবই প্রচুর মাত্রায় ছিল; তাই তিনি বিশ্বকবি, তাই তিনি কবি-সার্বভৌম। কবি কালিদাস রায়ের ভাণ্ডারেও এই গুণগুলি অল্পবিস্তর ছিল; তাই তিনি রবীন্দ্রনাথের যুগে জন্মগ্রহণ করেও কবি হিসাবে খ্যাতি অর্জন করতে পেরেছিলেন এবং বাংলা কাব্যসাহিত্যে একটি সম্মানিত স্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। বর্তমান প্রবন্ধে এই উপাদানগুলির ভিত্তিতে কালিদাস রায়ের কাব্যপ্রতিভার একটি সংক্ষিপ্ত মূল্যায়নের চেষ্টা করা হবে।

সংবেদনশীল মনের ভাল পরিচয় হল এমন বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া, যা সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। কাজেই যিনি প্রকৃত কবি তিনি জীবনের নানা অভিজ্ঞতার মধ্যে এমন জিনিস খুঁজে পান, যা তাঁর মনে আনন্দ বা বেদনার উদ্রেক করে। অন্যের হৃদয়কে যা স্পর্শ করে না, তা তাঁর হৃদকে স্পর্শ করে। ফলে সেই অনুভূতিকে ভিত্তি করে অনবদ্য কবিতা জন্মলাভ করে। কবি কালিদাস রায়ের কাব্য-ভাণ্ডারে তার অনেক উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যাবে। তার কয়েকটির এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

কর্ণিকার বা সোঁদাল ফুলের গাছ বাংলার গ্রামে আশেপাশে দেখা যায়। কলিকাতার ম্যাডক্স স্কোয়ারে অনেকগুলি আছে। এ গাছগুলির এমনি কোনও শোভা নেই; কিন্তু বসন্তের পদার্পণে

তাকে স্বাগত জানাবার জন্ত তা এমন সুন্দর সাজে যে যার সৌন্দর্য দেখবার চোখ আছে, তাকে আকৃষ্ট না করে পারে না। মহাকবি কালিদাস তার প্রশস্তি রচনা করে গেছেন। আমাদের কবি কালিদাস রায়ের সংস্কৃতে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। তাই তার সম্বন্ধে যে কবিতাটি রচনা করেছেন, তার নাম দিয়েছেন 'কর্ণিকার'। তার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করলেই বোঝা যাবে তার গুণে তিনি কতখানি মুগ্ধ হয়েছিলেন :

আজি বসন্তে বন-দিগন্তে
উঠেছে ফুটিয়া সোনার খনি।
মাটির তলের যত সোনা আজি
কাঙাল তরুকে করেছে ঋণী ॥ (কর্ণিকার)

কোনও বন্ধ্যা রমণীর বেদনা তাঁর মনে ব্যথা দিয়েছে। তাই নিজের মুখেই কবি তার সেই বেদনার গভীরতা অতি নিপুণ হস্তে বর্ণনা করেছেন এইভাবে :

আদর করে ডাকব বলে করেছি হায় পছন্দ
কত নাম, যা নেইক গোটা গাঁয়ে,
কোথায় আমার যাদুমাণিক ভবনভরা আনন্দ;
আসবি কবে ? কাল যে বহে যায় ॥ (বন্ধ্যার খেদ)

আর একটি দৃষ্টান্ত দিয়েই এই প্রসঙ্গ শেষ করবার প্রস্তাব করি। আমরা যারা বৃদ্ধ বা প্রৌঢ় অবস্থায় এখনও জীবিত আছি তাদের কাছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হল অবিস্মরণীয়। তার স্থাপত্য যেমন সুন্দর ছিল, তেমন তার সঙ্গে আমাদের কত স্মৃতি বিজড়িত ছিল। কর্তৃপক্ষের নির্দেশে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিক জন্মদিবস উৎসবের অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে তাকে নির্মমভাবে ভেঙ্গে ফেলা হল নূতন আকাশচুম্বী অট্টালিকা নির্মাণের জন্ত।

তার জন্ত ক'জন খেদ করেছেন ? আর যাঁরা করেছেন তাঁদের মধ্যে ক'জনের বেদনা কবিতারূপে মূর্ত হয়ে উঠেছে ? কবি কালিদাস রায়ের হাতে তাঁর বেদনা কাব্যরূপ পেয়েছিল। তিনি এখানে অনেকের হয়ে কথা বলেছেন :

ব্যথা যে অবুঝ বড়, যুক্তি সে না মানে।
এই যে সেনেট হল এর অঙ্গে গাঁইতি যে হানে
শত শত শ্রমিকেরা হর্ষে, শুধু সে আঘাত নয়,
মর্মে পায় সে আঘাত সহস্র হৃদয় ॥

কবি কালিদাস রায়ের অভিজ্ঞতা সীমিত। তিনি বহরমপুরে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। তারপর তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবন অতিবাহিত হয় শিক্ষকতার কাজে। ভবানীপুরের মিত্র ইনস্টিটিউশনে তিনি কয়েক দশক ধরে শিক্ষকতা করেছেন। তিনি ছিলেন সেই বিদ্যালয়ের দীর্ঘকালের ভূষণ। কাজেই তাঁর অভিজ্ঞতা সীমিত হতে বাধ্য। গ্রাম্যজীবনের সহিত তাঁর পরিচয় আছে তাই দেখি নৈসর্গিক সৌন্দর্য। কলিকাতার নগরজীবনের সহিতও তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তাই দেখি কলিকাতাকে বিষয় করে বেশ কিছু কবিতা রচিত হয়েছে।

বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবনের সহিত তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবন তাঁর কবিতায় নানাভাবে চিত্রিত হয়েছে। এককালে তিনি চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত সাহিত্য অধ্যয়ন করেছিলেন। তাই দেখি তিনি মহাকবি কালিদাসের গুণে বিশেষ মুগ্ধ। তাঁর প্রতি তিনি নানাসূত্রে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন; কোথাও তাঁর 'ঋতু সংহারের' অনুসরণে বিভিন্ন ঋতুর উপর কবিতা রচনা করে, কোথাও অন্যভাবে। তাই তাঁর কবিতার ক্ষেত্রের সীমাবদ্ধতার বিষয় মনে হয় তিনি বিশেষ অবহিত ছিলেন। তিনি নিজেকে 'বাঙালীর কবি' বলেই পরিচয় দিয়েছেন। তা যে বর্তমান যুগে রুচিসম্মত নয়, তাও তিনি অবহিত ছিলেন। প্রাসঙ্গিক উক্তিটি এই—

আমি বাঙালীর কবি, বাঙালীর অন্তরের কথা,
বাঙালীর আশা-তৃষা, স্মৃতি-স্বপ্ন, চিরন্তন ব্যথা
ছন্দে গেয়ে যাই আমি।

*　*　*

তুলসীর দীপসম তাহাদেরি তরে মোর বাণী
গৌরবের কথা নয় এ যুগে, জানি তাও জানি॥

(শেষকথা)

বাঙালীর জীবনের, বিশেষ করে মধ্যবিত্ত পরিবারের সুখ-দুঃখের কথা তাঁর কাব্যে চিত্রিত হয়েছে। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবং গভীর অনুভূতিকে আশ্রয় করে লেখা বলে সে কবিতাগুলি ভারি মর্মস্পর্শী হয়েছে। এখানে তার কিছু উদাহরণ দেওয়া প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে।

বাংলার পল্লীর নৈসর্গিক শোভা তাঁর মনকে দোলা দিয়েছে। তার ফলে কয়েকটি সুন্দর মর্মগ্রাহী বাণী পাই। তাদের মধ্যে কিছু চয়ন করে এখানে উপস্থাপিত হল। একটি কবিতায় পাই—

মাঝিদাঁড়ি গান গেয়ে যায়
কোন্ সুদূরে পাল তোলে নায়
মন উড়ায়ে বলাকা ধায় নিরুদ্দেশে॥

(বাংলা দেশ)

গ্রামের যে সব বস্তু তাঁর মনকে আকর্ষণ করে তাদের তালিকা এই কাব্যাংশে পাই :

তুলসী ছায়ায় ঢাকা　　লক্ষ্মীর চরণ আঁকা
কুটির অঙ্গনে,
শ্যাম গোঠে, দীঘিজলে　　তব দোলমঞ্চ তলে
বেণু কুঞ্জবনে।

(প্রত্যাবর্তন)

বাঙালীর ঘরে ভাজ-ঠাকুরপো সম্পর্কটি বড় মধুর। স্বামীর অনুজের পত্নী হল আদরের বৌদিদি। তাঁকে কেন্দ্র করে যে কতগুলি মধুর রসের ধারা একত্রিত হয়ে গেছে তা ধারণা করা যায় না। আমাদের কবি তার কিছু পরিচয় দিয়েছেন এই ভাবে—

বধূর মাধুরী, দিদির আদর, জননীর ভালবাসা,
কানে মন্ত্রণা, প্রাণে সান্ত্বনা, ভবে ভাবনার আশা,

…মমতা, ক্ষমার ক্ষমত, সকলি মিলায়ে বিধি
এই বঙ্গের ঘরে ঘরে তোমা পাঠায়েছে বৌদিদি ।

কবি কালিদাস রায় মননশক্তির তীক্ষ্ণতার যে বিশেষ পরিচয় রেখেছেন, তা সবিশেষ প্রশংসার যোগ্য। তাঁর কল্পনা অবশ্যই আকাশ ছোঁয়া নয়। তাই তিনি মাটির পৃথিবীর কবিই রয়ে গেছেন। তাঁর ধী শক্তি তাঁকে শুধুমাত্র দার্শনিক চিন্তায় আকৃষ্ট করেনি। তাই তাঁর কাব্যে দর্শনের কোনও ছায়া পড়ে না। আর কবিশেখরও খাঁটি বাঙালীর কবি হয়ে থাকতে পেরেছেন তারই ফলে। বাঙলাদেশকে চিনতে হলে তাঁকে পড়তে হবেই। কবিতার উৎকর্ষ কিসে বর্ধিত হয়, কবিতার রসগ্রহণ করতে কোন্ শ্রেণীর পাঠক উপযুক্ত এ বিষয় তাঁর অভিমত অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ। সাহিত্যের সমালোচনা ও রসবেত্তার ক্ষেত্রে তিনি এযুগের অন্যতম চিন্তাশীল ব্যক্তি। সেই কারণেই বোধহয় সমালোচক হিসাবেও তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। এবার কবিতা সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্যের কিছু উদাহরণ স্থাপনের প্রস্তাব করি।

আমাদের এই কবির মতে দুই শ্রেণীর কাব্যরসিক থাকে। এক শ্রেণী, কবিতাকে বিশ্লেষণ করে তার মধ্যে তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারে আগ্রহশীল। তারা হৃদয় দিয়ে কবিতা পাঠ করে না, বুদ্ধি দিয়ে পাঠ করে। আর এক শ্রেণীর কাব্যরসিক হৃদয় দিয়ে কবিতার আস্বাদ গ্রহণ করে, তারা কবিতার বিশ্লেষণে আগ্রহী নয়। তাঁর ধারণায় এই দ্বিতীয় শ্রেণীই প্রকৃত কাব্যরসিক, তাদের শিল্পবোধ পরিস্ফুট। এই মন্তব্যটি যে শিল্পতত্ত্বের একটি মৌলিক নীতি দ্বারা সমর্থিত তা এখানে বলা বাহুল্য। কাজেই দেখি, এই শ্রেণীবিভাগের কথা উল্লেখ করে দ্বিতীয় শ্রেণীকেই তিনি বরণ করেছেন। এই প্রসঙ্গে একটি কাব্যাংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে। এই দ্বিতীয় শ্রেণীকে উদ্দেশ করে তিনি বলছেন—

অবশ্য নয়ক তারা ডিগ্রীধারী বড় অধ্যাপক,
ব্যারিষ্টার, সাহিত্যিক কিম্বা সম্পাদক,
বুদ্ধি দিয়া বিশ্লেষিয়া বুঝে না, খুঁজে না মতবাদ
কোন তত্ত্ব, কোন তথ্য, করে শুধু রসের আস্বাদ ॥

(যারা হৃদয় দিয়ে কাব্য বুঝে)

এই শ্রেণীর কাব্যরসিকের জন্য তিনি এই প্রশস্তি রচনা করেছেন :

এস বন্ধু এস কাছে, তোমার হৃদয় আছে
চুলচেরা কর না বিচার।
আঙুর পাইলে হাতে করো নাকো পরীক্ষাতে
রসায়নী বিশ্লেষণ তার ॥

(রসজ্ঞের প্রতি)

কবি কালিদাস রায়ের রচনানৈপুণ্য কবিতাকে আকর্ষণ শক্তিমণ্ডিত করবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। প্রথমেই উল্লেখ করতে পারি যে তাঁর প্রথম জীবনের রচনার যমক ও অনুপ্রাসে

সমৃদ্ধ সংস্কৃত গোড়ীয় রীতির আদর্শ বিশেষ ভাবে স্বীকৃতি লাভ করে। সেই যুগে রচিত তাঁর 'নন্দপুরচন্দ্র' বিষয়ক কবিতা তাঁর প্রসিদ্ধ কবিতাগুলির মধ্যে অন্যতম। এখানে বোধহয় তাঁর উপর ভবভূতি, জয়দেব ও বৈষ্ণব কবিদের প্রভাব সক্রিয় ছিল। তাঁর রচিত একটি জয়দেবের প্রশস্তিসূচক কবিতাও আছে। স্বতই তা জয়দেবের রীতিতেই রচিত। তার অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হল :

> শ্যাম মঞ্জুল বকুল বন কুঞ্জবিতান তলে,
> শয্যা তোমার সজ্জিত চির শ্যামল পুষ্পদলে ॥

এই কারণে বৈষ্ণব কবিতার প্রতি তাঁর আকর্ষণ একদিন গভীর ছিল। কিন্তু মনে হয় পরবর্তী কালে তিনি সেই রীতির প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়েছিলেন। তিনি অনুভব করেছিলেন ভাষার ছটার চেয়ে অনুভূতির গভীরতা কাব্যের উৎকর্ষসাধনে বেশী উপযোগী। এই প্রসঙ্গে তাঁর এই মন্তব্যটি লক্ষ্য করা যেতে পারে :

> ভাষা তার পরকীয়, ভাব তার নয় স্বীয়
> বৈষ্ণব কবির
> ছন্দে স্বরে যশ তার, ধার করা রস ভার
> নয়ক গভীর ॥
>
> (নন্দপুরচন্দ্র)

তাই সম্ভবত তাঁর যমক অনুপ্রাসে অলঙ্কৃত গোড়ীয় রীতির অনুসরণে অবলম্বিত রীতির প্রতি আকর্ষণ পরে শিথিল হয়ে পড়েছিল। তিনি ভাবের উপর বেশী জোর দিয়ে ভাষাকে সহজ করে দিয়েছিলেন। এই রীতিতে রচিত কবিতার প্রচুর উদাহরণ তাঁর কাব্যগুলিতে মিলবে। এখানে একটি উদ্ধৃত করলেই চলতে পারে। কলিকাতার গড়ের মাঠে গরুচরার দৃশ্য দেখে কবি লিখেছেন :

> চাহিলে সৌধের মালা শোভে সারি সারি
> বামে শত শত ধেনু মুখে তৃণ করিছে ভোজন
> মথুরার পরপারে যেন বৃন্দাবন ।।
>
> (চৌরঙ্গীর পথে)

কবি কালিদাস রায়ের রচনারীতির প্রসঙ্গে অবিস্মরণীয় দুটিগুণ লক্ষণীয়। একটি তাঁর উপমা প্রয়োগে বিশেষ নৈপুণ্য এবং অন্যটি নির্মল পরিহাস দিয়ে কৌতুকরস সৃষ্টি বা শ্লেষাত্মক বক্রোক্তি রচনায় পারদর্শিতা। তাঁর এই দুটি গুণের কিছু পরিচয় দেওয়া এখানে প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে।

প্রথমে উপমা প্রয়োগে কৃতিত্বের কথা ধরা যাক। এই উপমা কোথাও নয়নরঞ্জন সুখানুভূতি ভিত্তি করে, কোথাও প্রাচীন কাহিনী ভিত্তি করে, কোথাও পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে ভিত্তি করে।

নয়নরঞ্জন সুখানুভূতি-ভিত্তিক উপমার উদাহরণ হিসাবে এই কাব্যাংশটি নেওয়া যেতে পারে। পল্লীগ্রামে বসন্তের শ্যামলিমার সঙ্গে শিমুল-পলাশের রাঙা রঙের মিশ্রণ কবির মনে এই উপমাটি ফুটিয়ে তুলেছে :

যতদূর দৃষ্টি ধায় নয়ন জুড়ায়ে যায়
তরঙ্গিত শ্যামল উচ্ছ্বাস,
শ্যামলীর সিঁথি পরে সিন্দুর লেপন করে
মাঝে মাঝে শিমুল পলাশ॥ (পল্লীশ্রী)

প্রাচীন কাহিনীকে ভিত্তি করে রচিত উপমা হিসাবে এই কাব্যাংশটি স্থাপন করা যেতে পারে। এখানে বর্ষার ঘন নীল মেঘ সীতার বিচ্ছেদে কাতর রামায়ণের নায়ক রামের কথা কবি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন :

এসেছে বরষা, দলিতাঞ্জন-বিগলিত ধারা
ঝরিয়া পড়ে।
নব ঘনরূপ রামের নয়নে সীতাশোক যেন
অশ্রু ঝরে॥ (বর্ষায়)

তৃতীয় শ্রেণীর উপমার উদাহরণ হিসাবে কবির বর্ণিত টবের গাছের আক্ষেপের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে :

বন্দী আমি বারান্দাতে টবের চারা গাছ।
খাঁচায় পোষা ময়না, যেন চৌবাচ্চার মাছ॥
(টবের গাছ)

কবি কালিদাস রায় পরিবেশিত কৌতুকরসের দুটি রূপ দেখতে পাই। একটি বিশুদ্ধ ভাবেই কৌতুক। তার অতিরিক্ততার মধ্যে কিছু পাওয়া যায় না। মনে সুড়সুড়ি দিয়ে মুখে হাসি ফোটানর অতিরিক্ত কোনও উদ্দেশ্য তার মধ্যে নেই। যেমন নীচে উদ্ধৃত পংক্তিটি। সকল দোকানী তাদের দোকান পণ্যদ্রব্য দিয়ে সাজিয়ে রেখেছে গৃহিণীদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য। কাজেই বাজারই বউদের জন্য :

বাজার মানেই বৌবাজার,
বৌঝিদেরই মন যোগাতে বাজারে জিনিস রয় হাজার॥
(বৌবাজার)

অন্যরূপে যে ব্যঙ্গকবিতা পাই তা বক্রোক্তিতে পরিণত হয়েছে। তবে তার দ্বারা যে আঘাত হানা হয়েছে তা জোরে আঘাত করে না, মৃদু প্রতিবাদ করে। তা কোথাও কোথাও খেদোক্তি রূপেও নিজের উপর প্রযুক্ত হয়েছে।

প্রথমটির উদাহরণ হিসাবে 'বন্ধু স্মৃতি' শীর্ষক কবিতাটির উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানে বর্ণনীয় বিষয় হল এককালে যে বন্ধু ছিল সে ভাগ্যগুণে এখন ধনী হয়ে উঠেছে। কাজেই সে কবিকে তাচ্ছিল্য করে। তাই মোটর চড়ে যেতে যেতে পায়ে হাঁটা বন্ধুকে পথে দেখলে এড়িয়ে চলে :

শাঁসালো শ্বশুর কারো,
কেহ করে কারবারও,
কেহ ধনবান রণলক্ষ্মী প্রসাদাৎ।

পায়ে ছিটাইয়া কাদা
দেখে দ্রুত ধাও দাদা
মোটর ছুটায়ে যেন শহরে ডাকাত ।।

(বন্ধুস্মৃতি)

এই ধরণের শ্লেষরঙ্গে রীতিমত আমরাও জড়িত। এ যেন আমাদের কথাই তাঁর মুখে উক্ত।

ঐ শ্রেণীর বক্রোক্তির আরও একটি সুন্দর উদাহরণ পাওয়া যায়। এখানে আঘাত এত মৃদু এবং নৈর্ব্যক্তিক যে তা সামান্যই গায়ে লাগে :

লাউড-স্পীকার হাঁকছে সারা শহরে
—ফুরায় না তা ফুরায় না।
কবিতা বই পাঁচশ, পঁচিশ বছরে
—ফুরায় না তা ফুরায় না ।।

(ফুরায় না)

তিনি এমন ভদ্রশান্ত যে আঘাত দিতেও ইতস্তত করছেন।

দ্বিতীয় শ্রেণীর বিশুদ্ধ কৌতুকরসবাহী কবিতার কিছু উদাহরণ দিয়েই এই আলোচনা শেষ করা যেতে পারে।

পকেটে পয়সা নেই অথচ শহরের দোকানগুলিতে বহু লোভনীয় পণ্যের আকর্ষণকে দমন করতে না পেরে কবি ক্ষোভ করে বলেছেন :

যদি ধন দিলে না গাঁঠে
কেন সারা শহর ভরে দিলে এমন দোকান পাটে ?

(ধন দিলে না)

আর একটি কবিতায় পাই বহু সন্তানের জ্বালায় বিড়ম্বিত-জীবন দম্পতির দুর্দশায় মনে দাগ দেয় এমন একটি বর্ণনা। এটি বর্তমান কালে পরিবারের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে সরকারের যে জোর আন্দোলন চলেছে তাতে ব্যবহারের বেশ উপযোগী :

ষষ্ঠী মায়ের কৃপায় ক্রমে বাড়ে জ্বালাই
কোলে, পেটে, পিঠে সবাই আপদ বালাই,
সব কটা যে রয় না বেঁচে রক্ষা তবু ।।

(বাংলায় মেয়ে)

প্রাচীন বাংলা সাহিত্য ও কালিদাস রায়

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

কবিশেখর কালিদাস রায়ের আর একটি মহান্ পরিচয় তাঁহার সমালোচন সাহিত্য। কালিদাস রায়ের প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য সম্পূর্ণ নূতন ধরনের বই। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যোদ্যানে কবিতার কুঞ্জবনে একজন কবি পথপ্রদর্শক হইয়া আমাদের হাত ধরিয়া লইয়া যাইতেছেন, কবিদের রচনা বুঝাইয়া দিতেছেন, কিভাবে কাব্যামৃতরস আস্বাদ করিতে হয় তাহা সেই অমৃতরসের পাত্র মুখের সামনে তুলিয়া ধরিয়া আমাদের দেখাইয়া দিতেছেন। এই বইগুলি প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস নহে, কিন্তু শুষ্ক ইতিহাসের উর্ধ্বে যাহা অবস্থিত, সেই রসবস্তুর বিশ্লেষণ, ভাব সম্পুটের উন্মোচন ইহার উদ্দেশ্য।

"প্রাচীন সাহিত্য" বলিলেই আমাদের মনে একটা সম্ভ্রম জাগে—প্রাচীনকালে আমাদের পিতৃ-পুরুষদের হাত হইতে যাহা বাহির হইয়াছিল তাহার সবটাই বুঝি সাহিত্য পদবাচ্য। কিন্তু বাস্তবিকই প্রাচীন রচনার অনেকখানিই সাহিত্য পদবাচ্য নহে। তবে যাহা সত্যকার সাহিত্য নহে, রস যাহাতে নাই, তাহাও আমরা শ্রদ্ধার সহিত দেখিয়া থাকি তাহার নিজরূপে তাহাকে আবিষ্কার করিয়া তাহার সংরক্ষণ করিতে চাই এই জন্য যে তাহার অন্যবিধ মূল্য আছে। তাহা ঐতিহাসিক, ভাষাতাত্ত্বিক অথবা নৃতত্ত্ববিদের মতন বিশেষজ্ঞদের উপজীব্য হইয়া থাকে। কিন্তু সাধারণ পাঠক তাহা হইতে সাহিত্য-রস পাননা বলিয়াই তাহাকে এড়াইয়া থাকেন। তাহার সম্বন্ধে সম্ভ্রম থাকে, কিন্তু তাহাকে ভালবাসা সম্ভব হয় না।

কবিশেখর কালিদাস রায় সাধারণ শিক্ষিত বঙ্গসাহিত্যানুরাগীর প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই উপাদেয় বইগুলি লিখিয়াছেন, প্রাচীন বাঙ্গালার বাঙ্ময় সঞ্চয়ের মধ্যে যাহা সত্যকার সাহিত্য, যাহাতে উপভোগ্য রসবস্তু বিদ্যমান, তাহারই তিনি প্রকাশনে আত্মনিয়োজিত হইয়াছেন, তাঁহার এই সাধনা সার্থক হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যের সৌন্দর্যের এবং তাহার অসম্পূর্ণতার, তাহার দোষগুণ উভয়েরই বিচার এমন মার্জিত রুচি ও সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক বুদ্ধি ও সাহিত্যবোধ লইয়া ধারাবাহিকভাবে আর কেহ করিবার চেষ্টা করেন নাই।

প্রথমপর্বের সূচীপত্র হইতে ইহার আলোচনার ক্ষেত্র বুঝা যাইবে। দেখা যাইতেছে, কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও মঙ্গলকাব্য সম্বন্ধে দুই তিনটি অধ্যায় ব্যতীত প্রায় চারিশত পৃষ্ঠার নাতিক্ষুদ্র বইখানির প্রায় সবটাই বৈষ্ণব সাহিত্য লইয়া রচিত। ইহাতে লেখককে দোষ দিতে পারা যায় না। কারণ, পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদই হইতেছে ইহার বৈষ্ণব গীতিকাব্য ও চরিত কথা। পরবর্তী খণ্ডগুলিতে বাঙ্গালা সাহিত্যের অনালোচিত অন্য অংশের কথাও আমাদের এইভাবে শুনাইবেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের পত্তন, চৈতন্যদেবের পূর্বেকার ও তাঁহার সময়ের অন্য কবি ও কাব্য, রামায়ণের অন্যান্য অনুবাদক, বাঙ্গালা সাহিত্যে মহাভারত গোপীচাঁদের ও লাউসেনের, বেহুলা ও ফুল্লরার কথা লইয়া রচিত কাব্যসমূহ এবং অষ্টাদশ শতকের কবিদের কথা ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ এবং অন্যান্য শাক্ত কবি-এই বিষয়গুলি অবলম্বন করিয়া তাঁহার প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য-পরীক্ষা পরবর্তী খণ্ড দুটিতে সমাপ্ত হইয়াছে।

কবিশেখর কালিদাস রায় যে ঢঙে আলোচনা করিয়াছেন তাহা সুখ্যাত বস্তুতন্ত্র। তিনি যে কবির বা কাব্যের অথবা কাব্যধারার বিচার বিশ্লেষণ হাতে লইয়াছেন, আগে তাঁহার আলোচ্য বিষয়টি কি, তাহাতে কি কি বস্তু বা উপাদান আছে তাহা আনুষঙ্গিক টীকা সমেত দেখাইয়া দিয়াছেন।

কৃত্তিবাসের সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধ হইতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন বাঙ্গালী অনুবাদক কৃত্তিবাসের বইয়ে কি কি জিনিস আছে এবং বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণ বইতে উহার পার্থক্য কোথায়-উপাখ্যান ভাগে এবং দৃষ্টিভঙ্গীতে, উভয়েই। সর্বত্র ছন্দের বিশ্লেষণ আছে, অলঙ্কারের আলোচনা আছে, নানা সূক্তি সংগ্রহ আছে। লেখক স্বয়ং কবি, সমগ্র বাঙ্গালা সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ কবি, ছন্দ বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টিকোণ কৃতবিদ্য ও কৃতকর্মা ছন্দোবিদের দৃষ্টিকোণ সুতরাং এবিষয়ে তাঁহার আলোচনা বিশেষ মূল্যবান হইয়াছে।

সারা বইয়ের মধ্যে প্রচুরভাবে পরিলক্ষিত আর একটি বিষয়ে বইখানির নিজ বিশিষ্টতা ফুটিয়া উঠিয়াছে—প্রাচীন কবিদের মধ্যে সর্বত্র যে ভাব ও ভাষার একটা ধারাবাহিক পারম্পর্য্য বা অনুস্থিতি বিদ্যমান লেখক কাব্য ও কবিতাংশের প্রভূত উদ্ধৃতির দ্বারা তাহা আমাদের দেখাইয়া দিয়াছেন। ইহা তাঁহার প্রাচীন সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় এক অতি সহজ উপায়ে প্রমাণিত হইয়াছে। সাধারণ পাঠক ও বাঙ্গলা সাহিত্যের অনুরাগী ইহা হইতে অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন, আমাদের পূর্বজগণের মধ্যেও মাতৃভাষার সাহিত্যের সহিত কিরূপ পরিচয় ছিল। সুন্দর ভাষায় অভিব্যক্ত একটি সুন্দর ভাব কেমন করিয়া পুরুষানুক্রমে আমাদের কবিদের চিত্তে স্থান করিয়া লইয়াছিল।

সহজ সাহিত্যদৃষ্টির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া যাঁহারা বাঙ্গালা সাহিত্যের বিচার করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের নাম সর্বাগ্রে করিতে হয়। এই বিষয়ে লেখক প্রচুর পরিমাণে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যগুলি উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন—রবীন্দ্রনাথের মতের দ্বারা লেখকের মতের মূল্য এইভাবে অনেক স্থলে যাচাই করিতে পারা যাইবে।

ইহাতে সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে বৈষ্ণব রসতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্বের বিশ্লেষণ আছে। লেখক ভাল-রূপেই দেখাইয়াছেন বৈষ্ণব কবিতার mysticism বা রহস্যানুভূতি intrinsic অর্থাৎ কবিতার অঙ্গীভূত নহে, ইহা transferred অর্থাৎ আরোপিত। মোটের উপর সমগ্র পুস্তকে একটি সংযত, সত্যদর্শী অথচ শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী আছে। তাহা বিশেষভাবে উপভোগ্য এবং তাহার দ্বারা বইখানির মূল্য যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়াছে। ইহাতে ব্যক্তিতন্ত্র ভাব গদ্‌গদ্‌ উচ্ছ্বাসের স্থান নাই দেখিয়া সকলেই প্রথম হইতেই লেখকের যৌক্তিকতার প্রতি আকৃষ্ট হইবেন।

বইখানির আর একটি বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য যদ্দ্বারা ইহা সমালোচনা হইয়াও উচ্চ সাহিত্যের পদে উন্নীত হইয়াছে তাহা ইহাতে প্রকাশিত কবিশেখর কালিদাসেরই কতকগুলি কবিত্বময় রচনা।

আমি এই বই প্রভূত আনন্দের সহিত পড়িয়াছি। আমার পক্ষে অনেক নূতন কথা অথবা আবছা আবছা ভাবে অনুভূত কথা নূতনভাবে এবং মনোগ্রাহীভাবে লেখক আমাদের সামনে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। বইটিতে ক্লান্তিকারক বা রোমাঞ্চপ্রদ মত বা তত্ত্বের অবকাশ নেই, sweetness and light রস ও জ্ঞান উভয়ের মনোজ্ঞ সংমিশ্রণে এখানি সকলকেই খুশী করিবে।

বইখানি প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের সবচেয়ে বড় দিকটির অর্থাৎ ইহার বৈষ্ণব সাহিত্যের বিভাগটির সাহিত্যিক রসাস্বাদনে সাহায্য করিবে। ইহাকে বাঙ্গালা ভাষায় সাহিত্যালোচনা বিষয়ক একখানি বিশেষ লক্ষণীয় পুস্তক বলিতে হইবে।

কবিশেখর সাহিত্য

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় পঞ্চাশ বছরের উপর কবিতা লিখছেন। তাঁর অনেক কবিতা চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর ধরে পাঠকসমাজের সম্মুখে আছে এবং আদরণীয় হয়েই আছে। বর্তমান দ্রুত পরিবর্তনের যুগে এ কম সৌভাগ্যের বিষয় নয়। ধরে নিলে অন্যায় হবে না যে এই সব কবিতা বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছে।

কিন্তু কবিশেখর সম্বন্ধে আমাদের অনুযোগ এই যে স্থায়িত্বলাভের একটা সহজ পন্থা তিনি বেছে নিয়েছিলেন। গত ত্রিশ বছরের মধ্যে বিদ্যালয়ে পাঠ্য এমন একখানি বাংলা পুস্তক প্রকাশিত হয়নি যাতে তাঁর এক বা একাধিক কবিতা নেই। এর ফল হয়েছে যে অনেক ক্ষেত্রেই তিনি পাঠ্য-পুস্তকের কবিরূপে পরিচিত। পাঠ্যপুস্তকে কবিতার স্থান লাভ যে অগৌরবের এমন বলি না, কিন্তু যখন সেটাই প্রধান পরিচয় হয়ে দাঁড়ায় তখন চূড়ান্ত বিচারে কবিখ্যাতির অন্তরায় ঘটে। আমাদের কথা এই যে, পাঠ্যপুস্তক রচনার মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ না রেখে তিনি সেই সুদীর্ঘকাল কাব্য রচনা করলে আমরা তার কাছ থেকে আরও কত কবিতার অবদান পেতে পারতাম। রবীন্দ্রনাথের কবিতা যখন পাঠ্যপুস্তকে সঙ্কলনযোগ্য বিবেচিত হত না, তখনই রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে পাঠকসমাজে সক্রিয় আগ্রহ ছিল, অনেক সময়ে সে আগ্রহ আস্তিন গুটানো হাতাহাতিতে প্রকাশ পেয়েছে। পরবর্তীকাল তাঁকে এমন সর্বতোভাবে স্বীকার করে নিয়েছে, জল ও হাওয়ার মত জীবনধারণের নিত্য উপাদানে তিনি পরিণত হয়েছেন যে, সেটা অনেক সময় আগ্রহের অভাব বলেই মনে হওয়া অসম্ভব নয়। তবে বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে কিছু প্রভেদ আছে। বিদ্যালয়ের কিশোর মন বিনা বিচারে স্বীকার করে নেয় আর সেই সহজ স্বীকৃতির সংস্কার পরবর্তীকালে কবিকে গভীরভাবে গ্রহণের অন্তরায়ে পরিণত হয়। অথচ কবিশেখরের কবিতায় এমন ভাবের গভীরতা, চিন্তার গাঢ়তা ও হাসির তির্যকছটা আছে যে পরিণত মনের গ্রহণযোগ্য বিষয়। কবিশেখর সম্বন্ধে সাহিত্যসমাজ যদি যথেষ্ট সচেতন না হয়ে থাকে, তাঁকে যদি যথোচিত স্পৃহনীয় আসন না দিয়ে থাকে, তবে সে দায়িত্ব অনেক পরিমাণে স্বয়ং কবিকেই বহন করতে হবে। আমাদের অনুযোগের কারণ এই যে বিদ্যালয়ের মধ্য দিয়ে সাহিত্য-সমাজে প্রবেশ করবার সহজ পন্থা বেছে নিয়ে কবি নিজের প্রতি অবিচার করেছেন, সেই সঙ্গে বাংলা কাব্যের প্রতিও। কেননা, রবীন্দ্রনাথের জীবনকালে যে কয়জন Major কবির উদ্ভব হয়েছে, নিঃসন্দেহে কবিশেখর তাঁদের অন্যতম।

নব্য বাংলা সাহিত্যে great বা মহাকবি দুজন-মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ। অনেকেই major কবি, minor কবির সংখ্যা আরও বেশি। যখনই কোন কবিকে major কবি বলে স্বীকার করে নেওয়া হয় তখনি বুঝতে হবে যে তাঁর মধ্যে কিছু স্বকীয়তা আছে, সমকালীন মহাকবির দ্বারা প্রভাবিত হলেও তাঁর স্বকীয়তা আচ্ছন্ন হয়ে যায়নি। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র মধুসূদন-প্রভাবিত। তাই বলে তাঁদের স্বকীয়তা লোপ পায়নি। পথ কেটে নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রসমকালীন কবিদের সকলেই রবীন্দ্র প্রভাবিত। অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, করুণানিধান, যতীন্দ্রমোহন, যতীন্দ্রনাথ, কুমুদরঞ্জন, মোহিতলাল, নজরুল ইসলাম—এমন আরও অনেক নাম করা যেতে পারে। কবিশেখরও রবীন্দ্র প্রভাবিত, তৎসত্ত্বেও তাঁর স্বকীয়তা স্পষ্ট। এই স্বকীয়তা কী এবং কোথায় দেখিয়ে দেওয়াই সমালোচকের কাজ, সকলকে একসাপটা রবীন্দ্রানুসারী বলে যৌথভাবে সমাধিস্থ করলে সহজ সমাধান হয় বটে, কিন্তু সে তো মুর্দাফরাসের কাজ। কবিশেখর রবীন্দ্র-প্রভাবিত হয়েও যে রবীন্দ্রানুসারী ন'ন, তাঁরও যে একটি অনতিদীর্ঘ কক্ষপথ আছে সেটাই দেখিয়ে দিতে চেষ্টা করব।

মহাকবিরা Poetic diction তৈরি করে নেন, সেই শব্দসম্ভার তাঁদের প্রতিভার মৌলিকত্ব প্রকাশ করে। আবার অনেক সময়ে সেই Poetic diction সংস্কারে পরিণত হয়ে তাঁদের পথের বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এ যুগে যে মধুসূদন নব্যকাব্যের Poetic diction তৈরি করলেন, মেঘনাদবধ কাব্য ও বীরাঙ্গনার পরে কিন্তু নতুন কাব্য লিখতে পারলেন না তার কারণ তাঁর সদা-জাগ্রত সমালোচক-মন বুঝল যে তাঁর তৈরি Poetic diction অতিক্রম করে যাওয়ার উপায় তাঁর নেই, পরবর্তী কাব্য-রচনা প্রচেষ্টা পূর্ববর্তী কাব্যের অনুকরণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ বিপুল Poetic diction তৈরি করেছেন, অনেক ক্ষেত্রে তারা দুর্লঙ্ঘ্য সংস্কারে পরিণত হয়েছিল। গদ্যকবিতা রচনা এই সংস্কার-লঙ্ঘন প্রয়াস। আরোগ্য, রোগশয্যায়, জন্মদিনে প্রভৃতি একেবারে জীবন শেষের কয়েকখানি কাব্যে পাঠক যে অপ্রত্যাশিত নূতনত্বের স্বাদ পায় তার কারণ, নিজের রচিত ভাষা সংস্কারকে লঙ্ঘন করতে সক্ষম হয়েছিলেন তিনি।

রবীন্দ্রনাথের সমকালে দ্বিজেন্দ্রলাল, সত্যেন্দ্র দত্ত, ও নজরুল ইসলাম কিছু কিছু Poetic diction বা ভাষা-সংস্কার তৈরি করেছেন। বাকি সকলেই প্রধানত রবীন্দ্রনাথের Poetic diction গ্রহণ করেছেন (কখনো কখনো বৈষ্ণব কবিদের Poetic diction ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায়। 'আধুনিক কবিতা'র যদি কিছু মূল্য থাকে তবে তা রবীন্দ্রনাথ-রচিত ভাষা-সংস্কার লঙ্ঘন চেষ্টায়)। এখানেই প্রধানত রবীন্দ্রপ্রভাব। যুগধর্মোচিত রবীন্দ্রপ্রভাব সত্ত্বেও পূর্বোক্ত major কবিগণ স্বকীয় প্রভায় উজ্জ্বল। এ উজ্জ্বলতায় অবশ্যই রবিরশ্মির দিব্যপ্রভা নেই, কিন্তু গৃহদীপের স্নিগ্ধ ভাস্বরতা নিশ্চয় আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তো তার চেয়েও বেশি আছে।

রবীন্দ্রযুগের মাঝখানেই একবার দ্বিজেন্দ্রলাল মন্দ্র ও আষাঢ়ের বজ্রচকিত অট্টহাস্যে পাঠক-সমাজকে চমকিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। তার পরে নজরুল ইসলাম ধূমকেতুর প্রলয় ছন্দের আলোয় ও আলোড়নে আর একবার সচকিত করেছিলেন পাঠকসমাজকে। সত্যেন্দ্র দত্তের বিচিত্র ছন্দের ভুজঙ্গ প্রয়াসে এখনো চোখ ধাঁধিয়ে রেখেছে। এ সবই সত্য। কিন্তু বজ্র, বিদ্যুৎ ও ধূমকেতুর প্রচণ্ড ভাস্বরতা নেই বলেই গৃহদীপের মূল্য কিছু কম নয়। চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা নেই—হয়তো সেখানেই তার যথার্থ মূল্য।

কবিশেখরের কবিতার বিস্তারিত আলোচনা আরম্ভ করবার আগে তাঁর জীবনীর একটা খসড়া দেওয়া আবশ্যক। জীবনী আলোচনাতে সেইসব ঘটনার উপরেই জোর দেব বর্তমান লেখকের মতে তাঁর কবিধর্মগঠনে যার কিছু প্রাসঙ্গিকতা থাকা সম্ভব।

১৮৮৯ সালে জুলাই মাসে কবিশেখর জন্মগ্রহণ করেন, পিতার নাম যোগেন্দ্রনারায়ণ রায়। কবির পিতৃনিবাস বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীখণ্ডের নিকটবর্তী কড়ুই গ্রামে। এ অঞ্চলে অনেক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবির জন্মস্থান তবু পুত্রের নামকরণ হল কালিদাস। হয়তো পিতার সংস্কৃত কাব্যপ্রীতি এর কারণ। কারণ যাই হোক, সংস্কৃত কবিদের নামে সন্তানগণের নামকরণের রীতিটি আজো প্রচলিত আছে কবিশেখরের পরিবারে। পিতৃনিবাসের আবহাওয়া থেকে প্রাপ্ত বৈষ্ণব কবিদের প্রভাবের সঙ্গে মিলেছে পিতার নিকট থেকে পাওয়া সংস্কৃত কাব্যের প্রতি প্রীতি। অন্তত দুটো ধারাই পাশাপাশি বর্তমান তাঁর কাব্যে।

স্বগ্রামে মাইনর স্কুলের পাঠ সাঙ্গ করে বালককবি এলেন বহরমপুরে। এখানকার মিশনারী স্কুল ও কৃষ্ণনাথ কলেজে কাটে তাঁর বাকিশিক্ষাজীবন। কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে বি-এ পাশ করে জীবিকা অর্জনে নিযুক্ত হলেন তিনি। কিন্তু তার আগে কিছুকাল কাশিমবাজার আশুতোষ চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করে গেলেন। কবিশেখরের রচনার সঙ্গে যাঁদের কিছু পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন যে, তাঁর সংস্কৃত জ্ঞান কত গভীর ও ব্যাপক, সংস্কৃত অলঙ্কার ও ব্যাকরণেও তাঁর প্রবেশ অসামান্য। খুব সম্ভব চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন কালেই এই জ্ঞান অর্জিত হয়।

এবারে কবিশেখরকে যেতে হয় রংপুর জেলার উলিপুর গ্রামে উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকরূপে, সেখানেই তিনি পরে প্রধান শিক্ষকপদ গ্রহণ করেন। ১৯১৩ সাল থেকে ১৯২০ সাল কাটে সেখানে। কবিশেখরের কাব্যে বাংলার পল্লীর যে চিত্র ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের যে বর্ণনা পাওয়া যায় তার উন্মেষ বাল্যকালে স্বগ্রামে হয়ে থাকলেও এই সময়ে তার বিকাশ হয়, মনে করলে অন্যায় হবে না। সাত বছর পরে উত্তরবঙ্গের পাট তুলে দিয়ে কবি চলে এলেন দক্ষিণ বঙ্গে, এগার বছর কাটান বড়িশা উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষকরূপে। অবশেষে কলকাতার সর্বগ্রাসী আকর্ষণ তাঁকে টেনে নিয়ে এল শহরতলী থেকে খাস কলকাতা শহরে আর ১৯২১ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত কাটল ভবানীপুরের মিত্র স্কুলে অন্যতম শিক্ষক পদে। এই সময়েই দক্ষিণ কলকাতায় 'সন্ধ্যার কুলায়' নামাঙ্কে স্বগৃহ নির্মাণ করে কবিশেখর স্থায়ীভাবে বাসিন্দা হন কলকাতা শহরে।

শিক্ষকতা করবার সময়ে কবি পাঠ্যপুস্তক রচনায় উদ্যোগী হন। খুব সম্ভব অর্থের বিচারে তাঁর উদ্যোগ সফল হয়েছে, কিন্তু গোড়াতে আমরা যে অনুযোগ তুলেছিলাম তার মূল এখানে। পাঠ্যপুস্তক রচনা করেই কবি ক্ষান্ত হন নি, নিজের কবিতাও সঙ্কলিত করে দিয়েছেন। এই সূত্রে বিদ্যালয়জগতে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। শিক্ষক, কবিশিক্ষক ও উদ্যোগী পাঠ্যপুস্তক সঙ্কলক বলে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেছে সত্য, কিন্তু কবি-জগতে যে আসনখানি তাঁর স্বাভাবিক অধিকারে প্রাপ্য, সেখানে কিঞ্চিৎ বিঘ্ন ঘটিয়েছে।

আসল প্রসঙ্গে প্রবেশের আগে কবিশেখরের অন্যান্য শ্রেণীর রচনা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মন্তব্য করা আবশ্যক। সাহিত্য ও সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে যে গ্রন্থগুলি প্রণয়ন করেছেন তা আদৌ বিদ্যালয়ের 'পাঠ্যপুস্তক' বা কলেজের 'নোটবই' শ্রেণীর রচনা নয়। এ সব গ্রন্থে গভীর গবেষণা ; অসীম পাণ্ডিত্য ও নিগূঢ় চিন্তার পরিচয় আছে। ইদানীং কবি রম্যরচনায় মনোনিবেশ করেন। চণক সংহিতা, রঙ্গচিত্র ও চালচিত্র নামে কবির তিনখানি রম্যরচনাগ্রন্থ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এইসব রচনার মূল কবিশেখরের কবিতায় আছে। হাস্যরস ও ব্যঙ্গরস, সামাজিক ও সাংসারিক অভিজ্ঞতার চিত্র অনেক এঁকেছেন তিনি কবিতায়—সেই হাস্য ও ব্যঙ্গ, সেই ভূয়োদর্শন ঘনীভূত হয়ে সৃষ্টি করেছে এই সব রম্যচিত্রগুলোকে। বেশ বুঝতে পারা যায় উচ্চশ্রেণীর গল্পলিখিয়ের কলম ছিল তাঁর হাতে, প্রথম জীবনে তিনি তার ব্যবহার করেননি, হয়তো নিজেই সচেতন ছিলেন না, তবু দেখা যাচ্ছে যে সে কলমে কোনদিনই মরচে পড়ে নি। কেনই বা পড়বে, বাণীর রাজহংসের পাখনা তো ষ্টিলের নিব নয়। এই রচনাগুলোর সঙ্গে কবির একশ্রেণীর কবিতার গভীর আত্মীয়তা অনুভব করি বলেই এত কথা বলতে হল। বয়সে প্রবীণ এবং আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত কবিশেখরের পরবর্তী কালের জীবন নানাসূত্রে সুপরিজ্ঞাত ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রদেশ কংগ্রেস কর্তৃক তিনি সম্মানিত ; সন্ধ্যার কুলায় গুণগ্রাহীদের অবিরত যাতায়াতে মুখরিত। বললে অত্যুক্তি হয় না সাধনার সিদ্ধিরূপে কবিশেখর ব্যক্তির সীমা অতিক্রম করে এখন একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত। তাঁর সুদীর্ঘ ও শান্তিময় জীবন কামনা করে এবারে আসল প্রসঙ্গে প্রবেশ করব।

বাল্যকালে দেখতাম গাঁয়ের ছেলেরা আমাদের বাড়ীতে এসে ঘুড়ি তৈরি করবার জন্য 'বঙ্গবাসী' কাগজ চাইতো। তখনকার দিনে 'বঙ্গবাসী' ছিল সমধিক প্রচারিত সংবাদপত্র। তাই তাদের কাছে সংবাদপত্র মাত্রই ছিল 'বঙ্গবাসী'। এযুগে রবীন্দ্রকবিতা সমধিক প্রচারিত তাই এক শ্রেণীর সমালোচকের চোখে সব কবিতাই রবীন্দ্রকবিতা অর্থাৎ কি-না রবীন্দ্রানুসারী কবিতা। এ সেই গ্রাম্য বালকের দৃষ্টি।

রবীন্দ্র-কাব্যের প্রভাব দ্বিজেন্দ্রলাল ও অক্ষয় বড়ালের কোন কোন কবিতায় আছে, তবু তাঁরা নিশ্চয় রবীন্দ্রানুসারী নন। এযুগের সমস্ত কবির কাব্যেই অল্প বিস্তর রবীন্দ্র-প্রভাব আছে, এমনকি "রবীন্দ্র-বিরোধী" কবিগণের কাব্যেও আছে, তাই বলে তাঁরা সকলেই যে রবীন্দ্রানুসারী এমন নয়। সাহিত্য সমালোচনায় বাঁধাবুলি বড় সহজে চলে। পাঠক লেখকের গায়ে একটা লেবেল আঁটা দেখতে চায়, তাতে তাদের চিন্তার ভার লাঘব হয়। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রানুসারী লেবেলের কাজ করে। কবির প্রতি অবিচার হল কি না সে তর্কে প্রবেশ করছে কে ?

আগে Major কবি বলে যে সব কবির নাম উল্লেখ করেছি তাঁরা সকলেই অল্পবিস্তর রবীন্দ্র-প্রভাবিত হওয়া সত্বেও সকলেরই অল্পবিস্তর স্বতন্ত্র কক্ষপথ আছে। এই স্বাতন্ত্র্যের মূল কোথায় আলোচনা করা যেতে পারে। রবীন্দ্র-প্রতিভা মূলতঃ রোমান্টিক। এর বিপরীত একটা রস আছে যাকে বলা যেতে পারে Domestic বা গার্হস্থ্য রস। এই গার্হস্থ্যরসের গুণেই তাঁদের স্বাতন্ত্র্য। Poetic diction এবং ছন্দে মিল থাকা সত্বেও গার্হস্থ্যরসের উপস্থিতি হেতু তাঁদের স্বতন্ত্রতা। এযুগে দেবেন্দ্র

সেন, অক্ষয় বড়াল, কুমুদরঞ্জন ও কবিশেখর কালিদাস যে পরিমাণে গার্হস্থ্যরসের কবি সেই পরিমাণে তাঁরা স্বতন্ত্র, সেই পরিমাণে তাঁরা অ-রোমান্টিক অর্থাৎ অ-রবীন্দ্রানুসারী। রবীন্দ্রনাথের অন্তর্দৃষ্টি সহজেই এ কথাটা বুঝেছিল। তিনি কবিশেখরের কবিতা পড়ে মন্তব্য করেছিলেন—"তোমার এই কাব্যগুলি পড়িলে বাংলার ছায়া-শীতল নিভৃত আঙিনার তুলসীমঞ্চ ও মাধবীকুঞ্জ মনে পড়ে।" কবিশেখরের কাব্যে কবিগুরু বাংলা দেশের একটি কল্যাণমধুর গৃহের ছবি দেখতে পেয়েছেন। এখানেই গার্হস্থ্যরসের পরিচয়। কবিশেখরের কাব্যে রোমান্টিক রসের কবিতা নেই এমন বলি না। এযুগে কবিতা লিখতে বসলে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও বা ক্ষমতার অভাব থাকা সত্ত্বেও কখনো না কখনো রোমান্টিক কবিতা লিখতে হবেই। তবে তাঁর সমবয়স্কদের মধ্যে কবিশেখরের রোমান্টিক কবিতার ন্যূনতা সহজেই চোখে পড়ে। তুলনায় যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের রোমান্টিক কবিতার সংখ্যা অনেক বেশি, যদিও কোন কোন মহলের মতে তিনি প্রধান "রবীন্দ্রবিরোধী" এবং রবীন্দ্রবিরোধিতার গঙ্গোত্রী। রবীন্দ্রনাথের শরৎ কবিতার পাল্টা জবাবে লিখিত 'শরতের বঙ্গভূমি' এবং দ্বিজেন্দ্রলালের পাল্টা জবাবে 'গঙ্গাস্তোত্র' নাকি ঘোরতর অ-রোমান্টিক ও বাস্তববাদী। কিন্তু সত্যি তাই কি? বিষয়ের প্রকৃতি দিয়ে কাব্যের প্রকৃত বিচার করলে চলবে না, ঐ বিষয় নির্বাচনের মূলে কবিত্বের যে প্রেরণা আছে তাই দিয়ে কবিতার বিচার করতে হবে। রোমান্টিক দৃষ্টি জগতের দিকে "তেরছ নয়নে" তাকিয়ে দেখে, তাই সমস্তই তার চোখে অভিনব। অভিনবত্ব সৃষ্টি রোমান্টিক কবিতার মূল কথা। অভিনবত্ব সৃষ্টি করতে গিয়ে অনেক সময়ে বাড়াবাড়ি ঘটে, অবাস্তবতা আসে, উদ্ভট ও অদ্ভুতের (queer) আমদানী হয় এবং অবশেষে রোমান্টিক কবিতা লোকচক্ষে হেয় হয়ে পড়ে। তৎসত্ত্বেও স্বীকার না করে উপায় নেই যে অভিনবত্ব সৃষ্টির প্রেরণাতেই রোমান্টিসিজমের জন্ম। রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল এক প্রকারে অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছেন, যতীন্দ্রনাথ আর এক প্রকারে করতে চেষ্টা করেছেন। ছোট ছেলেরা খেলবার সময় মাথা নীচু করে পায়ের ফাঁক দিয়ে পরিচিত পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে যায়। এ-ও রোমান্টিক অভিনবত্ব সৃষ্টি-প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই নয়। যতীন্দ্রনাথের এ দুটি কবিতা ছোট ছেলের মাথা নীচু করে পায়ের ফাঁক দিয়ে জগৎদর্শন। অবাস্তব সত্য—কিন্তু অভিনব নিঃসন্দেহ। পূর্বোক্ত major কবিদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ ও করুণানিধানে রোমান্টিক গুণ সবচেয়ে বেশি, তারপরে যতীন্দ্রমোহন বাগচিতে, এই গুণ সব চেয়ে কম কুমুদরঞ্জনে ও কবিশেখরে। রোমান্টিক গুণ সবচেয়ে কম আবার গার্হস্থ্যরস সবচেয়ে বেশি। আর সেইজন্য তাঁরা রবীন্দ্রানুসারী না হয়ে রবীন্দ্রস্বতন্ত্র।

উদাহরণ সমালোচনার সার। কবিশেখরের কাব্য থেকে কয়েকটি ছবির টুকরো উদ্ধার করে দিচ্ছি, গার্হস্থ্যরসের উদাহরণ পাওয়া যাবে।

বারো বছরের গোটা গ্রামখানি
এ বুকে রয়েছে জাগি,
সেই এঁধো ডোবা পাড়ে খড়োঘর,
প্রাণ কাঁদে তার লাগি॥

আবার—

নরনারী প্রেতমূর্তি ভোগে শুধু জ্বরে,
খাদ্য আছে সাধ্য নাই, খায় তাহা, শুধু পথ্য করে।
তাহারা ভাতের চেয়ে সাগুদানা খায় বেশিদিন,
সাগুর চেয়েও বেশি খায় কুইনিন ॥

অপিচ,

বিজলির বাতি জ্বলে বড় বড় শহরে
ছোট ছোট শহরেতে কেরোসিন।
দীনের কুটিরে গ্রামে, বস্তির ভিতরে
দীপশিখা জ্বলিতেছে চিরদিন ॥

এবং

হাঁসগুলি ফিরে ঘরে শ্রান্ত পদে সন্তরণ ছাড়ি,
কৃষকেরা ফিরে ঘরে শুষ্ক ক্ষেতে জলসেচ সারি ॥

আরও আছে—

মাঝে মাঝে শোনা যায় শিশুর কাঁদন আর
কুকুরের ডাক ॥

উদাহরণ তুলে দিয়ে শেষ করা সম্ভব নয়, এমন কি কবিতার নাম লিখতে গেলেও তালিকা দীর্ঘ হয়ে পড়বে, তাই মাত্র কয়েকটি কবিতার নামোল্লেখ করছি।

ছা-পোষার হাল, ধ্বংসাবশেষ, কৈশোর-স্মৃতি, জীর্ণ সৌধ, কৃষকের শোক প্রভৃতি যে কোন কবিতা পড়লে বুঝতে পারা যাবে গার্হস্থ্যরস বলতে কি বোঝাতে চাই। সমালোচকের ভাষ্যের চেয়ে কবির ভাষার গুণ বেশি, তাই একটি শ্লোক উদ্ধার করে দিয়ে নিজের দায়িত্ব লাঘব করি।

রবীন্দ্রনাথের গানে পরিতৃপ্ত কান
তবু ভাল লাগে আজো নিধু দাশু শ্রীধরের গান।
কতই বিলাস-হর্ম্যে ভরি আছে এই রাজধানী,
তবু ভাল লাগে সেই তকতকে বেঁশো ঘরখানি,
পাঁশ-ঢিপি বাঁশ ঝাড় কলা বনে ঘেরা
বাঁধা যার চারিপাশে, রাঙচিতা বেড়া ॥

অধিক ব্যাখ্যা অনাবশ্যক। রবীন্দ্রনাথ রোমাণ্টিক ও আইডিয়াল, নিধু, দাশরথি, শ্রীধর এবং সেই সঙ্গে আমরা যোগ করে দিতে পারি কবিশেখর, কুমুদরঞ্জন, দেবেন্দ্র সেন, অক্ষয় বড়াল প্রভৃতি ডমেষ্টিক ও রিয়াল। কণিকায় ও ছিন্নপত্রাবলীতে পল্লী-বাংলার যেমন চিত্র আছে তেমন আর কোথাও নেই; তবে সে সমস্তই রোমাণ্টিক ও আইডিয়াল। পূর্বোক্ত কবিগণ অঙ্কিত চিত্রের সঙ্গে তার মূলগত ভেদ। বলাবাহুল্য এ ভেদ গুণে নয়, রসে। রবীন্দ্রনাথের শাজাহান কবিতাটির সঙ্গে কবি-

শেখরের শাজাহান মিলিয়ে পড়লে ভেদটা স্পষ্টতর হয়ে উঠবে। কবি চরাচরে যে দিকেই তাকান না কেন, সতত ও সর্বত্র তাঁর চোখে পড়ে মধ্যবিন্দুতে বিরাজমান একখানি গৃহ যে-গৃহ অত্যন্ত রিয়াল, অত্যন্ত পরিচিত, যার মাটির দেয়ালে আঙুলের ছাপগুলো এখনো মিলিয়ে যায় নি, মিলিয়ে নেওয়া যায় মানুষটির হাতের সঙ্গে। এই গৃহের মাধ্যাকর্ষণেই বিধৃত, কবির জগৎ, বলা বাহুল্য সে জগৎ রবীন্দ্রের সৌরজগৎ নয়। যোজনপ্রমাণ যে মাপকাঠিতে সৌরজগতের মাপজোক চলে সে মাপকাঠির প্রয়োগ এখানে চলবে না, এখানে সর্বত্রই বালখিল্য মাপের, এবং তার ক্ষুধা তৃষ্ণা আশা-আকাঙ্খা গৃহসংসারের ক্ষুদ্র আঙিনার সঙ্কীর্ণ দিগন্তে সীমাবদ্ধ, কিন্তু তারা কম সত্য, কম সুন্দর নয়। সাহিত্যের সাত মহলা ভবনে এরও একটি সম্মানের আসন আছে। আর এ আসনের ইতিহাস বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত।

রোমান্টিক কাব্যের আলোচনা করতে বসলেই ইংরাজি সাহিত্যের **Romantic Revival**-এর কবিদের ইতিহাস মনে পড়ে যায়। যেন সেখানেই রোমান্টিক মনোভাবের উৎস। এ কথা সত্য নয়। প্রত্যেক দেশের সাহিত্যের ইতিহাসেই রোমান্টিক কাব্যের উদাহরণ পাওয়া যাবে—কেননা রোমান্টিক প্রেরণা মানুষের মনের একটা স্বাভাবিক ও সর্বজনীন বৃত্তি, যুগধর্মে কখনও প্রবল, কখনো অন্যথা। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস বিচারে দেখা যাবে যে এখানে দুটি ভিন্ন অথচ সমান্তরাল প্রবাহ আছে। একটি গীতি-কাব্য, অন্যটি আখ্যায়িকা কাব্য, কাজের সুবিধার জন্যে বলা যেতে পারে একটি পদাবলীকাব্য, অন্যটি মঙ্গলকাব্য, আপেক্ষিক বিচারে একটির রোমান্টিক প্রেরণা, অন্যটির ডমেষ্টিক প্রেরণা। অপ্রাপ্য, অপ্রাপ্য, ইন্দ্রিয়াতীত, অপ্রত্যক্ষ রোমান্টিক কাব্যের সামগ্রী আর করায়ত্ত, প্রত্যক্ষ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, প্রাত্যহিক ডমেষ্টিক বা গার্হস্থ্য রসের সামগ্রী। বৈষ্ণব গীতিকাব্যে এবং মঙ্গলকাব্যে মোটের উপরে এই প্রভেদ। তবে এ ভেদ অচল-অচল নয়। বৈষ্ণব কাব্যে বাৎসল্য ও সখ্য রসাশ্রিত পদগুলোর ডমেষ্টিক মনোভাবের দিকে ঝোঁক, আবার মঙ্গল কাব্যের কোন কোন আখ্যায়িকায় যেমন মুকুন্দরামের ধনপতি সদাগরের কাহিনীতে ঝোঁকটা রোমান্টিকতার দিকে। সব দেশের সাহিত্য বিশ্লেষণ করলে এর বিভিন্ন প্রেরণার যুগ্ম প্রবাহ দেখতে পাওয়া যাবে। নব্য-বাংলা সাহিত্যেও এই দুই ধারা সমান্তরালে বহমান। এ যুগে প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে ও প্রতিভায় রোমান্টিক কাব্য তুঙ্গ স্পর্শ করেছে, অন্য রসের ধারা ক্ষীণ। ক্ষীণ কিন্তু একেবারে নগণ্য নয়, অক্ষয় বড়াল, দেবেন্দ্র সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল, কুমুদরঞ্জন ও কবিশেখর কালিদাস রায়ের কাব্যে (গদ্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে) এই রসের প্রবাহ। এঁরা মূলতঃ কেউ রবীন্দ্রানুসারী নন, রবীন্দ্রস্বতন্ত্র। গোড়াকার এই কথাটি না বুঝলে এঁদের কাব্য ভুল-বুঝবার আশঙ্কা। তাই কিছু দীর্ঘ প্রচেষ্টা করতে হল।

ইংরেজ কবি **Cowper**-এর কাব্যধর্ম বিশ্লেষণ উপলক্ষে বিখ্যাত ফরাসী আলঙ্কারিক **Sainte-Beuve** বলেছেন যে **Cowper** হচ্ছেন **"the poet of quiet rural and domestic life"**. কবিশেখরের কবিপ্রকৃতির সঙ্গে এ বর্ণনা মিলে যায়, তিনিও পল্লীজীবনের ও গার্হস্থ্যরসের কবি। এ দিকটা আগেই ব্যাখ্যাত হয়েছে। কিন্তু দেখছি যে পূর্বোক্ত আলঙ্কারিক **Cowper**-এর কাব্য-ভাষার প্রকৃতি সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছেন তাও মিলে যাচ্ছে কবিশেখরের কাব্যভাষার

সঙ্গে এবং সে বিষয়ে আমার ধারণার সঙ্গে। **"Every man conversant with verse writing knows, and knows by painful experience, that the familiar style is of all styles the most difficult to succeed in. To make verses speak the language of prose without being prosaic,...is one of the most ardous tasks a poet can undertake."** কবিশেখরের কাব্যের ভাষা ও তার চালচলন সম্বন্ধে এ কথা মোটের উপরে সত্য। তাঁর ভাষা সর্বদা গদ্যের গা ঘেঁষে চলেছে কিন্তু কোথাও সংঘাত ঘটে নি। একে তো কাব্যের বিষয়টা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাদাসিদে আটপৌরে, তার উপরে ভাষার এ হেন গদ্যঘেঁষা চাল, খুব সূক্ষ্মদর্শীর কাছে ছাড়া এমন কাব্যের সমাদর হওয়া কঠিন। এদিকে যুগধর্মেও আছে মস্ত অন্তরায়। নজরুলের আগ্নেয় মদিরা সত্যেন্দ্র দত্তর ছন্দের শার্দূল-বিক্রীড়িত, রবীন্দ্রনাথকে আর এ বিষয়ের মধ্যে ধরছি না, এমন অবস্থায়—

'আগ্রা আসি মনে পড়ে, গিয়েছিনু দূরবর্তী গ্রামে,
শুক্লা অষ্টমীর চাঁদ যখন সে অস্তে নামে নামে'।

কিম্বা— ধানকে করে পরিণত বাড়া ভাতে।
এঁটো কাঁটা বাড়তি বাসি তার বরাতে॥

কিম্বা— ব্যথা যে অবুঝ বড় যুক্তি সে না মানে।
এই যে সেনেট হল এর অঙ্গে গাঁইতি যে হানে॥

এমন আটপৌরে নিরলঙ্কার ভাষার কি আশা-ভরসা। গার্হস্থ্যরস-প্রধান কাব্যে এ যে গৃহলক্ষ্মীর নিঃশব্দ অলক্ষ্য পদসঞ্চার। খুব সম্ভব কবি নিজেও এ বিষয়ে সচেতন, তাই আত্মরক্ষার স্বাভাবিক নিয়মের প্রেরণায় তিনি 'পাঠ্য পুস্তক'কে আশ্রয় করেছিলেন। এখন ভাবছি ভালই করেছিলেন, দুঃসময়ের বন্যায় একেবারে ভেসে যান নি। আজ যখন সাল-তামামিতে হিসাব-নিকাশের সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। দেখতে পাচ্ছি যে কবিশেখর "পাঠ্যপুস্তকে"র কবি নন, বাংলা কাব্যের একটি চিরন্তন ধারাশ্রয়ী এ যুগের একজন major বা প্রধান কবি, রবীন্দ্রপ্রভাব সত্ত্বেও যিনি নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছেন।

কবিশেখরের কবিধর্ম ও কাব্যপ্রকৃতি সম্বন্ধে যথাসাধ্য আলোচনা করলাম। এবারে সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর ও তাঁর সমপর্য্যায়ভুক্ত কবিদের স্থান নির্ণয় প্রচেষ্টা। কাজটি অত্যন্ত দুরূহ, বিশেষ বর্ত্তমান যুগে যখন সমস্ত মূল্য ও ও পূর্বসংস্কার সত্যপাতী। তৎসত্ত্বেও দু'একটি কথা বোধ করি নিঃসন্দেহে বলা সম্ভব। দুটি কারণে তাঁরা বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। প্রথম, ব্যংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যুগ-সংক্রমণের মধ্যে তাঁরা একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে বিরাজমান বলে, দ্বিতীয়, নিজেদের কৃতিত্বের দাবীতে। এ বিষয়ে পূর্বে লিখিত একটি প্রবন্ধে বিশদ আলোচনা করেছিলাম, এখানে তার প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধার করে দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

"তাঁহাদের কাব্য এমন একটি ধারাকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে যাহা বুঝি লোপ পাইতে চলিল। এ ধারা বাংলা সাহিত্যে নবাগন্তক নয়, অতি প্রাচীন; প্রচুর রবীন্দ্রপ্রভাব সত্ত্বেও এ ধারা আপন বৈশিষ্ট্য

হারায় নাই ; রবীন্দ্রপ্রভাবের ফলে বাংলা কাব্যে ক্রান্তিপাত ঘটিতেছিল তখন ইঁহারা ও ইঁহাদের মত কবিগণ নবীনকে অস্বীকার না করিয়া প্রাচীন কাব্য সংস্কারটিকে সাধ্যানুসারে সজীব করিয়া রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন। বাংলা কাব্যের প্রাচীন ও নবীন খণ্ডে আজ যে ব্যবধান ইঁহাদের কাব্য তাহাকে একেবারে দুস্তর হইতে দেয় নাই। কেবল এই কারণেই তাঁহাদের কাছে বাঙালী পাঠকের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। সেকালের জগৎ হইতে মুকুন্দরাম চক্রবর্তী বা গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি একালে পদার্পণ করিলে অনায়াসে এইসব কবির কাব্যের রস গ্রহণ করিতে সক্ষম হইতেন। কিন্তু কৃতজ্ঞতার আরো কারণ আছে। উচ্চাঙ্গ কাব্যরস বোঝার সংখ্যা স্বভাবতই অল্প। অন্যপর্যায়ভুক্ত বৃহত্তর পাঠকসমাজের রসজীবন যাপনের মোটা অন্নবস্ত্র যোগাইবার ভার ইঁহাদের মত কবির উপরে, এদেশে, বিদেশে, সর্বদেশে ও সর্বকালে। কাব্যলক্ষ্মীর মহোৎসবে খাসমহলের আমন্ত্রিতগণ ভূরিভোজন করুন আপত্তি নাই ; কিন্তু রবাহুত, অনাহুতগণ অভুক্ত ফিরিয়া যাইবে এমন তো হওয়া উচিত নয়। ইঁহাদের উপরে মোটা অন্ন পরিবেশনের ভার। সেকালে মোটা অন্নে ও রাজভোগে এমন প্রভেদ করা হইত না। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল পালা উদার হস্তে যে অন্ন বিলাইত তাহাতে রাজা ও রাখালের সমান রুচি ছিল। মহাজন পদাবলীতেও অন্নে বাছবিচার ছিল না। চৈতন্যদেবের প্রভাবে কেবল সমাজে জাতিভেদ শিথিল হয় নাই, কাব্যেও জাতিভেদ ছিল না। সেকাল কেবল সমাজে নয়, রসের ক্ষেত্রেও একান্নবর্তী ছিল। একালে সমাজে ও সাহিত্যে একান্নবর্তিতা লোপ পাইবার মুখে ; সাহিত্যের খাসমহল হয়তো আয়তনে বাড়িয়াছে, কিন্তু সেই সঙ্গে যে বহিঃপ্রাঙ্গণের আয়তনও বাড়িয়া গিয়াছে। সেখানে যাহারা পাতা পাড়িয়া বসিয়া গিয়াছে তাহাদের কি ব্যবস্থা হইবে ? একশ বছর আগে মধুসূদন যখন খাসমহলের ভার গ্রহণ করিতেছিলেন, তখন সাধারণে রস বিতরণের ভার ছিল ঈশ্বর গুপ্ত ও তৎপূর্ববর্তী দাশরথি রায়ের উপরে। একালেও প্রয়োজন আছে। এমন যদি কখনও হয় যে, কাব্যলক্ষ্মীর প্রসাদের সাকুল্যই খাসমহলের ভোগে লাগিয়া যাইবে, আর প্রবেশানধিকারীর দল ফিরিয়া যাইবে শুষ্ক মুখে, তবে সেই সরস্বতীর ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কখনই সমর্থনযোগ্য নয়।

'যোগ্যতমের উধ্বর্তন' তত্ত্ব অন্যান্য ক্ষেত্রের মত সাহিত্যক্ষেত্র সম্বন্ধেও সত্য। কিন্তু তর্ক উঠিবে যোগ্যতমের সংজ্ঞায়। এ সম্বন্ধে আমার ধারণা এই যে, সাহিত্য যেমন গতানুগতিককে সহ্য করে না, তেমনি খাপছাড়া ও অদ্ভুতকেও বহন করে না। খাপছাড়া ও অদ্ভুত কিছুদিনের জন্য মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলেও চিরদিনের পাট্টা তাহাদের নাই। সাহিত্যের ইতিহাস এ সত্যটিকে যেমন চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দেয় এমন আর কিছুকে নয়।

"এখন গতানুগতিক ও অদ্ভুতের মাঝখানে স্থান খুব প্রশস্ত। সেই স্থানে যাহারা আশ্রয় লাভ করে তাহাদের মার নাই। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যেও যেখানে, আবার major ও minor poet গণের স্থানও সেখানে ; মহাকবি ও অন্য পর্যায়ের কবিগণ এই প্রশস্ত ক্ষেত্রে আশ্রিত, অনেক সময়েই গায়ে গায়ে বিরাজ করে ; কেবল অকবি ও কুকবি-গণের সেখানে স্থান হয় না। সমসাময়িক ও বহুঘোষিত ও বিচিত্রকীর্তি অনেক কবি ও কবিতা যখন খাপছাড়া ও অদ্ভুত বলিয়াই তলাইয়া যাইবে, তখনও ইঁহাদের সরল, প্রাঞ্জল, বাঙালীর পল্লী জীবনের সুখ-দুঃখে, আশা-আনন্দে এবং গার্হস্থ্যরসে সমুজ্জ্বল যে কবিতাগুলি টিকিয়া থাকিবে তাহার পরিমাণ বড় অল্প নয়।"

ঃ কবি ও কবিতা ঃ

জগদীশ ভট্টাচার্য

১২৯৬ বঙ্গাব্দের আষাঢ় মাসে [জুলাই ১৮৮৯] বর্ধমান জেলার কড়ুই গ্রামে বাংলা কাব্যলোকের বর্ষিষ্ঠ কবি কালিদাস রায়ের জন্ম। বৈদ্যবংশোদ্ভূত কবিশেখরের পূর্বপুরুষ ছিলেন ষোড়শ শতাব্দীর বিখ্যাত বৈষ্ণবকবি, চৈতন্যমঙ্গল-রচয়িতা লোচনানন্দ দাস।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক উপাধি গ্রহণ করে কবিশেখর উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। রংপুরের একটি স্কুলে তাঁর জীবিকার সূত্রপাত। প্রাক্‌স্নাতক বিদ্যার্থী অবস্থাতেই তাঁর কবিতা তৎকালীন বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রথম কাব্য গ্রন্থ 'কুন্দ' প্রকাশিত হয় ১৩০৮ সালে। গ্রন্থখানি কবিগুরুকে উৎসর্গ করা। তারপর কিশলয় (১৯১১), পর্ণপুট (১৯১৩), ব্রজবেণু (১৯১৫), বল্লরী (১৯১৫) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই তরুণ কবি বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সে সময় আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন বাংলা সাহিত্যের গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তিনি এই প্রতিভাবান সাহিত্যসাধককে কলিকাতায় এনে ভবানীপুরে মিত্র ইনষ্টিটুশনে শিক্ষকপদে নিয়োগ করেন। তখন থেকে প্রায় চল্লিশ বৎসর এই শিক্ষায়তনে শিক্ষকতা করে ১৯৫২ সনে কালিদাস রায় অবসর গ্রহণ করেন।

কবিশেখর শুধু কবিই ছিলেন না, তিনি কাব্যবিচারেও পারঙ্গম ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষার অধ্যাপকপদের জন্য মোহিতলাল মজুমদার এবং কালিদাস রায়ের কথা একই সঙ্গে চিন্তা করা হয়। অবশেষে ডক্টর সুশীলকুমার দে মোহিতলালকেই নির্বাচন করেন। তার ফলে 'স্বপন-পসারীর কবি সাহিত্য-সমালোচক হিসাবেই সমধিক খ্যাতি অর্জন করেন। কিন্তু কালিদাস রায় কাব্যসমালোচনামূলক একাধিক উচ্চকোটির গ্রন্থ রচনা করেও আজীবন কাব্যসাধনাকেই জীবনের মুখ্য কৃত্য হিসাবেই বরণ করে নিয়েছিলেন।

মোটামুটিভাবে কবিশেখরের কাব্যসাধনার কাল বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের শেষার্ধ থেকে অষ্টম দশকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অর্থাৎ প্রায় সত্তর বৎসর ধরে বিচিত্র বিষয়ে অজস্র কবিতা লিখে তিনি রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যসাহিত্যকে ঋদ্ধি দান করেছেন।

রবীন্দ্রনিষ্ঠ মুখ্য-কবিপঞ্চকের মধ্যে কালিদাস রায় ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। করুণানিধান (১৮৭৮), যতীন্দ্রমোহন (১৮৭৮), সত্যেন্দ্রনাথ (১৮৮২), কুমুদরঞ্জন (১৮৮২), এবং কালিদাস (১৮৮৯)। সামান্য লক্ষণে এঁরা একান্তভাবেই বাংলার ও বাঙালীর কবি। কিন্তু বিলক্ষণ লক্ষণে পরস্পরের পার্থক্যও বিদগ্ধ কাব্যরসিকের দৃষ্টি এড়িয়ে যাবার কথা নয়।

রবীন্দ্রনাথ কালিদাস রায়ের তরুণ যৌবনের কবিতা পাঠ করে বলেছিলেন, 'তোমার কবিতা বাংলা দেশের মাটির মতই স্নিগ্ধ ও শ্যামল। বাংলা দেশের প্রতি গভীর ভালবাসায় তোমার মনটি কানায়-কানায় ভরা—সেই ভালবাসার উচ্ছলিত ধারায় তোমার কাব্য-কানন সরস হইয়া কোথাও বা মেদুর, কোথাও বা প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। তোমার এই কাব্যগুলি পড়িলে বাংলার ছায়াশীতল নিভৃত আঙিনার তুলসীমঞ্চ ও মাধবীকুঞ্জ মনে পড়ে।'

বলাই বাহুল্য 'তুলসীমঞ্চ' পবিত্রতার প্রতীক আর 'মাধবীকুঞ্জ' বৈষ্ণবীয় রসমাধুর্যের। কালিদাস রায় ছিলেন ছাত্রবৎসল আদর্শ শিক্ষাগুরু। বাংলার কবিসমাজে অনেকেরই বৃত্তি শিক্ষকতা। কিন্তু কালিদাস রায়ের ছাত্রধারা' কবিতাটি বাৎসল্যরসে অভিসিঞ্চিত প্রসাদগুণান্বিত ভাষায় অনবদ্য। প্রাক্‌স্নাতক স্তরের পাঠ্যগ্রন্থের তালিকাভুক্ত তাঁর 'বৃন্দাবন অন্ধকার' কবিতাটিও মাথুর-বিপ্রলম্ভের মর্মবিদারী বেদনায় হৃদয়স্পর্শী। এককালে কালিদাস রায়ের এই কবিতাযুগল জনপ্রিয়তায় শীর্ষস্থানীয় ছিল।

মোহিতলাল মজুমদার তাঁর 'কাব্যমঞ্জুষা'য় বলেছেন, 'কবি কালিদাস রায়ের কবিতায় দুই রূপ আছে। একটির আদর্শ সংস্কৃত, তাহার ভাবে ভাষায় ও রচনার ভঙ্গীতে—অতীত ভারতের কীর্তি, ধ্যান ও জ্ঞান কীর্তিত হইয়াছে, আর একটি যে রূপ, তাহাতে বাংলার পল্লীপ্রকৃতি ও পল্লীজীবন অতিশয় সহজ সরল ভাষায়, খাঁটি বাংলা ভঙ্গীতে, চিত্রিত হইয়াছে।' কবিশেখরের কাব্য সম্পর্কে তাঁর প্রায় সমবয়স্ক, বৎসর খানেকের অগ্রজ, কিন্তু ভিন্নগোত্রের কবির এই মন্তব্য অনেকাংশে সত্য হলেও এর মধ্যে অতিসরলীকরণের প্রয়াস লক্ষ্য না করে পারা যায় না।

আমরা রবীন্দ্রনিষ্ঠ যে মুখ্য-কবিপঞ্চকের কথা পূর্বে বলেছি তাঁদের মধ্যে বৈষ্ণবীয় ঐতিহ্য কুমুদরঞ্জন এবং কালিদাসের মধ্যেই সর্বাধিক পরিস্ফুট। কিন্তু কুমুদরঞ্জনের পল্লীপ্রাণতা এবং বৈষ্ণবীয় রসদৃষ্টি কালিদাসের অনেক কবিতায় পরিলক্ষিত হলেও তাঁর কবিকল্পনার পরিধি নব-নব দিগন্তে প্রসারিত। তাঁর কাব্যসংগ্রহ 'আহরণ', 'আহরণী' এবং 'সন্ধ্যামণি'র বিচিত্র বিষয়াশ্রয়ী কবিতাগুলির প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ করলেই আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

'সন্ধ্যামণি'তে গ্রন্থকারের নিবেদনে কবি বলেছেন, 'পঞ্চাশ বৎসর আগে 'কুন্দে' যে খেয়ালের সূত্রপাত হয়েছিল 'সন্ধ্যামণি'তে বোধহয় তার শেষ হল। ফুলে শুরু ফুলেই সারা, ভাবিও নি ফলের কথা।' উক্তিটি কৌতূহলোদ্দীপক। কেননা, 'সন্ধ্যামণি' প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৬৫ সালের

ভাদ্র মাসে। এই সংকলনের নামকরণ দেখেই বুঝতে পারা যায়, কবির মনে হয়েছিল সত্তর বৎসর বয়সে সংকলিত ওই কাব্যসংগ্রহই তাঁর শেষগ্রন্থ। কিন্তু তার প্রায় দশ বৎসর পরে প্রকাশিত 'পূর্ণাহুতি' গ্রন্থের জন্য তিনি পেয়েছিলেন 'রবীন্দ্র-পুরস্কার'।

কবি বলেছিলেন, 'ফুলে শুরু, ফুলেই সারা ; ভাবিও নি ফলের কথা।' এই উক্তি বাচ্যার্থেই সম্পূর্ণ নয়। ব্যঞ্জনায় ওর মধ্যে কবিমানসের একটি চাপা অভিমানও লুকিয়ে আছে। এ অভিমান কিন্তু কুমুদরঞ্জনের কবিমানসে কোনো দিনই স্থান পায় নি। কালিদাস রায় শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্র-পুরস্কারে 'স্বীকৃত' হয়েছেন, কিন্তু কুমুদরঞ্জনের ভাগ্যে তাও জোটে নি।

সন্ধ্যামণির 'গ্রন্থকারের নিবেদনে' কালিদাস পুনশ্চ বলেছেন, 'গুরুর আশীর্বাদ নিয়ে শুরু করেছিলাম যাত্রা, কিন্তু তাঁর চলার পথে আগাতে পারি নি। তাঁর পদাঙ্কপরম্পরা খুঁজেও পাই নি। জানি না তিনি তাঁর পদাঙ্ক মুছে মুছে চলে গিয়েছেন কিনা। তবে তিনি যে বলেছিলেন—'একতারাতে একটি যে তার আপন মনে সেইটি বাজা।' সেই একতারা বাজাতে বাজাতে এত দূর এগিয়ে এসেছি, যুগযাত্রার পথে নয়, জীবনের যাত্রাপথে। যেরূপ দ্রুতগতিতে যুগের পরিবর্তন হয়েছে—তাতে যুগের সঙ্গে তাল রেখে চলা উনবিংশ শতাব্দীতে সঞ্জাত কবির পক্ষে সম্ভব নয়। একতারাও এযুগে অচল।'

এ-ও কবির অভিমানী চিত্তের কথা। যাই হোক, কালিদাস রায় যে-বাদ্যযন্ত্রে তাঁর কাব্য-সঙ্গীতের সাধনা করেছেন তা সহস্রতন্ত্রীবিশিষ্ট বীণাযন্ত্র না হলেও, একতারা নিশ্চয়ই নয়। মোহিতলাল দোতারার কথা বলেছেন, আমাদের মনে হয়, কবিশেখরের বীণায় একাধিক তার সংযোজিত হয়েছিল। তিনি একতারার স্বরসাধক ছিলেন না।

তাছাড়া, যুগান্তরের রুচিবদলের দিনে প্রাচীনকে নবাগতের জন্য পথ ছেড়ে দিতেই হয়। মনে পড়ছে কবিগুরুর 'লেখা' শীর্ষক সনেটকল্প কবিতাটি—

সব লেখা লুপ্ত হয়, বারম্বার লিখিবার তরে
নূতন কালের বর্ণে।

*　　　　*

কালের মন্দিরে পূজাঘরে
যুগবিজয়ার দিনে পূজার্চনা সাঙ্গ হলে পরে
যায় প্রতিমার দিন। ধুলা তারে ডাক দিয়ে কয়,
'ফিরে ফিরে মোর মাঝে ক্ষয়ে ক্ষয়ে হবি রে অক্ষয়,
তোর মাটি দিয়ে শিল্পী বিরচিবে নূতন প্রতিমা,
প্রকাশিবে অসীমের নব নব অন্তহীন সীমা।।'

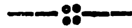
এই কবিতাতেও কবিগুরুর অভিমান প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। কিন্তু একটি মহাসত্য

এই অভিমানকে বহুদূর অতিক্রম করে গেছে—'তোর মাটি দিয়ে শিল্পী বিরচিবে নূতন প্রতিমা।'

এই হচ্ছে মানব ইতিহাসের পরম সত্য। অতীতকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে নয়, তাকে আত্মসাৎ করেই নতুন কালের সৃষ্টি সার্থক হয়। জনৈক ইংরেজ সমালোচক বলেছেন :—

Though it is true that the best poets in any age are those who are most successful in finding an idiom close enough to the world in which they live, it is also true that the poetical progress of any age can only be represented by those poets whose work is a genuine development of what has gone before.

কবিশেখর যখন কাব্যসাধনা শুরু করেন তখনকার প্রসাদগুণান্বিত প্রাঞ্জল কবিভাষা পরবর্তী যুগে পরিবর্তিত হয়েছে। যুগান্তরের জীবনোপলব্ধিও হয়ে উঠেছে জটিল। স্বভাবতই তার ভাষা হয়েছে তির্যক। প্রকাশভঙ্গিতে এসেছে দুর্বোধ্যতা, কিন্তু সমস্ত চারুশিল্পের মতো কাব্যেও এমন বস্তু থাকে যা একটি বিশেষ কালের হয়েও সর্বকালের সমাদরের সামগ্রী। কবিশেখরের কাব্যসাধনা তাঁর সমকালীন সহৃদয়-সমাজকে মুগ্ধ করেছিল। নিশ্চয়ই তার মধ্যে এমন বস্তু আছে যা অনাগত কালের কাব্যরসিককেও কাব্যাস্বাদনে নন্দিত করবে।



সাহিত্য সমালোচক কবিশেখর

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য

কবিশেখর কালিদাস রায়ের কথা লিখতে গেলে প্রথমেই তাঁর সুমধুর ব্যক্তিত্বের কথা বলতে হয়। তাঁর ব্যক্তিত্বের মাধুর্যের মধ্যেই যে তাঁর কবিত্বেরও জন্ম এবং বিকাশ হয়েছিল, তা-ও সহজে বুঝতে পারা যায়। তার প্রধান কারণ, কালিদাস রায় বৃত্তিতে শিক্ষক ছিলেন এবং শিক্ষাকর্মকেও জীবনের একটি পবিত্র এবং আনন্দময় ব্রত হিসাবেই তিনি গ্রহণ করেছিলেন। বিশেষতঃ তিনি যে বয়সের ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষকতা করেছেন, সেই বয়সের ছেলেরা সংসারের পরিপক্ক জ্ঞানলাভ করে পরিণত-বুদ্ধি হয়ে উঠেনি। বাল্যসুলভ সরলতা তাদের সে বয়সের চরিত্রের স্বাভাবিক গুণ ছিল। দীর্ঘকাল তাদের সাহচর্য লাভ করবার ফলে কবি কালিদাস রায়ের চরিত্রের মধ্যেও বাল-সুলভ সরলতা ও মাধুর্যের গুণ সঞ্চারিত হয়েছিল। শিক্ষকতা কর্মের সমান্তরাল ভাবেই তাঁর কবিত্বের সাধনাও চলেছিল বলে তাদের পরস্পরের মধ্যে একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

কালিদাস রায়ের কবিত্বের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে বুঝতে পারা যাবে যে, তাঁর কবিত্ব স্বভাব-কবিত্ব, তা' কষ্টকল্পিত কিংবা জ্ঞানার্জিত কবিত্ব নয়। তিনি বৈষ্ণব কবিবংশের সন্তান, সুতরাং জন্মসূত্রেই তিনি কবিত্বের একটি স্বাভাবিক সংস্কার লাভ করেছিলেন; তাঁর শিক্ষকতার গুণটির মধ্যেও যেন একটি স্বাভাবিক সংস্কার ছিল। যে যুগে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর উপাধি লাভ করেছিলেন, সেই যুগে তিনি শিক্ষাকর্ম ব্যতীতও অর্থকরী অন্যান্য অনেক বৃত্তিই গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু দেখা যায় যে, তিনি স্বভাবের আকর্ষণেই শিক্ষকতার দিকে এসেছিলেন এবং সংসারবুদ্ধিহীন কোমলমতি বালকদিগের শিক্ষাকর্ম সমস্ত জীবন আনন্দের সঙ্গেই যাপন করেছিলেন। অথচ সে যুগে শিক্ষা কর্ম-জীবন গ্রহণ করার অর্থই ছিল চিরজীবন দারিদ্র্য বরণ করে নেওয়া। তাঁর জীবৎকালে কবিত্বের সাধনা যেমন অর্থকরী ছিল না, শিক্ষকতা কর্ম'ও তেমনই অর্থকরী ছিল না। কেবলমাত্র অন্তর্নিহিত কি এক বিশ্বাস নিয়ে এই দুই কার্যেই তিনি দারিদ্র্যের মধ্যেও আনন্দ লাভ করেছিলেন।

শিক্ষকতার ক্ষেত্রেও একবার কবিশেখর কালিদাস রায়ের জীবনে একটি দুর্লভ সুযোগ এসেছিল। যদি তিনি সেই সুযোগটি লাভ করতে পারতেন তবে শিক্ষক হিসাবে তাঁর চরিত্র হয়ত বদলে যেত; কিন্তু সে সুযোগটি তিনি লাভ করতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত লাভ করতে পারেননি। সেই জন্য কর্মের ক্ষেত্রে নিরবচ্ছিন্ন বৈষয়িক দারিদ্র্যই স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন। তাঁর ফলে শিক্ষকরূপেও তাঁর জীবনের মধ্যে তাঁর ভাগ্যের কোন উত্থান-পতন দেখা যায়নি। তাঁর সেই হারানো সুযোগ-টুকুর কথা এখানে উল্লেখ করতে পারি।

১৯১৯ সনে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ১৯২১ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন স্নাতকোত্তর বাংলা বিষয়ের পঠন-পাঠন আরম্ভ হয়, তখন বাংলা বিষয়ে এম. এ পাশ করা কোন শিক্ষকের অভাবে বি. এ. পাশ করা সাহিত্যিকদেরই এই কার্যে নিযুক্ত করা হ'ত। দীনেশচন্দ্র সেন বি. এ. পাশ ক'রেও কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা স্নাতকোত্তর বিভাগের প্রধান নিযুক্ত হলেন, তখনই চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি. এ-ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিষয়ের স্নাতকোত্তর অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন। তখন বি. এ. পাশ করা প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকরূপে কবিশেখর কালিদাস রায়ের নাম সর্বাগ্রগণ্য ছিল। তিনি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। কিন্তু আত্মতৃপ্ত কবি জীবনে কোনো উচ্চাশা পোষণ করতেন না ব'লে সে সব দিকে নিজে থেকে কোনদিনই কোনো আকর্ষণ অনুভব করলেন না। সমাজে সে দিন তাঁর গুণগ্রাহীর অভাব ছিলনা, কিন্তু সকলেই আত্মীয় এবং বান্ধব তোষণে ব্যগ্র ছিলেন ব'লে তাঁর প্রতি কারো দৃষ্টি সেদিন আকৃষ্ট হ'ল না। অবশেষে একটি সুযোগ এল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন বাংলার অধ্যাপক নিযুক্ত করবার আয়োজন হ'ল। ইতিপূর্বে স্বর্গতঃ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের সুপারিশে সেখানে সর্বাগ্রে বাংলার অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন, এবার নূতন পদটির জন্য তখনকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার কবিশেখর কালিদাস রায়কে সেই পদে নিযুক্ত করবার জন্য আগ্রহশীল হ'য়ে উঠলেন। সেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল বিভাগেই তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাব অত্যন্ত সক্রিয় ছিল এবং সকলেই সে দিন আশা করেছিলেন যে, তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় কালিদাস রায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হবেন।

তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর সুশীলকুমার দে। তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধু কবি মোহিতলাল মজুমদার। তিনি মনে মনে স্থির করলেন, কবি মোহিতলাল মজুমদারকে এই পদে নিযুক্ত করবেন। কবি মোহিতলালও বি. এ. পাশ, তিনি তখন কোলকাতা মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ে একজন সামান্য শিক্ষক।

নির্বাচনী সমিতির সভায় ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার একজন সদস্য ছিলেন, তিনি যথাকালে কালিদাস রায়ের নাম প্রস্তাব করলেন এবং ডঃ সুশীলকুমার দে ব্যতীত নির্বাচনী সমিতির অন্যান্য সকল সদস্যই কবি কালিদাস রায়ের নাম সুপারিশ করলেন, কেবলমাত্র ডঃ সুশীলকুমার দে কবি মোহিতলাল মজুমদারের নাম প্রস্তাব করলেন, কিন্তু তাঁর কোনো সমর্থক পাওয়া গেল না। এই অবস্থায় তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠের সুপারিশের বিরুদ্ধে একটি বিরুদ্ধ মন্তব্য করে উচ্চতর ক্ষমতা-সম্পন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকরী সমিতির নিকট পাঠালেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য তখন একজন ইংরেজ শিক্ষাবিদ, নাম জি. এইচ. ল্যাংলি। তিনি বিভাগীয় প্রধান ডক্টর সুশীলকুমার দে'র মন্তব্য কার্যকরী সমিতিতে পড়ে শোনালেন। যদিও অধিকসংখ্যক সদস্যের সুপারিশ অনুযায়ী কবি কালিদাস রায়ের নিয়োগই সেদিন প্রত্যাশিত এবং আইনসম্মত ছিল, তথাপি উপাচার্য ল্যাংলি বিভাগীয় প্রধানের বিরুদ্ধ মন্তব্যের প্রতি উপেক্ষা না দেখিয়ে বিষয়টি নির্বাচনী সমিতির পুনর্বিবেচনার জন্য পাঠালেন। নির্বাচনী সমিতিতে পুনরায় একমাত্র ডক্টর সুশীলকুমার দে ব্যতীত আর সকলেই কবি কালিদাস রায়ের নামই

সুপারিশ ক'রে পাঠালেন, ডক্টর দে তাঁর পূর্ব মন্তব্য বহাল রাখলেন। সুতরাং নিয়োগ ব্যাপারে পূর্ববর্তী সঙ্কটের কিছু সুরাহা হল না।

আজকাল হলে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ই নির্বাচনী সমিতির অধিকাংশ সদস্যের সুপারিশ গ্রহণ করে কালিদাস রায়ের নিয়োগই চূড়ান্ত করে দিতেন। কিন্তু ইংরেজ উপাচার্য অধ্যাপক ল্যাঙ্লি নির্বাচনী সমিতির অধিক-সংখ্যক সদস্যের তুলনায় বিভাগীয় প্রধানের বিরুদ্ধ মন্তব্যটির উপরই গুরুত্ব আরোপ করলেন, তিনি কার্যকরী সমিতিকে বোঝালেন যে, এই বিষয়ে বিভাগের দায়িত্ব যাঁর উপর ন্যস্ত অর্থাৎ বিভাগীয় প্রধানের মন্তব্যের উপরই বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। কারণ, বিভাগের দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত তাঁকেই বইতে হ'বে। তাঁর কথা মেনে নিয়ে শেষ পর্যন্ত অধিকসংখ্যক সদস্যের সুপারিশ সত্ত্বেও কালিদাস রায়ের পরিবর্তে কেবলমাত্র অধ্যক্ষের সুপারিশের উপর কবি মোহিতলাল মজুমদারকেই সেই পদে নিযুক্ত করা হল। মোহিতলাল কলিকাতা মেট্রোপলিটান্ বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা ছেড়ে ১৯২৮ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার একজন অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। নির্বাচনী সমিতির ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ অন্যান্য সকল সদস্যের সুপারিশ থাকা সত্ত্বেও কবি কালিদাস রায় সেই পদ লাভ করতে পারলেন না। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদ লাভ করতে না পারলেও কবি কালিদাস রায় সেখানকার স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর সকল পরীক্ষারই প্রশ্নকর্তা এবং পরীক্ষক ছিলেন। ১৯৩১ সনে তিনি আমার বি. এ. অনার্সের উত্তরপত্র এবং ১৯৩২ সনে আমার এম. এ পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষা করেছিলেন। সেই সূত্রে তিনি আমাকে আজীবন ছাত্ররূপে গণ্য করতেন এবং তাঁর অন্যান্য হাজার হাজার ছাত্রের মতই আমাকে স্নেহ করতেন। তাঁর স্নেহ আমার জীবনে এক পরম সম্পদ হয়ে উঠেছিল। ক্রমে তা থেকে তিনি আমাকে নিজের পরিবারস্থ আত্মীয়ের মতই মনে করতেন। একটি অতি ক্ষীণ সম্পর্কের সূত্রকেও তিনি তাঁর বিশাল হৃদয়ের শক্তিতে শক্তিশালী করে তুলেছিলেন।

কোন স্বভাব-কবিত্ব সম্পন্ন কবি যদি সাহিত্যের উচ্চতর অধ্যাপনার কার্যে নিযুক্ত হন, তবে তাঁর স্বাভাবিক কবিত্বের উৎস শুষ্ক হয়ে যায়। কারণ, তখন তাঁর মন রস-বিমুখী হয়ে তত্ত্বমুখী হয়ে পড়ে। কবি মোহিতলাল মজুমদার যত দিন মেট্রোপলিটান বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন, ততদিন তিনি কবিই ছিলেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহিত্যের অধ্যাপক হওয়ার পর তাঁর মধ্যে তাঁর স্বভাব-কবিত্বের স্রোত শুষ্ক হয়ে গিয়ে সেখানে সমালোচক মোহিতলালের জন্ম হ'ল, সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাতে ক্ষতি কিংবা লাভ হয়েছে, তার বিচার কোনদিন নির্ভুল হবে না। কিন্তু সমালোচকের চাইতেও যে সমাজে কবির স্থান অনেক ঊর্ধ্বে, সে কথা বুঝিয়ে না বললেও চলে। সেইজন্য মল্লিনাথের চাইতে কালিদাসকে আমরা বরাবরই উঁচুতে স্থান দিয়ে আসছি। কালিদাস রায়ও বাংলা সমালোচনা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন এ কথা সত্য, কিন্তু তাঁর সমালোচনার ধারা কবির সাহিত্য রসোপলব্ধি, কারণ, কবি কখনো বিচারক হতে পারেন না। বিচার করা মস্তিষ্কের কাজ, কিন্তু কাব্যরচনা করা হৃদয়ের কাজ। মোহিতলালের অধ্যপনার জীবন আরম্ভ হওয়ার পর থেকে মূলতঃ তাঁর সমালোচকের জীবনের সূত্রপাত হয়েছে; কবি কালিদাস রায় অধ্যাপক না হয়েও সাহিত্য সমালোচনার একটি উল্লেখযোগ্য ধারার সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু তিনি ধর্মত কবি, সেইজন্য কবিধর্ম তিনি কদাচ বিসর্জন

দিয়ে সমালোচকের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারতেন না। অথচ সে যুগে অধ্যাপক হলে অনেকেরই একটি পাণ্ডিত্যের অভিমান সৃষ্টি হত, তাঁরা নানা তথাকথিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা প্রকাশ করে পণ্ডিত বলে স্বীকৃতি লাভ করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে এমন সব জিনিস সৃষ্টি করতেন যা তাঁদের স্বধর্ম বা স্বক্ষেত্র থেকে যে শুধু ভ্রষ্টই করত তা নয়, অনেক সময়ে নূতন প্রয়াসের মধ্যে ব্যর্থতাও এ'নে দিত। ঔপন্যাসিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সেই প্রেরণায় 'চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী' রচনা করলেন, এবং 'শূন্য পুরাণ' সম্পাদন করলেন, তাতে নূতন ক্ষেত্রে তার এই সকল প্রয়াস যে-স্বীকৃতিই লাভ করুক, তার নিজস্ব ক্ষেত্র থেকে তাঁর এই স্বেচ্ছানির্বাসন তাঁর প্রতিভার পূর্ণাঙ্গ বিকাশে যে অন্তরায় সৃষ্টি করল, তা' অস্বীকার করা যায় না। কবির কাজ কবি করুক, ঔপন্যাসিকের কাজ ঔপন্যাসিক করুক, সমালোচকের কাজ সমালোচক করুক, কবি সমালোচক হ'তে চাইলে তাঁর কবিত্বও যায়, পুরোপুরি সমালোচকও হ'তে পারেন না। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও গীতার অমূল্য বাণী—'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ' সত্য।

সুতরাং মোহিতলালের দৃষ্টান্ত থেকেও বুঝতে পারা যায় যে কালিদাস রায় যদি সেদিন মোহিতলালের পরিবর্তে অধ্যাপক নিযুক্ত হতেন তবে হয়ত তাঁরও তাঁরই মত অবস্থা হত। কাব্য-পাঠক কবির বৈষয়িক অবস্থার কোনো সন্ধান করে না, কবির সৃষ্টি তাঁকে তার সকল পার্থিব পরিচয় উর্ধ্বে তুলে দেয়। বাংলা সাহিত্যের পাঠকের নিকট কবি কালিদাস রায়ের যে খ্যাতি তা তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করলে যে বাড়ত তা' বলা যায় না। মোহিতলাল মজুমদার সেদিন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন বলে যে কালিদাস রায়ের তুলনায় তাঁর বৈষয়িক কিছু উন্নতি হয়েছিল তাও নয়। সুতরাং কালিদাস রায়ের মধ্যে যে সারাজীবন তাঁর কবি-সত্তাটিও রক্ষা পেয়েছে বাংলা সাহিত্যের কাছে তাই পরম লাভ। অধ্যাপকের খ্যাতির প্রলোভনে যদি সেদিন তিনি স্বধর্মচ্যুত হ'তেন, তবে তা তাঁকে নিজেকেও তৃপ্তি দিতে পারত না, সমাজেও তাঁর এই নিরবচ্ছিন্ন খ্যাতি কিছুতেই রক্ষা পেত না। মোহিতলালের কাব্যই বেঁচে আছে, তাঁর সমালোচনার বই ছাত্রের পরীক্ষার কাজেও আজ আর লাগে না। কোনোদিনও লাগত কি না, তা'ও অনুমানের বিষয়।

কালিদাস রায় বাংলা ও বাঙ্গালীর সর্বশেষ কবি। তাঁর জীবিতকালের বহু পূর্বেই বাংলা কাব্যসাহিত্যের নূতন যুগের সূচনা হয়েছিল, তা' প্রধানত পাশ্চাত্ত্য আদর্শ প্রভাবিত যুগ; তার সঙ্গে কবি কালিদাস রায়ের কোনো যোগ ছিল না, অর্থাৎ বাংলা কাব্যসাহিত্যে যে নূতন যুগের সূচনা হয়েছিল, তার সঙ্গে বাংলা ও বাঙ্গালীর যোগ খুব ঘনিষ্ঠ নয়। তার প্রেরণা পুরো-পুরি পাশ্চাত্ত্য প্রভাব-জাত, তার জীবন এবং প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিও তাই। অর্থাৎ পাশ্চাত্ত্যের দৃষ্টি দিয়ে সেখানে আমার প্রতিবেশী মানুষকে দেখি, পাশ্চাত্ত্য কবির নিজ দেশীয় ফুল 'ডেফোডিলে'র বর্ণনা পাঠ ক'রে আমার দেশের বাগানে নিত্য যে ফুল আপনি ফুটে আপনি ঝরে তার সৌন্দর্য উপলব্ধি করি। কালিদাস রায় এই যুগে জন্মগ্রহণ করেও এবং পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত হ'য়েও পাশ্চাত্ত্য দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে আমাদের দেশের মানুষ কিংবা তার প্রকৃতিকে বুঝতে চেষ্টা করেননি। এ দেশেরই বৈষ্ণব কবি, মঙ্গলকাব্যের কবি যেভাবে এদেশের মানুষ ও প্রকৃতিকে প্রত্যক্ষ ক'রে আসছেন, তিনিও সেইভাবে তাদের প্রত্যক্ষ করেছেন। বাঙ্গালীর জীবনের ক্ষুদ্রতা সঙ্কীর্ণতার মধ্যেই তাঁর সৌন্দর্য ও মহত্ত্ব উপলব্ধি করেছেন, বাংলার অতসী, জবা, শেফালী, কুমুদ ফুলেই তিনি মণিহার

গেঁথেছেন। তাঁর এ বিষয়ে কোনো স্বপ্ন বা কল্পনা ছিল না; যা সহজ, সরল, তাই তাঁর কাছে সুন্দর এবং সত্য ছিল। সহজ ও অনাড়ম্বর বাঙ্গালীর জীবন তাঁর কাছে সত্য ও সুন্দর হ'য়ে উঠেছিল, বাংলার পল্লীর ধুলিমাটি আশ্রয় ক'রেই তাঁর কাব্যের স্বর্গ রচিত হ'য়েছিল। সেই অর্থেই তাঁকে বলেছি, তিনি বাংলার ও বাঙ্গালীর সর্বশেষ কবি, আর কোনো অর্থে নয়।

তাঁর প্রকৃতির মধ্যে যে একটি শিশুসুলভ সরলতা ছিল, তাই তাঁর কবিতাগুলোকেও সকল রকম জটিল এবং দুজ্ঞে'য় ভাব-রহস্য থেকে সর্বদা মুক্ত রেখেছে। ভাব প্রকাশের প্রত্যক্ষতার যে একটি ধারা প্রাচীনকাল থেকেই বাংলা সাহিত্যে চলে এ'সেছে, আধুনিক যুগে উত্তীর্ণ হ'য়েও তিনি তার সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করেছিলেন। বাঙ্গালীর সাহিত্যিক ঐতিহ্যের সঙ্গে তিনিই শেষ পর্যন্ত যোগ রক্ষা করেছিলেন, নতুবা আধুনিক বাংলা কবিতা বাংলা হয়েও যে বাঙ্গালীর হয়নি, তার ঐতিহ্য বিচ্যুতিই প্রধান কারণ। কালিদাস রায়ের কবিতা কাশীরাম-কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম-ভারতচন্দ্র, গোবিন্দদাস—জ্ঞানদাসের সঙ্গে স্বাভাবিক যোগ রক্ষা করে চলেছিল, কোনো ক্ষেত্রেই তার সঙ্গে কোনো-বিচ্ছেদ সৃষ্টি করেনি। সেই ধারার সর্বশেষ কবির তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা সাহিত্যের অতীতের সঙ্গে বর্তমানের, ঐতিহ্যের সঙ্গে প্রথার বিচ্ছেদ সৃষ্টি হ'য়ে গেল।

কালিদাস রায় বাংলা সাহিত্যের শেষ বৈষ্ণব কবি। কেউ কেউ এই বিষয়ে এই ব'লে সন্দেহ প্রকাশ করতে পারেন যে আধুনিক কাব্য সাহিত্যের নূতন যুগের প্রবর্তনের পরও কি বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব কবিতার ধারা বেঁচে ছিল? তা'যে প্রকৃতই বেঁচে ছিল, মধুসূদন থেকে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কালিদাস রায় পর্যন্তই তার প্রমাণ। ঐতিহ্য ব্যতীত জাতীয় সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপিত হ'তে পারে না। মাইকেল রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাহিত্যের শক্তি প্রধানতঃ যে ঐতিহ্য থেকে এসেছে তা' আজ আর কাউকে বুঝিয়ে বলবার আবশ্যক করে না। তবে তাদের সৃষ্টি এত বিশাল, বিচিত্র এবং বহুমুখী হ'য়ে উঠেছিল যে, আপাতদৃষ্টিতে তা অনুভব করা কঠিন হ'য়ে পড়ত। বিশেষত আমাদের বিশ্লেষণী প্রবণতা ঐতিহ্যমুখী নয়, বরং তা বিমুখী; সেই জন্যই তার অস্তিত্ব আমরা তাদের মধ্যে সহজে অনুভব করতে পারিনে। কিন্তু কুমুদরঞ্জন-কালিদাস রায়ের রচনা এত বিচিত্র এবং বহুমুখী হ'য়ে উঠতে পারেনি ব'লে, তা সেখানে সুস্পষ্ট হ'য়ে প্রকাশ পেয়েছে।

বাঙ্গালীর সমগ্র ভাব-সত্তা গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনার মধ্যে ধরা দিয়েছে। সুতরাং কাব্য সাধনার মধ্যে যে কবি তাকে মুখ্য করেছেন, তিনি সহজেই বাঙ্গালীর হৃদয়ের কবি বলে বাঙ্গালীর হৃদয়ের সিংহাসনে স্থান লাভ করেছেন। সেই অর্থেও কালিদাস রায় বাঙ্গালীর কবি, বাংলার কবি।

কিন্তু সেই বাংলা আজ আর নেই, বাঙালীর ভাবনায় আজ বিশ্বজীবনের ছায়াপাত হ'তে আরম্ভ ক'রেছে। কিন্তু বাঙ্গালী বাঙ্গালীকে যত নিবিড় করে কাছে পেতে পারে' বিশ্বভাবনার মধ্য দিয়ে বিশ্বকে কোনোদিন ততখানি আপনার ক'রে লাভ করতে পারবে না। সেইজন্য বিশ্বভাবনার মধ্যে যে গৌরবই থাক না কেন, তা' যদি অন্তরের সঙ্গে যোগরক্ষা না ক'রে কেবল লোক-দেখানো ভাব-বিলাসিতা মাত্র হ'য়ে দাঁড়ায় তবে তার কোন মূল্য নেই। প্রকৃতপক্ষে হয়েছেও তাই।

কবি কালিদাস রায় তাঁর দীর্ঘজীবনে যত কবিতা রচনা ক'রেছেন, তাদের মধ্য দিয়ে বাংলা ও বাঙ্গালী জীবনের ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যেও মহত্ত্ব, সৌন্দর্য ও মাধুর্যের সন্ধান করেছেন। যে যুগে আমাদের কেবলমাত্র বাইরের কথা শুনে শুনে বিশ্বভাবনায় তন্ময় হ'য়ে ঘরের কথা ভুলতে গিয়ে ছিলাম, সেই যুগেই কবি কালিদাস রায় কেবলই নানা ভাবে আমাদের ঘরের কথা শুনিয়ে-শুনিয়ে ঘরের দিকে আমাদের মন আকৃষ্ট করেছেন। তাঁর কবিতা প'ড়ে যে তুলসীমঞ্চটি আমাদের অযত্নে এবং অবহেলায় আমাদের গৃহাঙ্গিনায় কাঁটা বনে পরিণত হ'য়ে গিয়েছিল, তা নূতন করে আগাছামুক্ত ক'রে তার নীচে আবার সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালিয়ে দেবার প্রেরণা পেয়েছি।

কবি কালিদাস রায়

প্রেমেন্দ্র মিত্র

জীবনে কয়েকটা অসমাপ্ত কাজের জন্যে মনের মধ্যে একটা অনুশোচনা ও অপরাধবোধ থেকেই যায়। পরমশ্রদ্ধেয় কবি কালিদাস রায় সম্বন্ধে তেমনি একটা কর্তব্যচ্যুতির গ্লানি সমস্ত বাংলা সাহিত্যজগতেরই বোধহয় অনুভব করা উচিত। সম্পূর্ণ উদাসীন না হলেও তাঁর সম্বন্ধে বাংলার পাঠক সমাজ যথোচিত শ্রদ্ধাসচেতন যে বর্তমানে নয় একথা অস্বীকার করে কোনো লাভ নেই।

ব্যাপারটা একালের ধর্ম বলে মেনে নিয়ে নির্বিকার যাঁরা থাকতে পারেন তাঁরা থাকুন। এ বিষয়ে নিজেদেরও কিছুটা অপরাধী যাঁরা না মনে করে পারেন না, আমি নিজেও তাঁদের মধ্যে একজন।

অগ্রজদের ঋণ পরিশোধের শক্তি সামর্থ্য থাক বা না থাক তা স্বীকার করবার কৃতজ্ঞ উৎসাহ টুকুরও অভাব বাংলা সাহিত্যরসিকদের গৌরব বাড়ায় না।

এ বিষয়ে নিজের ত্রুটিটুকু সম্পূর্ণ অস্বীকার না করেও এইটুকু শুধু নিজের সাফাই হিসেবে বলতে পারি যে, কবি কালিদাস রায়ের কাব্যসৃষ্টি সম্বন্ধে আমার মুক্ত সচেতনার একটা চাক্ষুষ প্রমাণ অন্তত এখনো বর্তমান। সে প্রমাণটি হল তার 'আহরণী' নামে কবিতা সঙ্কলনটির একটি সমালোচনা। 'কৃত্তিবাস ভদ্র' ছদ্মনামে তখন কবি কালিদাস রায় সম্বন্ধে যা লিখেছিলাম আজ আমার পরিণত মনের বিচারেও তার প্রতিটি কথা অভ্রান্ত বলে বুঝে সেই রচনাটিই সম্পূর্ণ ও যথাযথভাবে এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম—।

'আহরণী' পড়িতে পড়িতে প্রথমেই মনে হয় বাঙ্গালা সাহিত্যের যে বিশেষ কালটি রবীন্দ্র-প্রতিভায় আচ্ছন্ন হইয়া আছে তাহাকে রবীন্দ্রযুগ নাম দিয়া রবীন্দ্রনাথের উপযুক্ত সম্মান দিলেও কয়েকজন কবির প্রতি অত্যন্ত অবিচারই আমরা করিয়াছি।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক ও করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি যে কয়েকজন কবি এই যুগে বাঙ্গালা সাহিত্যকে অলঙ্কৃত করিয়াছেন সাধারণভাবে রবীন্দ্র-যুগের কবি বলিয়াই তাঁহারা পরিচিত। অথচ রবীন্দ্রযুগের কবি বলিলে যদি রবীন্দ্রনাথের পদাঙ্কসারী কবি বুঝায় তাহা হইলে এই দুর্লভ সম্মান তাঁহাদের কাহারও প্রাপ্য নহে। দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্য বশত রবীন্দ্রযুগে কলম ধরিয়াও তাঁহারা সকলেই নিজের বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই বজায়

রাখিয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের নিজস্ব রসের ধারা যেমনই হোক, স্বতন্ত্র পথেই প্রবাহিত হইয়াছে; রবীন্দ্রনাথের বিরাট স্রোতে মিশিয়া নিজেকে হারাইয়া ফেলে নাই। রবীন্দ্রযুগ কথাটা তাই অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ভাবে শুধু একটি বিশেষ কাল সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, সে কালের কবিদের উপর ইহা জোর করিয়া চালাইলে অত্যন্ত অবিচারই করা হয়।

দেশে কোন বিরাট প্রতিভা বন্যারূপে যখন আসে তখন খালবিলও কিছুদিনের মত ভাসিয়া স্রোতমুখর হয় ইহা সত্য ও স্বাভাবিক। রবীন্দ্র প্রতিভার আলোকে সাহিত্যাকাশে এমনি ছোট খাট চন্দ্রের আবির্ভাব যে হয় নাই এমনও নয়। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে এই যুগেই রবীন্দ্রনাথের প্রভাব এড়াইয়া এতগুলি শক্তিমান কবি বাঙ্গালা দেশে শুধু কাব্যের বিষয়-বস্তুতে নয়, সুরে ও ভঙ্গিতে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছেন।

আর সকলের কথা ছাড়িয়া শুধু কবি কালিদাস রায়ের কাব্য আলোচনা করিলে দেখা যায় তাঁহার রবীন্দ্রপ্রভাব হইতে মুক্ত হওয়ার কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি রবীন্দ্রযুগে লিখিতে বসিয়াও তাঁহার প্রভাবকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন, সামনের দিকে নয়, বাঙ্গালা সাহিত্যের অতীত যুগে, তাঁহার কাব্য প্রেরণার উৎস তিনি রবীন্দ্রনাথের ভিতর না খুঁজিয়া খুঁজিয়াছেন বাঙ্গালার প্রাচীন রসধারায়। 'নন্দপুর চন্দ্রবিনা' প্রভৃতি তাঁহার বিখ্যাত আগেকার কবিতাগুলি পড়িলেই বোঝা যায় বৈষ্ণব কবিতার চিরনূতন রসধারায় তাঁহার কাব্য অপূর্ব পরিণতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু কবি কালিদাস রায় এইখানেই স্থিত হইয়া থাকেন নাই। কোনখানে স্থির হইয়া থাকিবার মত কলম তাঁহাদের নয়। সত্য কথা বলিতে গেলে তাঁহার সমসাময়িক আর কোনও কবির রচনায় এত বিভিন্ন সুরের বৈচিত্র্য আছে কিনা সন্দেহ। তাই দেখি বৈষ্ণবযুগ ছাড়াইয়া তাঁহার কল্পনা ক্রমশঃ আরও অতীতে সংস্কৃত কাব্যের মায়ালোকে প্রবেশ করিয়া নূতনভাবে রঙীন হইয়া উঠিয়াছে। এবং কবি কালিদাস রায়ের কাব্যের তাহাই থাকা সঙ্গত বলিতে পারা যায়। বৈষ্ণব পদাবলীর ঘোর তাঁহার কাটিয়া গিয়াছে বলা যায়, কিন্তু সংস্কৃত কাব্যের ছোপ তাঁহার মনে এমন গভীরভাবে লাগিয়াছে তাঁহার কাব্যদৃষ্টিকে পর্য্যন্ত এমনভাবে তাহা প্রভাবান্বিত করিয়াছে যে তাঁহার আধুনিক অধিকাংশ কবিতায় সেই অচপল, শান্ত, উচ্ছ্বাসবিহীন অথচ বর্ণাঢ্য ভাবই আমরা দেখিতে পাই। অদূর ভবিষ্যতে সে প্রভাব হইতে মুক্ত হইবার সম্ভাবনা তাঁহার নাই, আমরা তাহা প্রার্থনাও করি না। আসলে কবি কালিদাস রায়ের সংস্কৃত কবিদের সঙ্গে সত্যকার একটি গভীর আত্মীয়তা আছে, সে আত্মীয়তা অনুকরণের কৃত্রিম মিলন হইতে গড়িয়া উঠে নাই, মনের গঠনের সত্যকার ঐক্য হইতেই আসিয়াছে। চেষ্টা করিয়া সংস্কৃত কবিদের অনুসরণ তিনি করেন নাই। তাঁহার মনের গতিই ওই দিকে। তিনি যখন লেখেন—

"বরিষার বারি ঝরে জীর্ণ ধরণীর পরে
চাতকীর দীর্ণ-কণ্ঠ মাঝে।
তপঃশীর্ণা গিরিজারে তুমি এলে ছলিবারে
মেঘবস্ত্রে নব ছদ্মসাজে।

জলভরা টলমল আঁখি তার ছলছল
পল্লবিত পুলক অঙ্কুর।
শত গুণে কান্তি তার উপচিত পুনরায়
সর্বদাহ জ্বালা হল দূর ॥"

(নিসর্গ চিত্র, আহরণী)

তখন যে সংযত শক্তি, ভাষার মিতব্যয়ে শব্দের রসায়নে যে অপূর্ব্ব ব্যঞ্জনার পরিচয় পাই সংস্কৃত কবিদের শুধু অনুকরণে তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না।

আহরণীতে কবির বিভিন্ন সময়ের লেখা বিভিন্ন ভাবের অনেকগুলি কবিতা আছে। এই কবিতা-গুলি পড়িলে, পূর্বে কবি কালিদাস রায়ের লেখার বৈচিত্র্যের যে কথা উল্লেখ করিয়াছি তাহা নিঃসংশয়ে প্রমাণ হইয়া যায়। নানাভাবে নানাভঙ্গিতে নানাবিষয়ে ও নানারস অবলম্বন করিয়া অজস্র কবিতা তাঁহার কলম হইতে অনায়াসে বাহির হইয়াছে। কবি হিসাবে কালিদাস রায়ের যদি কিছু দোষ থাকে তাহা হইলে তাঁহার কলমের এই একান্ত অনায়াস স্বচ্ছন্দ গতিই তাহার কারণ। এত সহজে যিনি নিজেকে প্রকাশ করিতে পারেন তাঁহার সময়ে সময়ে প্রকাশ্য বিষয়ের মূল্য সম্বন্ধে অমনোযোগী হওয়া স্বাভাবিক। যে রসধারার বেগ এমন বিপুল তাহা সব সময়ে গভীরতার অপেক্ষা রাখে না, উঁচু ও নীচু অনেক কিছু সে ছাপাইয়া চলে।

ঃ কালিদাস রায় ঃ
মানুষ ও কবি

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

কবিশেখর কালিদাস রায়ের জীবনাবসান হয়েছে। রবীন্দ্র পরিমণ্ডলের অন্তর্গত অগ্রণী কবিদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যৌবনেই চলে গিয়েছিলেন। অবশিষ্টদের মধ্যে ছিলেন যতীন্দ্রমোহন বাগচী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, নরেন্দ্র দেব, মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। গত দুই দশকে সবাই তাঁরা একে একে ছুটি নিয়েছেন। শুধু কালিদাস রায় ছিলেন সর্বশেষ প্রতিনিধিরূপে। বাংলা কবিতার গোটা প্রাগাধুনিক অধ্যায়টির উপরই তাই আজ পর্দা পড়ল তাঁর প্রয়াণের সঙ্গে সঙ্গে। নূতন যুগের কবি ও কাব্যের সমঝদার যাঁরা, তাঁরা এঁদের কবিতা বাধ্য না হলে পড়েন না, এঁদের কথাও কমই বলেন। বাংলা কবিতার বস্তু ও বাচনভঙ্গীতে আজ দেখা দিয়েছে আদ্যন্ত যে পরিবর্তনের হাওয়া, তার পরিপ্রেক্ষিতে এঁদের রচনা অনেকের চোখেই প্রতিভাত হয় দিদিমার গায়ের গহনার মত। সোনার খাঁটিত্ব নিয়ে মনে হয়ত অনেকেরই প্রশ্ন নেই, কিন্তু গঠনশৈলী ঠেকে যুগরুচির বিচারে বকেয়া। তাই প্রাত্যহিক প্রীতিভোজে চলে না তা। কিন্তু কবি হিসাবে এঁরা কি সত্যিই অগণনীয়? অথবা সবাই কি শুধু রবীন্দ্রনাথের ভাব ভাষা ও বিষয়বস্তুর ওপর চোখ বুজে কলমই বুলিয়ে গেছেন? কোন বিচারশীল মানুষই তা বলবেন না। এঁদের প্রত্যেকেরই ছিল নিজস্ব এক-একটি ধরন, নিজস্ব এক একটি প্রকাশভঙ্গী এবং রবীন্দ্র প্রাণধর্মে অনুপ্রাণিত হলেও প্রত্যেকে তাই ইতিহাসে এঁকে গেছেন, ছোট করেও আপন আপন স্বাধিকারের ছাপ। বিশেষ করে সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথ এবং কালিদাস তো রীতিমত সুচিহ্নিত স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী কবিই। সর্বগ্রাসী অশ্রদ্ধা ও নেতিবাদের আবাদ আজ দেশে উগ্র হয়ে ওঠার বিপাকে হয়েছে এঁদের সাময়িক অবমূল্যায়ন। এ চলে যাবে প্রকৃত বোদ্ধারা দেখা দিলেই।

ছাত্রজীবনের শেষ ধাপেই আমার পরিচয় হয় কালিদাসদার সঙ্গে। মাতুলকুলের সূত্রে তাঁর সঙ্গে আমার একটু আত্মীয়তার সম্পর্কই ছিল। কিন্তু সে জন্যে নয়, তাঁর বিদ্যা, বৈদগ্ধ্য, সহৃদয়তা ও সর্বোপরি সহনশীল সাহিত্যবোধের জন্যেই তিনি হয়েছিলেন আমার পরমাত্মীয়ের মত। তাঁর ও তাঁর অনুজ প্রয়াত রাধেশ রায়ের সহযোগিতা এক সময় আমার সাহিত্যিক এবং সাংসারিক জীবনের প্রারম্ভিক অধ্যায়ে বিশেষ মূল্যবান ছিল। বহু মহলে প্রথম প্রবেশপত্র জুটিয়ে দিয়েছিলেন আমাকে কালিদাসদা। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রসচক্র নামক সাহিত্য বৈঠকেই আমি সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ সরকার, রমাপ্রসাদ চন্দ, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, বিনয়কুমার সরকার প্রমুখের সান্নিধ্যে আসি এবং তাঁদের স্নেহ লাভের সুযোগ পাই। শরৎচন্দ্রও রসচক্রে আসতেন, আসতেন আরো অনেকে, যাঁদের

সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল আগেই। কালিদাসদা ও তাঁর বন্ধু কুমুদ রায়চৌধুরীর উদ্যোগেই আমার 'বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা', এবং 'শতাব্দী ও সাহিত্য', বই দুখানি চক্রবর্তী চ্যাটার্জী এণ্ড কোম্পানি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। শিক্ষকতা ছেড়ে আমি কলকাতা থেকে বিশ্বভারতীতে চলে যাবার পর বসন্ত রায় রোডের ভাড়াটে বাড়ি থেকে কালিদাসদা টালিগঞ্জে আপন বাড়িতে উঠে যান। আমিও আস্তে আস্তে সাংবাদিকতা এবং রাজনীতির মুল্লুকে আপাদমস্তক জড়িয়ে পড়ি। ফলে সরাসরি সংযোগ আর আগের মত সজীব থাকে নি তার সঙ্গে। কিন্তু মনের গভীরে অন্তরঙ্গতার কোন ব্যত্যয়ই হয়নি। কারণ কালিদাসদা ছিলেন এমন একজন মানুষ, যাকে ভাল না বেসে উপায় ছিল না কারো, যাঁকে ভুলে থাকা সম্ভব ছিল না কারো পক্ষে। যখন তখন সপরিবারে হাজির হতাম তাঁর কাছে। ধর্ম সাহিত্য, শিল্পকলা, সমাজ, শিক্ষা, বিচিত্র বিষয়ে তাঁর ছিল যেমন পর্যাপ্ত অধ্যয়ন, তেমনি অন্তর্ভেদী পর্যবেক্ষণ। তাই তাঁর সঙ্গে কথা কয়ে ক্লান্তিবোধ হত না কোন দিন কারো। বিরোধ ও বিতর্কে কনিষ্ঠ বা উদীয়মানের বক্তব্যকেও মেনে নেবার মত আশ্চর্য নমনীয়তা ছিল তাঁর। তাই মতান্তর কখনো মনান্তরে পরিণত হত না। তাছাড়া প্রতি কথাই তার ছিল রসসমৃদ্ধ। শুধু স্পষ্ট বিরূপ ছিলেন তিনি বিভেদপন্থী রাজনীতির ওপর।

অর্থাৎ ইংরাজীতে যাকে বলে কালারফুল পার্সনালেটি, বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, কালিদাসদা ছিলেন তাই। কবি, প্রাবন্ধিক, শিক্ষক, সমাজবোদ্ধা, রঙ্গনিপুণ মজলিসী ভদ্রলোক, নানা ভূমিকায় তাঁকে দেখেছি। সব জায়গায় তিনি উজ্জ্বল অনবদ্য। সব সময় সর্ব্বজনপ্রিয়। কিন্তু তবু মানুষটির পূর্ণ পরিচয় কি পেয়েছেন সবাই? মোটেই না। হিন্দু দর্শন ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণেতিহাসে তিনি ছিলেন পর্যাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী। ব্যাকরণ, অলংকার ও ছন্দে ছিলেন অসামান্য পণ্ডিত। তার প্রবন্ধে ও কবিতায় এই বিদগ্ধ সত্তাটাই প্রকাশমান হয়েছে। কিন্তু তাঁর এ পরিচয় সযত্নে সংগ্রহ করেননি অনেকেই, সে সুযোগও হয়নি, কারণ জীবনের বেশ বড় একটা অংশই অপব্যয়িত হয়েছিল. কালিদাসদার শিক্ষকতার সীমিত আয়পূরণের জন্যে একগাদা স্কুলপাঠ্য বই লিখে, গভীর ও ঐকান্তিক নিষ্ঠায় উচ্চতর নিবন্ধাদি লেখার জন্যে যথেষ্ট অবসর পান নি তিনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার জীবনব্যাপী সাহিত্যে ঐশ্বর্য কম নেই। ব্রজবেণু, ক্ষুদকুঁড়া, ঋতু মঙ্গল, লাজাঞ্জলি, এই চারখানি প্রথম দিককার এবং হৈমন্তী, বৈকালী, পূর্ণাহুতি এই তিনখানি শেষ দিককার কবিতা পুস্তকে মূর্ত হয়েছে তাঁর বহুমুখী কবিব্যক্তিত্ব। পল্লী কবি, বৈষ্ণব কবি, ক্লাসিকাল কবি, কৌতুক কবি, যুগ সচেতন একালীন কবি, নানাখণ্ড অভিব্যক্তির সমবায়ে গড়ে উঠেছিল তাঁর অখণ্ড যে কবিসত্তা, তা ভীড়ে হারাবার মত নয়। তাঁর ভাষা ভূষা দুইই স্বতন্ত্র। প্রবন্ধ পুস্তকগুলির মধ্যেও বঙ্গ সাহিত্য পরিচয় এবং প্রাচীন বাংলা সাহিত্য নিঃসন্দেহে প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যবিচার বিষয়ক গ্রন্থ। অধ্যয়ন ভূয়িষ্ঠ ঋজু চিন্তায় প্রাণবন্ত এদের প্রতিটি পৃষ্ঠা। এছাড়া আছে তাঁর তিনখানি লঘু প্রবন্ধের সংগ্রহ, চনক সংহিতা যার মধ্যে অগ্রগণ্য। দানের অনুপাতে মান তাঁর প্রাপ্তি হয়েছে অনেক দেরীতে। কিন্তু নিরাসক্ত সারস্বত সাধক কালিদাস কোনদিনই কিছু নিয়ে অনুযোগ করেন নি। আজ জীবন থেকে জীবনাতীতে প্রস্থিত সেই সহৃদয় অগ্রজের নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছি।

কবিশেখরের ব্যঙ্গরস

পরিমল গোস্বামী

কালিদাস রায় যদিও হিংস্র নন, তবু কয়েকটি অনাচারের বিরুদ্ধে উৎকৃষ্ট ব্যঙ্গ রচনা করেছেন। এবং শুধু অনাচার নয়, তাঁর ব্যঙ্গ দৃষ্টি অন্যদিকেও প্রসারিত হয়েছে। একটি সামাজিক 'নিউস্যান্স' বা অভদ্র ইতর উপদ্রব, যা বিশেষভাবে শহর জীবনের পক্ষে অভিশাপরূপে দেখা দিয়েছে এবং যার দাপট ক্রমবৃদ্ধির মুখে, সেই উপদ্রব, লাউড স্পীকার। কোনো সভ্যদেশে যার এইপ্রকার আবির্ভাব ও স্থিতি একেবারেই অসম্ভব, সেই বস্তু সকল রুচি সকল শালীনতাকে পদদলিত করে তার উদ্ধত আওয়াজ এদেশের প্রাণ কেন্দ্রে আঘাত হানছে। কবিশেখরের ভাষায় এর বিরুদ্ধে ক্ষীণ প্রতিবাদ মাত্র ধ্বনিত হওয়া সম্ভব, এবং তা শুধু হতাশার প্রতিবাদ, তার বেশি কিছু করা অবশ্য কোনো ভদ্রলোকের পক্ষে সম্ভব নয়।

ঢক্কাও মধুর হ'ল কানে ধাক্কা মারে না সে আর,
কারণ গর্জিছে কাছে খরকণ্ঠে লাউড স্পীকার।
কান হল ঝালাপালা প্রাণ বলে 'পালা পালা,'
পূজার আনন্দটুকু কষ্টার্জিত করে তা সাবাড় ।।...
মা আসেনি অসুরটা এসে ঠিক হয়েছে হাজির,
তাহারি তো পোয়া বারো, তারে ঘিরি জমে যত ভিড়।
তারি গলা দিন রাত করে কানে বজ্রাঘাত;
গানের বার্ষিক শ্রাদ্ধে মা আমারে করুন বধির ।।

লাউডস্পীকার রূপ জাতীয় জীবনের এই কুৎসিত অভিশাপ অবশ্যই ব্যঙ্গ যোগ্য, কিন্তু সে ব্যঙ্গ আরো দশগুণ শক্তিশালী লাউড স্পীকারের সাহায্যে ঐসব বিকট আওয়াজ উদ্‌গারী প্রত্যেকটি যন্ত্রের বিপরীত দিকে স্থাপন করে বাজাতে পারলে হয় তো কিছু কার্যকর হতে পারত। আমি ঐ কবিতাটির মাত্র দুটি স্তবক উদ্ধৃত করেছি, মোট কবিতাটিতে সাতটি স্তবক।

'সুজলা সুফলা' আমাদের দেশের বিষেষণরূপে একালের আর একটি ব্যঙ্গের বিষয়। কবিশেখরও বর্তমানের পরিবেশে উক্ত বিশেষণের অসঙ্গতিটি ভাল করেই ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর 'সোনার বাংলা' কবিতায়।

প্রসঙ্গত বলি, বনবিহারী মুখোপাধ্যায় তাঁর 'নরকের কীট' নামক ব্যঙ্গ গল্পে বলেছেন—"I mean your সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং অর্থাৎ কিনা যে দেশে আখ খেজুরের চাষ হয় এবং জাভা থেকে চিনি আমদানি করতে হয়, যে দেশে জলকষ্ট একটা দৈনন্দিন ব্যাপার।"

দেশের প্রতি মমত্ববশত রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন 'সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।' এ গানে ভালবাসার কথাই ব্যক্ত হয়েছে, বিশেষণের বাড়াবাড়ি নেই। তাঁর 'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী' গানেও তাই। 'দেশেবিদেশে বিতরিছ অন্ন' তখন সত্য ছিল। দেশে দারিদ্র্য তখন বর্তমানের মতো এমন প্রখর ছিল না, লোকে অল্পে খুশি থাকত, লোকসংখ্যা ভয়াবহ রকমের বেশী ছিল না, তাই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পক্ষে দেশকে সুজলা সুফলা ভাবতে কষ্ট হয়নি। সে অবস্থা অনেকটা এখনো আছে, কিন্তু অবস্থার বিপাকে দেশে অংশত কৃত্রিম অভাব সৃষ্টিকারীদের হাতে পড়ে দারিদ্র্য এবং অন্যদিকে সাধারণ মানুষের মোহমুক্তি ঘটাতে দারিদ্র্যবোধ তীব্র রকমে বৃদ্ধি পেয়েছে। আর ঠিক এই কারণেই সুজলা সুফলা বিশেষণ এখন ব্যঙ্গের বিষয়। অন্যদিকে দেশের প্রতি ভক্তির আতিশয্যে যখন বলা হয়—এমন দেশ আর কোথাও নেই, কারণ এদেশে ফুলে ভরা গাছ, কুঞ্জে কুঞ্জে পাখীরা গান করে, পুঞ্জে পুঞ্জে অলিরা ধেয়ে আসে এবং 'ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে।' অথবা ভায়ের মায়ের এমন স্নেহই বা কোন্ দেশে মিলবে বলা হয় তখন এর অতিবাদটি ব্যঙ্গের বিষয় হয়ে ওঠে, কারণ মায়ের স্নেহ সব দেশেই এক, ভায়ের স্নেহ কেমন তাও অজানা নেই, এদেশে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও "ভাই ভাই" কি জানা আছে। তা ছাড়া কোন দেশেই অলিকুল ফুলের মধু খেয়ে ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে না। মৌমাছিরা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়লে তাদের চাকরি যেত, কারণ চাকের জন্য মধু সংগ্রহই তাদের কাজ, ঘুমানো নয়। তাই এ নিয়ে ব্যঙ্গ লিখলেন বনফুল—

ধনধান্য পুষ্পেভরা বসুন্ধরা মাঝে
শ্রেষ্ঠতম তবু তাহা।
বুলবুল, পিউ-কাঁহা, পিক দহিয়াল
কুঞ্জে কুঞ্জে মুখরিয়া একুল পিয়াল
হারায়ে সম্বিৎ
ক্রমাগত গাহিছে সঙ্গীত।
পুঙ্গে পুঙ্গে অলি
ক্রমাগত পুষ্প পরে পড়িতেছে ঢলি
কিছু না মানিয়া…

আর কবিশেখর সুজলা সুফলা নিয়ে লিখলেন—

জননী বঙ্গভূমি
কবি বলেছেন সুজলা সুফলা শস্যে শ্যামলা তুমি।
মিথ্যা কেমনে বলি ?
তবে কিনা গেছে তার পরে পুরা আশিটি বছর চলি'।
মালয় ব্রহ্ম হ'তে
আসিতেছে চাল বস্তা বস্তা পোতে।
আমেরিকা হতে লাখ লাখ টন আমদানি হয় গম।
মাদ্রাজ হ'তে আলু আসিতেছে, খাই তাই তারি দম।
কানপুর দেয় টিন টিন তেল, গাজিপুর দেয় চিনি

গৌড়ের লোক আমরা, তবুও চটে-মোড়া গুড় কিনি।
বিহার হইতে আসে ছালা ছালা ডাল,
তাইত গলায় প্রবেশ করিছে কঙ্কর-ভরা চাল।
শুধু তাই নয়, আসিতেছে ফল আম্র, পিয়ারা-লিচু
দ্বারভাঙা হতে ওয়াগন ভরা, বানারস হতে কিছু।··
অভাব কি তব আছে?
আমড়া ডুমুর তাল বেল কুল ফলিছে তোমার গাছে।
ঢেঁড়স ধুঁধুল কুমড়া কাঁকুড় ফলিছে তোমার ক্ষেতে।
কাঁচকলা ঝিঙে লাউ চিচিঙ্গে রাশি রাশি বাজারেতে।
কচু ওল মূলা বাড়িছে মাটির তলে,
হরেক রকম শাক জন্মায় তোমার স্থলে ও জলে।
সজিনা গাছে, মা, ডাঁটার অভাব নাই,
কচি নিমপাতা যত চাই তত পাই।

ভক্তিবশে যে ছবি আঁকা হয় বাস্তব দৃষ্টিতে তা যখন মিথ্যা মনে হয় তখন বিষয় স্বভাবতই ব্যঙ্গের বিষয় হয়ে ওঠে।

আরো আছে। আমরা ভারতবাসীরাই জগদ্‌গুরু ছিলাম, অর্থাৎ আমরা বিজ্ঞানে এত উন্নত ছিলাম যে বর্তমান ইউরোপ আমেরিকার যাবতীয় আবিষ্কার তার কাছে শিশু। এমন শূন্যগর্ভ দাম্ভিকতা কিছুকাল আমাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং এখনো সম্পূর্ণ দূর হয়নি। এবং এ বিষয়ে অনেকেই ব্যঙ্গ লিখেছেন। আমরা আর্য এই নবলব্ধ খবরটি জানবার পর থেকেও আর একরকম দাম্ভিকতা দেখা দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এবিষয়ে অনেক রচনা করেছেন। কবিশেখরের 'প্রাচীন গৌরব' নামক কবিতায়ও আমাদের প্রাচীন কাল স্মরণ করে শূন্যে আস্ফালন সুন্দরভাবে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। কিছু নমুনা—

সবই ছিল—সবই ছিল
গুরু বলে মানছ যাদের নতুন তারা কি আর দিল?
...রেল ষ্টীমার টেলিগ্রাফি ছিল ছিল ভারতব্যাপী।
ছিল মোদের ফোটোগ্রাফি, ছাপাখানা পেপার মিলও॥
ওদের যা' তা' সবই ছিল বেশি ছিল মোদের বরং
প্রমাণ করে ভেঙে দিতে পারি আমি ওদের ভড়ং।
টর্পেডো কি ডুবো জাহাজ সবই ছিল, নেই বটে আজ,
জাহাজ ছাড়াও বীর হনুমান লম্ফে সাগর ডিঙাইল॥...

আরো বহু সুন্দর ব্যঙ্গ কবিতা লিখেছেন কবিশেখর। একটি টাকায় কি না হয় এই ভাবটি নিয়ে। এটি তিনি ফুটিয়েছেন 'টাকার ছড়া' নামক কবিতায়। এবং ঠিক তার বিপরীত কবিতা, 'দরিদ্রের সান্ত্বনা'। দুইই যথার্থরূপে ব্যঙ্গযোগ্য। একটিতে আছে—

টাকা হলেই বিজ্ঞ হবো প্রাজ্ঞ সমাজপতি,
মানবে না যে, করব তাহার চূড়ান্ত দুর্গতি।
টাকা হ'লেই সভ্য হবো বিশটা কমিটির,
একচেটিয়া সভাপতি সংঘ সমিতির।
চাইবে বই-এর ভূমিকা মত, চাইবে সবাই বাণী,
উৎসর্গও করবে কেতাব মহাপুরুষ জানি।
টাকা হলেই উজল হবে আঁধার ভবিষ্যৎ
কাঁটায় ভরা পথটা হবে গোলাপভরা পথ।
টাকা হ'লেই বাধ্য সবাই, সবাই অনুরাগী.
প্রিয়ার ক'ভাই আসবে সবাই আত্মীয়তার লাগি॥

এর বিপরীত কবিতা 'দরিদ্রের সান্ত্বনা'। একটিতে আর একটির ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছে। 'দরিদ্রের সান্ত্বনায়' 'বড় লোকের দুঃখ দেখে চক্ষে ধারা বয়,' নামক প্রথম ছত্রটিতেই এর মর্ম উদ্‌ঘাটিত। অর্থাৎ ধনী হতে না পারায়, ধনীর বিরুদ্ধে এবং তার হাজার রকম অসুবিধার বিরুদ্ধে ছড়া গেয়ে সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা। ঈশপের শেয়াল যেমন বলেছিল, আঙুর বড় টক, এও তাই (যদিও শেয়াল আঙুর খায় কিনা জানি না, যদি পূর্বে না খেয়ে থাকে তবে তা যে টক তা কি করে জানল, অথবা যে শেয়াল অতি বুদ্ধিমান বলে খ্যাত, সে আঙুর একবার খেতে না পেরেই হতাশ হল কেন, এসব প্রশ্নের উত্তর নেই ঈশপে)।

'তোমরা ও আমরা' নামক কবিতায় দরিদ্র ও ধনী দুদিকেরই অপক্ষপাত উক্তি থেকে জানা যায় ধনীরও অনেক অসুবিধা আছে। যথা—

সোজা নয় চাঁদ, ভাল খাওয়া-পরা
মোটর ল্যাণ্ডো চড়া,
দেনার খবর যদি শোনো তবে
চোখ হবে ছানাবড়া।
ঘুঘু দেখিয়াছ ফাঁদ ত দেখনি তার,
দোকানের বিল দেখ যদি একবার,
হ'য়ে যাবে তবে আধ হাত জিভ বা'র।....

'ধনী প্রতিবেশীর উদ্দেশে' নামক কবিতাটি উৎকৃষ্ট ব্যঙ্গ।

নই আসামী, খাতক আমি, নই তাঁবেদার, নইক প্রজা;
দেখলে তবু নোয়াই মাথা, ভরাই তবু এ এক মজা।
তুমি ভাব গুণের জোরে রাখলে বুঝি বন্দী করে,
তোমার কৃপা লাভের আশায় বুঝি তোমার ধরছি ধ্বজা॥
ভাবছ, বেজায় শ্রদ্ধাভরেই বুঝি মোরা নোয়াই মাথা,
ভাবছ বুঝি ধন্য হ'ব তোমার মাথায় ধরলে ছাতা।

বুঝবে কি ছাই গোবরা মাথায় তোমার কাছে ইষ্ট কে চায়,
পাছে কর অনিষ্ট হায় সেই ভয়ে হই কর্তা-ভজা ॥

'দন্তরুচি-কৌমুদী' পুস্তক থেকে এসব দৃষ্টান্ত নেওয়া হয়েছে। এই পুস্তকে অনেকগুলি অতি উচ্চশ্রেণীর ব্যঙ্গ আছে, পূর্বের লেখা অনেকগুলি ব্যঙ্গ অবশ্য এখন তাদের সার্থকতার কাল অতিক্রম করে গেছে, কিন্তু যেগুলি অদ্যাবধি উদ্দেশ্যহারা হয়নি, তার সংখ্যাও অনেক! শিক্ষা ও শিক্ষক বিষয়েও কয়েকটি উৎকৃষ্ট ব্যঙ্গ আছে। আমি অতঃপর গাধা নামক একটি ব্যঙ্গের একটুখানি অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি। এর ব্যঙ্গ অতি পরিষ্কার।

রেডিওর যোগ্য তব উচ্চ কণ্ঠস্বর,
তোমার সঙ্গীত যেবা বুঝে না ক সেই ত বর্বর।
বক্তৃতা করিলে তুমি মাইকের নেই প্রয়োজন,
অমায়িক জীব তুমি, দীর্ঘপুচ্ছ সুদীর্ঘ শ্রবণ,
কোটপ্যান্ট পরি যবে বসো গিয়া অফিসে চেয়ারে,
তখন গর্দভ ছাড়া কে চিনিতে পারে?

এই ধরনের আর একটি অপূর্ব কবিতা 'পূজা', সেটি থেকে সামান্য নিদর্শন দেওয়া হচ্ছে—

পূজা করি মোরা কারে?
আদপে জানি না আছে কিনা আছে মোটে যেই জন, তারে।
আর কারে পূজা করি?
অহিত করার শক্তি যাহার, মনে মনে যাবে ডরি।
কারে পূজা করি আর?
দিক বা না দিক, যার কাছ হতে আছে কিছু বাগাবার।
আর কারে করি পূজা?
ভক্তিতে যার কথা শুনে যাই যায় নাক কিছু বুঝা।
আর পূজা করি কারে?
মুখে খুবই মানি তবু যাঁর বাণী মানিয়া চলি না, তাঁরে ॥

কবিশেখরের হাতে ব্যঙ্গের যে অস্ত্র, তা তলোয়ার বা ভোজালি নয়, কিন্তু তাকে ক্ষুরের ব্লেড অনায়াসেই বলা চলে। মধুর কাব্য রচনায় সুনিপুণ কবি মনের যে অংশ পারিপার্শ্বিকের অসঙ্গতি ও ভণ্ডামিতে ক্ষুব্ধ, এসব রচনা মনের সেই অসহিষ্ণু অংশের রচনা।

তাঁর দান, আমাদের গ্রহণ

সন্তোষকুমার ঘোষ

তাঁর সহায়ক ছিল সময়, আবার তাঁর বৈরীও সেই সময়। রবীন্দ্রনাথের কালে জন্মানোর প্রসাদে একধরনের রোমান্টিক কবিতার অনুকূল আবেশ তিনি স্বতই অনিবার্যভাবে, অর্জন করেছিলেন। জনপ্রিয়তার রাস্তা সুতরাং কতকটা আপনা থেকেই প্রশস্ত হয়ে গেছে। কিন্তু ওই যে বলেছি, বৈরীও ওই কাল। রবির অত কাছাকাছি থাকলে দশা বুধগ্রহের মত হয়। প্রায় মার্তণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে উদয় আর সঙ্গে সঙ্গেই অস্ত। নৈকট্য পুড়িয়ে ছাইও করে দেয়। অন্তত যতীন্দ্রমোহন, করুণানিধান, কালিদাস রায় প্রমুখকে ঝলসে দিয়েছিল ঠিক। এঁরা যিনি যা তিনি তা হলেন না, ওঁদের যাঁর যা পাওনা তিনি পেলেন না তা।

অথচ প্রত্যেকের স্বতন্ত্র ভূমি ছিল। কালিদাস রায়ের অতিরিক্ত সম্পদ ছিল বৈষ্ণবসাহিত্য ও দর্শন। তিনি আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসও লিখেছেন। সমসাময়িক ঔপন্যাসিক, গল্পকার এবং কবিদের গুনগ্রাহী অগ্রজতুল্য সমালোচক তাঁর মত আর কে? তাঁর দৃষ্টিধন্যদের নাম অসংখ্য। শুধু জগদীশ গুপ্ত এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করেই তালিকার পালা আপাতত বন্ধ করি।

'রসচক্র' সাহিত্যগোষ্ঠীর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য তিনি, 'বসুধারা' নামে একটি পত্রিকারও সম্পাদনা করেন। এছাড়া এই বর্ষীয়াণ মনীষী বাংলা গদ্যেরও ধাঁচ আর শৈলী নির্ধারণ করে দিয়ে গিয়েছেন। কবিতার চেয়ে এক্ষেত্রে উত্তরকালের গদ্যলেখকদের তাঁর প্রতি বেশি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কেননা গদ্য লিখতে গেলেতো ব্যাকরণ প্রকরণ শিখতেও হয়।

এই ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত জীবনে (ইস্কুল টিস্কুলে) তাঁর ছাত্র যত, সাহিত্যের আঙিনায় তার তুলনা বহু শতগুণ।

অনেক দিন অবসর নিয়েছিলেন। কিন্তু সেই অগণিত ছাত্রদের অজস্র সংখ্যক আজও অবশিষ্ট। তার চেয়ে বড়ো পরিচয় তাঁর এই ভাষার অভিভাবকত্বে। বাংলা ব্যাকরণ, তার নিয়ম, শব্দবিয়োগ বা ব্যবহারটাই যে স্বতন্ত্র, এ সত্য আমি তাঁর লেখা থেকেই শিখি। দূর থেকে একলব্যের মতো। তাই নিজেকে তাঁর ছাত্র বলতে দ্বিধা নেই। গুরুকে গুরুত্ব দেব না কেন? রবীন্দ্রনাথ, রাজশেখর, সুনীতিকুমারের বিহনে এই দায় (ইংরেজিতে যেটা ফাউলারের) তাঁর উপর অর্পেছিল।

দায় নামিয়ে ভারমুক্ত তিনি পরিপূর্ণ সময়েই চলে গেছেন। বেলা ফুরোলে বসে থাকতে নেই,

কিংবা কাব্য ফুরোলে প্রস্থানই আমাদের স্বেচ্ছানির্বাচিত, স্বেচ্ছানির্ধারিত নিয়তি। তাঁরই নির্দেশ মান্য করেছেন কবিশেখর। আজ শুধু মূল্যায়ন, আজ শুধু তর্পণ তথা স্মৃতিচারণ।

এই কাজে আমাদের আলস্য, অনাদর, অবহেলা আর বিস্মৃতি বড়ো বেশি। তিনি যে সমাজচিত্রগুলি শেষ বয়সে এঁকে চ'লছিলেন, সে সব ছবির ঠিক ঠিক দাম প্রণিধান করেছি আমাদের কয়জন? একেবারে ঘরের ছবি—যেন নিকোনো দাওয়ার বাঁশের বেড়ায়। যে চাল একেবারে অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে, এ সেই চাল। একে আধুনিক পরিভাষায় সোসিওলজি বা 'সোসিওমেট্রি' বলা চলবে না, কারণ যা বুকের কাছের সত্য, তার নাম দেওয়া যায় না। অনেক অনেক দিন এই রচনাগুলি যথার্থ মূল্য নিরূপণের জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে। এমন কি বহু উদ্ধৃত 'নন্দপুর চন্দ্রবিনা' কবিতাটির ছন্দের অভিনবত্ব, ধ্বনি সম্মোহন, শ্বাসাঘাত ইত্যাদি নিয়ে পর্যাপ্ত পর্যালোচনাই হয়েছে কি? কথায় কথায় আওড়াই বটে, কিন্তু ও ব্যাপারে আমরা আজও অকৃতজ্ঞ, অধমর্ণ রয়েই গেছি। অর্থাৎ যা নিয়েছি তার প্রত্যর্পণ দূরে থাক, অনুভবও নেই। সর্বত্রই এই রীতি, এক রীতি। কবিশেখর কালিদাসই বা ব্যতিক্রম হবেন কেন?

সঙ্গ ও প্রসঙ্গ

শ্রীমতী বাণী রায়

— সঙ্গ —

সরস্বতীর বরপুত্র কালিদাস রায়ের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ যেখানে হওয়া উচিত সেখানেই অর্থাৎ সরস্বতী পূজার ক্ষেত্রে প্রতিমার সম্মুখে।

আমার স্কুলের বন্ধু বীণা গুহ দক্ষিণ অঞ্চলে বাসকালীন জমকালোভাবে বৃহৎ প্রতিমা এনে সরস্বতী পূজা করত। ঐ দিন বিকাল বেলায় আবৃত্তির আসরে বন্ধুদের নিমন্ত্রণ হয়েছিল।

মণ্ডপরূপে ব্যবহৃত কক্ষটির মধ্যে আমরা বসে ছিলাম। বীণার মা-বাবা সেখানে উপস্থিত। আমাদের সময়ে গুরুজনদের সম্মুখে হৈ হুল্লোড় চলত না, তায় নিমন্ত্রণে অন্য বাড়ী যেয়ে। সুতরাং বিনীতভাবে আমরা বসে ছিলাম। এমন সময়ে শোনা গেল স্বয়ং কবি কালিদাস এসেছেন।

উঁকি ঝুঁকি মেরে একে একে সকলেই উঠে দেখে আসতে লাগলাম। ভীত ভাব সকলেরি। আমি কৌতূহল সংবরণ করতে না পেরে মণ্ডপের বাইরে বারান্দায় উপস্থিত হয়ে দেখলাম শালতরুর মত দৃঢ়ভাবে একজন প্রশস্তবক্ষ প্রৌঢ় ব্যক্তি একটি লগুড় হাতে (শৌখিন ছড়ি নয়) দণ্ডায়মান। তিনি কেমন যেন অপ্রতিভ ও নির্বাক।

পরে তারাশঙ্করের 'আমার সাহিত্যজীবন' পুস্তক থেকে জানতে পারলাম যে কবিশেখর কালিদাস রায় লজ্জাশীল ব্যক্তি এবং প্রথম সাক্ষাতে তিনি তারাশঙ্করের সম্মুখেও অপ্রতিভ ভাব ধারণ করেছিলেন।

সেদিন আমরা বলাবলি করেছিলাম—এই কবিশেখর কালিদাস, যাঁর শব্দলালিত্যে, অনুপ্রাসের ঝঙ্কারে গীতিকবিতার অঙ্গে অঙ্গে অপরিসীম লাবণ্যলেখা তিনি এনে দেন? প্রথম দর্শনে অমন সুললিত পদকর্তার অনুরূপ বাহ্যাকৃতি অবশ্য দেখলাম না। আমি অতি শৈশবে আমার সুদূর পদ্মাপাড়ের দেশে শুনেছিলাম গ্রামাফোন ডিস্কে :—

"নন্দপুর-চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার"।

সেই পদকর্তার সন্দর্শনে পুলকিত হয়ে উঠিনি। তখন অজস্র লেখা লিখলেও লেখিকার পরিচিতি পাবার প্রশ্ন ওঠে না। অতএব অচিরাৎ কবিশেখরের সন্নিহিত হয়ে তাঁর প্রকৃত কবিহৃদয় জানতে পারলাম না। বাহ্যদর্শনের পশ্চাতে যে সত্যই কোমল, সহানুভূতিশীল কবি হৃদয়টি সদা জাগ্রত এই বোধ গ্রহণের দিন তখনও আসেনি।

দ্বিতীয়বার তাঁর সম্মুখীন হলাম, যতদূর মনে পড়ে আমাদের বাড়ীর একটি আসরে। আমার ছোটদা অনিলচন্দ্র রায় বাড়ীতে তখন মধ্যে মধ্যে সাহিত্যের আসর বসাতেন। সেখানে একদিন কবিশেখরের অনুবাদ 'ইন্দুমতীর স্বয়ংবর' পড়া হ'ল। অনুবাদে তাঁর অপরিসীম দক্ষতা অনুবাদকে আর একটি স্বাধীন কবিতায় রূপান্তরিত করতে পারত। তাঁর রচিত 'পর্ণপুটে'র প্রায় সমস্ত কবিতা আমার কণ্ঠস্থ ছিল। সেদিনও আসামে আবৃত্তি করেছি হাফিজের অনুবাদ—

"বাঁধিতে অবোধ হিয়া কোথা হতে এল প্রিয়া
তোমার অলকে এত ফাঁস—
তোমার গমনপথে পাতি দেই এই হিয়া
তোমার চরণরাগ রুমালে মুছায়ে নিয়া
তোমার কপোলকূপে পরাণ সঁপিয়া দিয়া
ডুবিয়া মরুক তব দাস—"

পল্লীকবির পল্লীর মানুষের সুখদুঃখ নিয়ে অপরূপ আলেখ্যগুলি বার বার পড়তাম। 'কুড়ানী' 'চাষীর ব্যথা' ইত্যাদি কবিতা ছিল আমার কণ্ঠস্থ। তাঁর মুখে অজমহিষী ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর শুনলাম। অনেক লোক সেদিন। বাড়ীর মেয়ে হিসাবে আমার শুধু উপস্থিত থাকা কর্তব্য ছিল।

কবিশেখর আমার মা লেখিকা গিরিবালা দেবীকে বই উপহার দিলেন। 'পর্ণপুটের' নবীন সংস্করণ।

তারপর কবে থেকে তিনি ঘরের লোক হয়ে গেলেন মনেও নেই। অপরাহ্নে লেকের ধারে কবিশেখরের ভ্রমণ অভ্যাস ছিল। তিনি এখানে চলে আসতেন মাঝে মাঝে। আমার ছোড়দার সাহিত্যে সক্রিয় মনোযোগ তখন অদৃশ্য হয়ে ছিল। মা ও আমার সঙ্গেই তিনি সাহিত্যালোচনায় বসতেন। তারপর বহুদিন পরে যখন অশক্ত হয়ে পড়লেন তখন আমিই তাঁকে দেখতে যেতাম 'সন্ধ্যার কুলায়ে'।

নানা সভায় দেখা সাক্ষাৎ হ'ত। এক সঙ্গে বক্তৃতার সৌভাগ্যও হয়েছে, একসঙ্গে সভায় গেছি। সাহিত্য আমার শৈশবে এসেছিল, বাড়ীর আবহাওয়ায় সাহিত্য ছিল তাই। পিতৃতুল্য সাহিত্যিককে 'দাদা' ডেকে ভগ্নীর মতই মেলামেশা করতাম। পদবীর সাদৃশ্য হেতু লোকে বলত আমি কালিদার সহোদরা হয়ত।

একদিনের কথা মনে পড়ছে। বিকাল বেলায় কালিদা এসেছেন বেড়াতে। লুচি ভাজা হচ্ছে, তাঁকে লুচি দিলাম। সঙ্গে কি যেন ভেবে লাউ চিংড়ি দিলাম। আমার মা শিউড়ে উঠলেন, "একি করছিস? ভাতে খাবার তরকারী কেউ বিকেলের জলখাবারে দেয়? তায় লাউচিংড়ি। একটু দেরী কর না। এক্ষনি তো বেগুন-পটল ভাজা হচ্ছে।"

আমার কেমন জেদ চাপল। আমি দেখবই দেখব 'পল্লীকবি' সত্যই পল্লীকবি কিনা।

কালিদা অতি তৃপ্তির সঙ্গেই খেলেন। বল্লেন, "আজ আমার রাত্রির খাওয়া খাইয়ে দিলে, বাণী। খুব ভালো খেলাম।"

ক'জন লেখককে অমন করে লাউ চিংড়ি দিয়ে লুচির প্লেট ধরে দিতে পারতাম ? এক বিভূতি-ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভিন্ন ? কলিকাতার ফিকে স্বাদের মিষ্টান্ন তৎসহ পরিমিত নোস্তা খাবার সকলকে দিয়ে থাকি, কখনও শৌখিন খাদ্য। কালিদাকে সবই দিয়েছি, কিন্তু ওই লাউচিংড়ির সূত্রে কালিদা আপনজন হয়ে মনে গাঁথা।

তাঁর মৃত্যুর কিছু পূর্বে শেষ দেখায় গিয়েছিলাম। সকাল বেলা তিনি তখনও আচ্ছন্ন অবস্থায়। দেখতে পারলাম না বেশীক্ষণ। তাঁর বাড়ীর প্রতিটি উৎসবে গেছি। বেড়াতে গেছি। কত আদর করে তিনি গৃহজাত জলখাবার আমাকে খাওয়াতেন। অসুখে-বিসুখে দেখতে গেছি। তাঁর শেষ জন্মদিনে গেছি। কত আলাপ আলোচনায় রঙ্গরসে মজলিসী কবিশেখরকে দেখেছি। সাহিত্য তাঁর প্রাণ ছিল। লেখক ও লেখাব বিষয়ে আলোচনা করতেই তিনি ভাল বাসতেন। আমার মা ও আমি একখানি যুগ্ম উপন্যাস লিখব স্থির ছিল। তদানীন্তন 'মহিলামহল' মাসিকপত্রে মা তাঁর অংশ লিখেছেন ঠিকই, আমার আর লেখা হয়নি। কালিদাস রায় রচনাটির নামকরণ করে দেন 'যুগসন্ধি' অর্থাৎ গিরিবালা দেবীর ও বাণী রায়ের দুইটি যুগের সন্ধি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যুগসন্ধি হ'ল না।

কবির সঙ্গ প্রসঙ্গ অনেক আছে। কিন্তু কবির আলোচনা শুধু সঙ্গ-সুধাকীর্তন নয়, কবিতা প্রসঙ্গ। বিস্তৃত ও ব্যাপক কালিদাস রায়ের কবিতা, মনস্বীর দীর্ঘ গবেষণার বস্তু। সামান্য পরিসরে আলোচনার বস্তু নয়।

মনে পড়ে আমার জন্মদিনে তিনি আমার বাড়ীর উৎসবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, একখণ্ড 'আহরণী' আমাকে দিয়েছিলেন। সেই একটি মাত্র পুস্তকের কিঞ্চিৎ আলোচনায় আমি কবির কাব্য প্রসঙ্গ নিবেদন করব এই প্রবন্ধে।

তাঁর শেষ জন্মদিনে গিয়েছিলাম। তখন অসুস্থ হ'লেও সভার মধ্যমণি তিনিই হয়েছিলেন। আবার তাঁর জন্মদিন হয়, আমরা যাই। সুযোগ্য পুত্রেরা আপ্যায়ন করেন। বেল যুঁই-এর মালায়, আলেখ্যে, পুস্তকে সব সাজানো থাকে তাঁর। কিন্তু "নন্দপুর-চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার।"

কালিদার মৃত্যুর সময়ে আমি বার্লিনে ছিলাম। ফিরে এলাম ওঁর শেষকৃত্যের দু'একদিন আগে। অন্ধকার বৃন্দাবনে দাঁড়িয়ে মনে এল—কবি কি আমাদের দেখতে পাচ্ছেন ? অসংখ্য নক্ষত্রের মধ্যে তিনি নক্ষত্র হয়ে রয়েছেন বুঝি ? নীরব নৈশব্দ্যেও চেতনাকণা থাকে তো। নইলে শেষ দিনে অসহ্য বেদনায় যখন তাঁর রোগশয্যার পাশ থেকে মুখ ফিরিয়ে চলে আসছি, তিনি মুদ্রিত চক্ষেই ক্ষীণ কণ্ঠে বলতে পারলেন কি করে, "বাণী, গেলি ?"

সেই স্বর আমি আর কোথাও শুনতে পাব না। অনেক শব্দ শুনব, মেঘের গুরুগর্জন শুনব, ঝর্ণার শব্দ শুনব রাত্রির কুলায়ে পাখীর ডানা ঝাড়ার শব্দ শুনব, সন্ধ্যার কুলায়ে সেই কণ্ঠ আর শুনব না।

কিন্তু তাঁর কবিতা তো আছে।

—প্রসঙ্গ—

বাংলাসাহিত্যে কালিদাস রায়ের পরিচয় আলোচনা করিতে গেলে মনে হইবে কবিমানস সম্পন্ন যে কয়েকটি প্রকৃত কবি আছেন কবিশেখর তাঁহাদের গোত্রীয়। তিনি একটি সম্পূর্ণ কবি যুগের ধারক ও বাহক।

ভূমিকায় কবি নিজের সম্পর্কে কিছু বলিয়াছেন। তাহা হইতে ও বইখানি পাঠ করিয়া নানা মূল্যবান তথ্যে উপনীত হই। বৃন্দাবনলীলা ও পল্লীকবিতা রচনা করিয়া কবি বৈষ্ণব কবি ও পল্লীকবি খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। কিন্তু, সাধারণ বিভিন্ন লৌকিক দিকেও কবির কৃতিত্ব ও কাব্যউৎস অপরিসীম। সমাজ-জীবনকে কবি এড়াইয়া চলেন নাই। পুরাতন কথাই তাঁর ভাণ্ডারে সঞ্চয় নয়।, ক্রমবিবর্ধমান সমাজকে আশ্রয় করিয়াই কবির কাব্যসৃজন ও বক্তব্যবিষয়। 'আহরণী' পুস্তকখানির ছত্রে ছত্রে প্রচুর প্রমাণ পরিলক্ষিত হইবে।

কালিদাস রায়ের মধ্যে নানা সময়ে সাক্ষাৎ পাইয়াছি একটি প্রকৃত কবিসত্তার। তাই তিনি যেমন সহজ, আবার তেমনি সময়বিশেষে বক্র। কখনও শাদা, কখনও ধূসর। 'যে মানুষটি সহজ আপ্যায়নে অতি নিকটে ডাকিয়া লহেন, স্নেহে যাঁর বচন বচনাতীত ব্যঞ্জনা বহিয়া আনে, আবার তাঁরি মুখে তীক্ষ্ণ সমালোচকের ভাষণ হঠাৎ অস্বস্তি জাগায়। তাই কবিশেখরের সমগ্র কাব্যসংগ্রহই নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিলে চোখে পড়ে এমনি অনেক প্রকাশ। পরস্পরবিরোধী দুইটি মন। জীবনেও হয়তো তিনি কিছুটা তাহাই। তাই তাঁহার হাতে সমালোচনার গদ্যও পাওয়া যায় কবিতার ছন্দের পাশাপাশি।

কবিশেখরের কাব্য দেখা যাক—

"কেন এত প্রখর দহন
আসঙ্গ তৃষার মাঝে? শ্বাসবায়ু উষ্ণ কেন লাগে?
বিন্দু বিন্দু স্বেদজল ললাটে উরসে কেন জাগে?
শতশত চুম্বনেও নাহি ঘুচে অধরের শোষ,
রসহ্রদে ডুবিয়াও কেন নাহি লভে পরিতোষ
তৃষিত—তরুণ হৃদি?" ('পঞ্চশর')

অন্যত্র—

"কবিতা শুনিতে চায় না-ত কেউ কত লোক আসে যায়,
কাব্যরসের বদলে তাহারা গব্য রসটা চায়।
বৎসরান্তে মোটর হইতে নেমে আত্মীয় কয়—
'মেয়ে পরীক্ষা দিয়েছে এবার,
আনিয়াছি তার রোল নাম্বার,
চেষ্টা করিও—অনেকেরই সাথে তোমার ত' পরিচয়।'"

('কবির অতিথি'—)

এইরূপ মাঝে মাঝে বিরুদ্ধ প্রকৃতির দুইটি কবি-মানস আহরণীর পাতায় পাতায় অতিপ্রকট। এইখানে কালিদাস রায়ের কবিসত্তা তাঁহার দলীয় বা তাঁহার যুগের কবিসত্তার সহিত কিঞ্চিৎ বিভেদ ঘটাইয়া ভিন্নপথে বর্তমানের দিকে নামিয়া আসিয়াছে। ভাবপ্রবণ কবিমন আদর্শবাদী। বাস্তবের প্রকৃত স্বরূপ বহুক্ষেত্রে কবিকে আঘাত দেয়। কবি মানসিক প্রতিদান না পাইয়া কেন্দ্রভ্রষ্ট

হইয়া পড়েন। এমন ক্ষেত্রে, সাধারণত নৈরাশ্য ও বেদনার মধ্যেই কবিমন আশ্রয় চায়—অতীতের শরণ লয় বর্তমানকে বিস্মরণের চেষ্টায়। 'শতনরী'র কবি করুণানিধানের এমনি প্রয়াস দেখিয়াছি। কিন্তু, বর্তমানে আমরা প্রতিঘাত করিতে চাই, প্রহার সহ্য করিবার মত মনোভাব আমাদের নাই। এই প্রতিঘাতের অস্ত্র-বিদ্রূপ ও শ্লেষ হাস্যরস বা ব্যঙ্গব্যঙ্গ হইয়া উঠে। আমরা বিদ্রূপ করিয়া প্রতিঘাত করি। চোখের জলকে রূপান্তরিত করি বক্রহাস্যের তির্যক ভঙ্গিমায়। এই মনোভাব অতি স্বাভাবিক। কালিদাস রায় কখনও-বা এই মনোভাবের কবি। এখানেই তাঁহার আধুনিকত্ব। এ বিদ্রূপ তীব্র জ্বালাময় না হইলেও বক্র। অবশ্য ব্যঙ্গ বা হাস্যরস প্রথমাবধি তাঁহার কবিতায় বহুল ছিল—

বর্ষাসাথী আমার ছাতি, আজকে তুমি নাই,
যাচ্ছে ফাটি বুকের ছাতি তোমার শোকে ভাই।
ছিলে কি আর শুধুই ছাতি? তুমিই ছিলে ছড়ি,
গ্রীষ্মকালে ঘাম মুছেছি তোমায় রুমাল করি॥

(ছত্রবিয়োগে)

এই মধুর হাস্যরস তিক্ত ও কষায় হইয়া উঠে এমনি কবিতায়—

প্রশান্ত ডক্টর এবে, এটা তার কেতাবী খেতাব,
বিশ্ববিদ্যালয়ে তার দণ্ডমুণ্ড প্রচণ্ড প্রভাব।
তাহার অধীনে আমি পরীক্ষক, বলি 'স্যার, স্যার'
মাদুরে বসিয়া করি তার বাড়ী রুটিনী খাতার॥

(আজ ও কাল)

অথবা—কাদের লাগিয়া আমার বাড়ীতে পশসী আসেন কেনা?
সীতু গোয়ালার, তিতু ময়রার দোকানে মাসিক দেনা?

(কুটুম্ব-প্রশস্তি)

কবিশেখর আন্তর্ভৌম কবিত্বশক্তি বাহিরের প্রেরণায় রূপ ফলায় চমৎকার। 'কুমারসম্ভব' এর স্থানবিশেষের অনুবাদে আমরা এমনি উজ্জ্বল পংক্তি পাই:—

এলো যৌবন শৈলসুতার দন্তাধরে
হাস্যধারায় আস্য পাবে।
লোহিত কুসুম কিশলয়ে যদি হ'ত নিহিত,
হ'ত যদি মোতি প্রবালের পরে সমারোপিত,
উপমা চলিতে পারিত তাতে
উমার অরুণ অধর-লগ্ন শুভ্র মধুর হাসির সাথে॥

(উমার যৌবন)

কবিশেখরের কাব্য কতটা প্রেরণানির্ভর তাহা বোঝা যায় তাঁহার আশ্চর্য সুন্দর অনুবাদগুলি দেখিয়া। নিজের অন্তর্লীন কবিত্বের সঙ্গে মিলাইয়া তিনি নূতন কবিতা সৃষ্টি করিয়াছেন, অনুবাদ মাত্র নয়।

'আহরণী' কবিশেখরের শ্রেষ্ঠ বা প্রতিনিধি কাব্যসংগ্রহ নয়। আমার মনে হয় সংযোজনের ভার কবি স্বয়ং না লইয়া অন্য গুণগ্রাহীর উপরে দিলে বিচার যোগ্যতর হইত। সমালোচক হইলেও নিজের কবিতার সমালোচক হওয়া যায় না। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের দিকে বেশি লক্ষ্য রাখাতে বহু ক্ষেত্রে একটি মাজাঘষা পালিশ চোখে পড়ে—'পর্ণপুটে'র বন্য যৌবন যেন 'আহরণী'র কোথাও নাই। তবু হেমন্তের পরিপূর্ণদানে কবির বসন্তের ভাণ্ডারে অপচয় নিবারিত হইয়াছে। প্রকৃত কবিমনের অধিকারী কবিশেখর কালিদাস রায়। যে বাংলা এখনও প্রাচীন ঐতিহ্যে সেরা দিনগুলির উদ্দেশে নিশ্বাস ফেলে, কবিশেখর সেই বাংলার কবি। রেবাতটভূমে বেতসকুঞ্জের ব্যাকুল প্রেমাভিসার নাগরিক মনে ব্যাকুলতা আনে। নন্দপুরচন্দ্রগার বিরহ ভাবুককে কাঁদায়, চাঁদনীরাতের ফুটন্ত যৌবনের জাগরণ-ব্যথা অনেককেই বিমনা করিয়া তোলে। আর, বার বার মনে ফিরিয়া আসে ভারতবর্ষের সাতকোটি গ্রাম—শাশ্বত দেশাচার। বাংলার গ্রামগুলি দেশের প্রাণ, দেশের প্রাণস্পন্দন সেখানেই। কবির আঙুলে আঙুলে বাংলার গ্রাম কাঁদিয়া ফিরে। তাহার সুখ-দুঃখ, দিবারাত্র পংক্তিতে পংক্তিতে কথা বলিয়া যায়।

'আসন্ন পরিণয়া' বলে—

"কেমনতর হ'বে লো সই, কি জানি সেটা হ'বে,
বউটি সেজে সবার মাঝে বসতে হ'বে যবে॥"

'প্রোষিতভর্তৃকা'র দেখা পাই —

"আঙুল কাটি মনের ভুলে কুটনো কোটার কালে,
বাটনা-শিলে বাঁটতে জ্বলে চক্ষু দু'টি ঝালে॥"

'মিলনোৎকণ্ঠিতা'র উৎকণ্ঠায় আনন্দ পাই,—

"চুলগুলো সই এমন করে বাঁধিস না আজ টেনে
অমন খোঁপা বাসে না সে ভালো॥"

'পূর্বস্মৃতি'তে একাকিনী নায়িকা আক্ষেপ করে,—

"বাতাবি ফুলগোছা খোঁপায় দিতেন তিনি গুঁজে,
শয়নঘরে নিতাম সে দান নয়ন দুটি বুঁজে॥"

'কুড়ানী' জীবনের বর্ণনা দেয়,—

"ঠোঁট মুখ গাল জাড়ে জর জর পা দু'খানা ফুটি-ফাটা,
মানি না কুচল উচল নীচল মাঠের কাঁকর-কাঁটা।"

'মেছুনী'র মনস্তত্ত্বে দেখা যায়,—

"আশীর্বাদে পেট ভরে না। জোর করে লও কেড়ে,
দাম চাইতে এলে ঠাকুর ধমকে এস তেড়ে॥"

কবি সঙ্কোচিয়ে নিজের পল্লীকবি আখ্যায় গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। তাঁহাকে পল্লীকবি বলিলে তাঁহার পল্লীকবিতার সম্পূর্ণ রূপ ধরা যায় না। পুরুষকে কেন্দ্র করিয়া যে কবিতাগুলি রচিত হইয়াছে, সেগুলি এত রসোত্তীর্ণ নয়। কবি যেন বাংলার মেয়ের বুকের কথাটি কলমের মুখে আমাদের হাতে আনিয়া দিয়াছেন। এমন সহানুভূতি, এমন দৃষ্টি দিয়া হয়তো আর কেহ তাহাদের দেখে নাই।

আলোকচিত্রধর্মী কতকগুলি কবিতা। কবিশেখরের বিস্তীর্ণ ও বিচিত্র সৃষ্টিকে দুইচার কথায় যথার্থ আখ্যা দিবার প্রচেষ্টা অত্যন্ত দুঃসাহসিক। তবু মনে হয়, কবির জীবনে গভীর কোন বেদনায়

অভাব আছে। অতিশয় আনন্দের কথা, সন্দেহ নাই। বাংলা কবিতার নৈরাশ্যঘন পিচ্ছিল অন্ধকারে 'আহরণী'র কাব্যমার্গ দুর্গম নয়। ক্ষণিক বসন্তের মজলিশী সুরভিত আবহাওয়ায় কবির এই কবিতা গুচ্ছ। যেটুকু বেদনা আছে, তা-ও সহানুভূতির অশ্রুসেচনে অনায়াসে মুছিয়া যায়। যদি উচ্চাশা কোথাও বিফলিত হইয়া থাকে, কবি সান্ত্বনা পান—

"ক্ষণিক আমার মন ভুলালো, অনিত্য মোর বড়।"

মুহুর্মুহু সজাগ মন প্রেতের পদধ্বনি শোনে যৌবন-সীমান্তে। কবি আশ্রয় করেন জীবন-সন্ধ্যায় দেবতার পাদপীঠ—

"আজি এ সন্ধ্যায় হরি শোন প্রভু, কৃপা করি
আকিঞ্চনময়ী এ পূরবী—"

তা র মধ্যে যে আধুনিক প্রতিঘাত-প্রবৃত্তি দেখিয়াছি, তাহাও তীব্র নয়। কারণ

"কারো পরে আর নাই অভিযোগ, কারো প্রতি নাই রোষ"—

জীবনের চরম ব্যর্থতা যে কবির ঘটে নাই, যিনি জীবনে আনন্দ পাইয়াছেন, বিদ্রূপরসও তাঁহার ক্ষণস্থায়ী। বক্রপথে তাঁহার বিশ্লেষণী মন চলিতে চাহিয়াছে, তাই তাঁহাকে ক্বচিৎ ধূসর বলিয়াছি। কিন্তু মনের প্রসন্ন আনন্দ, পরিবেশে স্বস্তি, প্রেমে প্রতিদান, সমস্ত কিছুই সৃষ্টির আপাতমধুর রূপ লইয়া তন্ময়। গভীর বেদনা ও পটভূমিকার জীবন-দর্শন যেন কবির প্রতিপাদ্য নয়। তিনি ফুল লইয়াই তৃপ্ত আছেন। বীজ কেমন করিয়া অঙ্কুর দিল, মাটি কেমন করিয়া জলসেচনে পঙ্কিল হইয়া উঠিল, সত্যই কি আমাদের কবিশেখর তাহা লইয়া বিব্রত হন? সত্য তাঁহার কাছে কাম্য—শৈশবের সহজ বিশ্বাসরূপে ('সংশয়বাদ'—আহরণী)। মুক্তি তিনি চান না। কল্পলোকই তাঁহার ঈপ্সিত বিহারক্ষেত্র। তাই তিনি 'ব্রহ্ম' চান না, চান 'প্রাণের ঠাকুর'কে। তাই তাঁহার গৃহ শুষ্ক ইমারত নয়—'সন্ধ্যার কুলায়'। আর সব কিছুর পশ্চাতে তাঁহার প্রিয়াই তাঁহার পরিণীতা। কবিপ্রিয়ার কথা না বলিলে কবিশেখরের কাব্যবিচার অসম্পূর্ণ থাকে নিঃসন্দেহে।

বাংলার বহু তারকাখচিত কাব্যগগনে এই জ্যোতিষ্ক তাঁহার প্রেমের উৎস খুঁজিয়া পাইয়াছেন শঙ্খ সিন্দুর-শোভিতা কল্যাণী গৃহলক্ষ্মীর মধ্যে। তাঁহার প্রতিটি প্রেমের কবিতার উদ্দেশ্য তাঁহার গৃহে অচল প্রেমে বিরাজ করিতেছেন। নৈরাশ-যন্ত্রণায় ব্যর্থ প্রেমিক হয়তো উৎকৃষ্টতর প্রেমের কবিতা লিখিতেন, কিন্তু এমন প্রশান্তির অধিকার হারাইতেন। প্রেমকে পরিণয়ের মধ্যে পাইবার ভাগ্য কবিজনের নিশ্চয় দুর্লভ। কালিদাস রায় সেই দুর্লভ ভাগ্য অর্জন করিয়াছেন। তাই, তাঁহার ব্যঙ্গ ক্ষণস্থায়ী, দুর্বল প্রতিঘাত, তাই মাধুরীর উপাসনা তাঁহার ব্রত। যা অপূর্ণতা, যা অতৃপ্তি আছে, কোনটাই গভীরে নাই। বিশ্বের চিত্র আঁকা তাঁর কবিধর্ম—তিনি পরিতৃপ্তির চিত্রকর। রূপে রসে গন্ধে বিহ্বলা যে ধরণী, তার উপাসক কি বিগত যৌবনের শোকে ম্রিয়মান থাকেন? যেখানে মৃত্যু আসে, সেখানেই তো চাঁদ উঠে, ফুল ফোটে। যে প্রিয়ার অধরের রাগ মলিন হইয়া যায়, তিনি তো তখনও প্রেয়সী থাকেন। বসন্তের বন্যতা বিদায় লয় হেমন্তের পরিতৃপ্তিতে। কবিশেখর মানবজীবনের সেই রসভারাতুর, শান্ত হেমন্তের কবি।

"বসন্ত গিয়াছে বলি' তাও কেন কবির নিষ্ফল
বেলাশেষে হেলাভরে?" (হেমন্তে)

কবিশেখরের ব্যঙ্গ কবিতা

ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য

সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ করুণরসকে হাস্যরসের বিরোধী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অথচ করুণাই এক হিসাবে হাস্যরসের প্রাণ। তাঁহারা বলেন বাক্য, বেশ এবং ব্যবহারের বৈকৃতিই হাস্যরসোৎপত্তির মূল উপায়। এ কথাটা মোটামুটি মানিয়া লইলেও করুণ রসকে হাস্যরসের বিরোধী বলিয়া স্বীকার করা কঠিন। কারণ, বাক্য বেশ বা ব্যবহারের যে বিকৃতি—যে বিকৃতি হাস্যোদ্ভবের হেতু—তাহা আমাদের মনে বিশুদ্ধ আনন্দ সঞ্চার করিয়া আমাদের মুখে হাসি ফুটায় না। বস্তুত তাহা আমাদের অন্তঃকরণে এক প্রকার বেদনার সঞ্চার করে এবং সেই বেদনার ফলেই আমরা হাসি। বেদনার ফলে আমরা হাসি—এই কথা শুনিয়া পাঠকের হাসি আসিতে পারে। তাহারও কারণ ঐ বেদনা। যে ধারণায় আমরা অভ্যস্ত তাহার বিপরীত কথা শুনিলে মন পীড়িত হয়। আমরা জানি আনন্দেই লোকে হাসে এবং বেদনায় কাঁদে, অন্তত দুঃখ পায়। কিন্তু যদি যুক্তির দ্বারা বুঝিতে পারি বেদনা যেমন কাঁদাইতে পারে তেমনি তাহার হাসাইবার শক্তি আছে, তাহা হইলে আমাদের পূর্বতন ধারণা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া যাইবে এবং এই আপাতবিরোধী মন্তব্য হাস্যোদ্রেকের কারণ হইবে না।

হাস্যরসের হাসি ক্রন্দনেরই নামান্তর মাত্র। যে পীড়ার মাত্রা অধিক হইলে কাঁদায় তাহাই অল্পমাত্রায় প্রযুক্ত হইলে হাসায়। সর্বাঙ্গ কালো পোশাকে আবৃত করিয়া মুখে একটা বীভৎস মুখোস পরিয়া যদি আপনার কোন বন্ধু আপনার সম্মুখে উপস্থিত হন তাহা হইলে বন্ধুর চাপল্য আপনার হাস্যোদ্রেক করিবে। কিন্তু গভীর রাত্রে একাকী অন্ধকার পথে যাইতে যাইতে যদি সম্মুখে হঠাৎ এইরূপ একটা দৃশ্য চোখে পড়ে তাহা হইলে ভয়ে মূর্ছা যাওয়াও বিচিত্র নয়। উভয়তই মন পীড়া পায়। সে পীড়ার মাত্রা একক্ষেত্রে কম, অন্য ক্ষেত্রে বেশী।

সাহিত্যিক হাস্যরসকে এইভাবেই বিচার করিতে হইবে। বাঙ্গলা সাহিত্যে হাস্যরসের পরিধি যতটা সংকীর্ণ বলিয়া বাঙ্গালীর ধারণা উহা ততটা সংকীর্ণ নয়। প্রাচীন কাল হইতে অধুনাতন কাল পর্যন্ত বহু লেখকের রচনায় বাঙ্গলা সাহিত্য পুষ্ট হইয়াছে। তাঁহাদের অনেকের লেখায় উচ্চস্তরের হাস্যরস দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক যুগের সাহিত্যে তো কথাই নাই প্রাচীন সাহিত্যেও বিশুদ্ধ রসিকতার যথেষ্ট পরিচয় পাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের কথাই ধরা যাক। তাঁহার দুই ভাঁড়ু দত্তের চরিত্র আধুনিক যুগের মানদণ্ডেও বিচারসহ।

বর্তমান যুগে যাঁহারা হাস্যরস রচনায় বাঙ্গলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়, পরশুরাম, রবীন্দ্রনাথ মৈত্র,

সুকুমার রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতি প্রতিভাশালী লেখকের নাম শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। একান্তভাবে হাস্যরসাত্মক রচনা সকলে লেখেন না। কিন্তু যেসব সাহিত্যিক গল্পে উপন্যাসে নাটকে এমনকি প্রবন্ধের মধ্যেও মনোজ্ঞ হাস্যরস পরিবেশন করিয়াছেন তাঁহাদের সংখ্যাই কি কম? শরৎচন্দ্রের রচনার প্রতি ছত্রে যে হাস্যোজ্জ্বল হাস্যরস দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই তাঁহার জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ বলিয়া আমি মনে করি।

হাস্যরসের গবেষণা বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য নাই। হাস্যরস রচনায় যেসব লেখক কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন তাঁহাদের প্রতিভা অথবা তাঁহাদের সকলের রচনার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করিবার জন্যও এ প্রবন্ধের অবতারণা করি নাই। বর্তমান প্রবন্ধে বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠকবি কবিশেখর কালিদাস রায়ের হাস্যরসাত্মক কবিতা সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

কালিদাস রায় একাধারে প্রবন্ধলেখক সমালোচক, বৈয়াকরণ এবং সাহিত্য-ঐতিহাসিক। কিন্তু বাঙ্গলাদেশ অর্থাৎ বাঙ্গলার সাধারণ পাঠক সমাজের কাছে তিনি প্রধানত কবি বলিয়াই পরিচিত। তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিধি যতই বিস্তৃত এবং গভীরতা যতই দূরগামী হোক, কেহই তাঁহাকে শাস্ত্রী বলিয়া অকুণ্ঠ সম্ভ্রম করিবে না। সকলেই কবিশেখর বলিয়া সাদর সম্মান করিবে। বহুপত্নীক রাজার পাটরাণী একজনই থাকেন। অথচ আর সকল রাণীই যে পাটরাণীর অপেক্ষা রূপেগুণে নিরেস এমন নয়।

কিন্তু কবি বলিয়াও যে সম্মান সমাদর তাঁহার প্রাপ্য তাহারও সবটুকু তিনি পাইয়াছেন কিনা তাহা অবশ্যই বিচার করিতে হইবে। আমার মনে হয় তাঁহার কবিপ্রতিভার একটা দিকই আমাদের চোখে পড়িয়াছে, আর একটা দিকে আমরা যথাযোগ্য দৃষ্টি দিই নাই। তাঁহার 'পর্ণপুট', 'বল্লরী', 'ব্রজবেণু' আমাদের যত পরিচিত, তাঁহার হাসির কবিতা ততটা পরিচিত বলিয়া মনে হয় না। কালিদাস রায়ের হাসির কবিতাগুলি যে মর্যাদা পাইবার অধিকারী আমার মনে হয় সে মর্যাদা তাহারা পায় নাই।

তাঁহার কবিতার মধ্যে, বিশেষত ব্যঙ্গকবিতার মধ্যে অনেক স্থলেই একটু জ্বালা আছে। যে জ্বালা তিনি জীবনের অভিজ্ঞতায় নিজে লাভ করিয়াছেন সাহিত্যের মধ্য দিয়া তাহাকে সর্বত্র সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন—পঞ্চশরকে ভস্ম করিয়া শিব যেমন তাহাকে বিশ্বময় ছড়াইয়া দিয়াছিলেন। "যাহা কিছু ভুয়ো, ভাঁওতা, মেকি ও ভণ্ডামি এই রচনাগুলির অভিযান তাহারই বিরুদ্ধে।"

বাঙ্গলা ভাষার হালচাল দেখিয়া কবি যে ক্ষুব্ধ হইয়াছেন, সেই ক্ষোভ প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহার 'পাগলা নাচে' কবিতায়। যদি হাতে আইন থাকিত তাহা হইলে যাহাদের পাগলাগারদে পুরিয়া খুশি হইতেন কবিতায় তাহাদেরই একহাত লইয়াছেন :

> পাগলা নাচে তাধেই তাধেই আগ লারে তোর বাংলা ভাষা,
> আর না বাঁচে তলিয়ে গেল তোদের গরব তোদের আশা।
> কাব্যে নাচে, নাট্যে নাচে গল্পে নাচে, পাঠ্যে নাচে
> নটরাজের নৃত্য খাসা।।

'সুখবর' কবিতায় এক শ্রেণীর সাহিত্যিকের প্রতি ইঙ্গিত আছে :

শিক্ষিতেরা লিখছিল সব কেবল দেশের চর্মকথা,
খাঁটি জিনিস এরাই দেবে, ফুটবে দেশের মর্মব্যথা।
তোল্ পিঠে তোল্ খোল পাখোয়াজ, বঙ্গবাণীর মণ্ডপে আজ
বাজবে মাদল চলবে কেবল রায়বেঁশে নাচ সঙ্ তামাশা ॥

অত্যাধুনিক সাহিত্যের বস্তুতান্ত্রিকতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া কবি বিদ্রূপ করিয়াছেন :

হাঁড়ির খবর নাড়ীর খবর বাদ দিয়ে কি সাহিত্য হয় ?
সাহিত্যিক যে দেশের সেবক কাজটা তাহার দায়িত্বময়।
দেখ সারা দেশটা খুঁজে ভরা বমন ঘায়ের পুঁজে,
ম্যালেরিয়া যক্ষ্মাকাশে বাদ দিলে কি চলে রে ভাই ॥

মলাট পড়িয়া যাঁহারা সমালোচনা করেন, দুর্ভাগ্যক্রমে এরূপ সমালোচকের অসদ্ভাব নাই, তাঁহাদের প্রতি কবির কটাক্ষ :

বইটা পড়ে লাগল কেমন জানতে তুমি চেয়েছিলে,
ভূমিকাতে যা লিখেছে তার সাথে মোর মতটি মিলে।
কি বলিলে ? ভূমিকা নাই ? ওঃ তা হবে। সেই কথাটাই
লিখত যদি ভূমিকা কেউ নিশ্চয়ইত লিখত ওরাই ॥

পুস্তক সমালোচকের উপর কবির ক্রোধটা কিছু বেশী। এই একই বিষয় অবলম্বনে কবি একাধিক কবিতা লিখিয়াছেন।

সাহিত্য প্রসঙ্গ ছাড়াও যে সব কবিতা আছে তাহাদের মধ্যে 'মুরুব্বি,' 'হিংসার অপবাদ,' 'কার্পণ্য', 'ব্যর্থ হিংসা,' 'মিথ্যা অপবাদ', 'নিজের কথা', 'মাতৃভক্ত,' 'দাতা,' 'আদর্শ লোকবিচার'— এগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'আদর্শ লোকবিচার' সাহিত্য সমালোচনারই রকমফের :

রমেশ রায়ের চাটগাঁ বাড়ী ? তবে ত বদ হতেই হবে।
জয় ভাদুড়ী হাড়-বজ্জাৎ বারেন্দ্র হয় ভদ্র কবে ?
গুপ্ত মাখন বদ্দি যখন
কথ্খনো সে নয় কো সুজন।
বাঙ্গাল নাকি উমেশ চাকী ? লোক তো সোজা নরক তবে !

যে অসাধু সে যখন সাধুত্বের অহঙ্কার করে, যে মূর্খ সে যখন পাণ্ডিত্য দেখাইতে চায়, যে কৃপণ সে যখন দানের মাহাত্ম্য ঘোষণা করে তখন সে পরিহাসের পাত্র হয়। কবির লেখায় এইরূপ ভণ্ডামির প্রতি বিদ্রূপ অনেক স্থলেই খুব তীব্ররূপে প্রকাশ পাইয়াছে। 'নিজের কথা' হইতে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করি :

নিজের কথা বলাও করে বলাও যেন একটা দোষ,
আপন কথা একটি দিনও বলেছে এই নন্দ ঘোষ ?
এই যে আমার ছোট ছেলে
এম-এ, ল-য়ে বৃত্তি পেলে,
বলিছি কি কন্যা নিয়ে সাধছে হাকিম চন্দ্র বোস ?

বিদ্রূপ মাত্রেরই মূলে থাকে একটা আঘাত দিবার চেষ্টা। কার্যত ইহা আঘাতের প্রত্যাঘাত। যে ব্যক্তি স্বীয় কর্মের দ্বারা কবির মনে আঘাত দিয়াছে কবি তাহার প্রতিই বিদ্রূপের বাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু বাণ লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিয়াছে কিনা বলা কঠিন। যে বাণ একজনকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করা যায় তাহা যেমন সহজে লক্ষ্যভেদ করে, বহুকে লক্ষ্য করিলে তত সহজে করে না। কারণ লক্ষ্যটা তখন অনেকটা অলক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়। কবির বই না পড়িয়া যদি কোনো সমালোচক সমালোচনা লিখিয়া থাকেন কবি তো তাঁহার নাম ধরিয়া গালাগালি দিতে পারেন না, অন্তত দিলে তাহা সাহিত্য হইত না। ব্যক্তির প্রতি যে বিদ্বেষ তাহা এখানে ব্যক্তিকে অতিক্রম করিয়া শ্রেণীকে স্পর্শ করিয়াছে। তাই সাহিত্যে ইহা দুঃসহ হয় নাই।

আক্রমণ যত ব্যাপক হয় হাস্যরস ততই উদার এবং উপভোগ্য হইয়া উঠে, দাহ যত কমে হাস্যরসের মাধুর্য ততই বৃদ্ধি পায়। কালিদাসবাবুর ব্যঙ্গ কবিতাগুলিই তাহার দৃষ্টান্তস্থল। রঙ্গ ও ব্যঙ্গ কবিতায় পরিপূর্ণ "রসকদম্ব" ও "দন্তরুচি কৌমুদী" গ্রন্থদ্বয়খানি যাঁহারা পড়েন নাই তাঁহারা কালিদাসবাবুর আংশিক পরিচয় মাত্র পাইয়াছেন।

কবিশেখর ও বাঙালীর ঐতিহ্য

শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য

অত্যন্ত কাছের থেকে দেখেছি কবিশেখরকে। উপলব্ধি করেছি তাঁর কবি-অনুভবকে, কবি-মানসকে। সুদূরের অনির্দেশ্যে অথবা রহস্যে ঢাকা জগৎ ও জীবনের কবি ছিলেন না তিনি। ভালোবেসে ছিলেন তিনি এই নিত্য-নৈমিত্তিক জীবনকে। এই একান্ত জানা-চেনা জগৎকে। তাঁর দেশাত্মবোধের রূপও ছিল অতি স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন। ভারতবাসী তিনি মনে প্রাণে। প্রাচীন ভারতের রূপ ও মহিমাও ব্যক্ত হয়েছে তাঁর লেখনীমুখে নানাছন্দে বন্ধে ও গানে।

কিন্তু কবিশেখর ছিলেন প্রথমে বাঙালী, পরে ভারতবাসী। বাংলা ও বাঙালীর কথা, বাংলা ও বাঙালীর ব্যথা ও গান, কাব্যজগতে তাঁর ভারতকথা ও ভারতসংগীতের মুখবন্ধ ছিল। বাঙালীর আশা, বাঙালীর ভাষা, বাঙালীর গান, বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর সাধ, বাঙালীর সাধনা তাঁর নিত্য ও নৈমিত্তিক জীবনের জপমন্ত্র ছিল। বাঙালীর ধ্যান ও জ্ঞান, ভাবনা ও চেতনার উৎস ক্ষেত্রটি নিঃশেষেই তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁর এই অভ্রান্ত আবিষ্কারের হাতিয়ার ছিল তাঁর বাঙালী-প্রেম ও বাঙালীপ্রীতি। তিনি সগর্বে বলতে পেরেছেন আমি বাঙালীর কবি।

একটি বিশেষ কথা, কবিশেখর ছিলেন শিক্ষক-কবি, আচার্য-কবি। তাঁর শিক্ষক সত্তা ও কবি-সত্তা মোটের উপর একই সত্তার দ্বিবিধ অভিব্যক্তি মাত্র। শিক্ষক হিসাবে ছাত্রদের সর্বাত্মক জীবন-প্রস্তুতিই ছিল তাঁর ব্রত ও সাধনা। পরীক্ষা বৈতরণী উত্তরণের কড়ি যোগানোর মধ্যে আচার্য কালিদাস রায়ের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ ছিল না। বাঙালী ছাত্রসমাজকে ষোল আনা বাঙালী তথা সার্থক ভারতবাসী রূপে গড়ে তোলাই ছিল তাঁর স্বপ্ন ও আদর্শ। এই আদর্শের রূপায়ণে শিক্ষক কালিদাস ও কবি কালিদাস ছিলেন একে অপরের দোসর। কবিতাসৃষ্টি বা ভাব-নির্মাণ তাঁর কাছে প্রত্যক্ষ জীবন বা চরিত্র নিরপেক্ষ বস্তু ছিল না। বাংলা ও বাঙালীর যে জীবন তাঁর ধ্যানে বৃত ছিল, কাব্যে যাকে তিনি মূর্তি দিয়েছিলেন, শিক্ষক ও আচার্য হিসাবে সেই জীবনকে তিনি ছাত্রসমাজের মধ্যে সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন। ভাষান্তরে বলা যায়, তিনি ছিলেন একাধারে দ্রষ্টা ও স্রষ্টা। দৃষ্টিতে বা দর্শনে যে সত্য ও তত্ত্বকে পূজা করেছিলেন তিনি প্রত্যক্ষ জীবনে, বাস্তব কর্মময় জীবনে তাকেই সাধ্যমত রূপায়িত করেছিলেন। কবিশেখরের কবিসত্তা এইখানেই স্বপ্নবিলাসী, আদর্শসর্বস্ব কবি প্রকৃতি থেকে স্বতন্ত্র।

এখন তাঁর কবি প্রকৃতির এই বাঙালীয়ানা ও বঙ্গীয় ভাবের চরিত্রটিকে কয়েকটি কবিতার সূত্রে একটু বিশ্লেষণে সচেষ্ট হচ্ছি। 'বাংলাদেশ' কবিতায় কবি বিজাতীয় শিক্ষা-দীক্ষায় বিব্রত বাঙালীকে তার জাতীয় জীবনের অধ্যাত্ম জীবনের মূল মন্ত্রটি স্মরণ করাতে চেয়েছেন জীবন-দরদী কবি ও

আচার্য হিসাবে। বাংলা ও ভারতবর্ষ ত্যাগ, বৈরাগ্য ও পারমার্থিকতার দেশ। ঐহিক জগৎ ও জীবনের ভোগ ও বিলাসব্যসনে এদেশের মানুষ চিরদিনই উদাসীন। ধর্ম ও জীবনের এই আদর্শের মধ্যেই আবহমানকাল বাংলা ও ভারত তার নাড়ির পরিচয় খুঁজে পেয়েছে। সব দেশই তার এই স্বকীয় স্বতন্ত্র জীবনচেতনা ও সৌন্দর্যভাবনার মধ্যেই আত্মদর্শন ও আত্মোপলব্ধি করে থাকে। যেদিন আত্মপরিচয়ের এই মৌলনীতি ও আদর্শ হারিয়ে ফেলে দেশ বা জাতি, সেদিন সে টিঁকে থাকে বটে, কিন্তু বেঁচে থাকার অধিকার হারিয়ে ফেলে। ভারতবর্ষের নবজাগরণের উৎসক্ষেত্র এই বাংলা দেশ। কিন্তু ইউরোপীয় নবজাগরণের ভাব ও সুরের বিজাতীয়তায় বাঙালী জাতি হারিয়েছিল তার জীবন-মন্ত্র ও প্রাণ-তন্ত্র। বাঙ্গালীর দরদী ও মরমী কবি কবিশেখর তাই আলোচ্য কবিতায় জাতিকে শুনিয়েছেন পথভিখারীর একতারার মাধ্যমে—'ঘরকরনা মায়ার খেলা', সাঁঝের খেয়াঘাটের সূত্রে শুনিয়েছেন 'ওপারে যাবি কে কে?' এপারের কর্তব্যসাধনের অমোঘ মন্ত্র স্বরূপ এই ওপার যাওয়ার কথাটি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন কবি আবার—

'দু'চোখ ঢাকা বলদ দেখি কলুর বাড়ি।
তার সাথে মোর তফাৎ কোথা ধরতে নারি॥

প্রসাদী সংগীতের বিশিষ্ট সুরে ও ঢঙে কবি অজ্ঞ, মূর্খ ও মূঢ় জনমানবের চলা, বলা ও ভাবার ভুলচুকগুলোর দিকে ইঙ্গিত সঙ্কেত করেছেন। বাউলসাধকের অমরসংগীত—'মনের মানুষ পাব কোথায়?' এ গানও জাতির আত্মসংবিৎ লাভের গুহ্যমন্ত্ররূপেই পরিবেশন করেছেন কবি।

বাংলা ও বাঙালীর ধর্ম ও সংস্কৃতির মর্মস্থলটি নিবিড়ভাবে স্পর্শ করেছিলেন কবি। অধর্ম ও অপসংস্কৃতির পঙ্কিল পরিবেশে পড়ে বাঙালী জীবনের অবক্ষয় ও অপচয়ে মর্মাহত কবি একদিকে যেমন 'বাংলাদেশ' কবিতায় জাতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্রীয় ভাবটির স্মরণে ও মননে উদ্বুদ্ধ করেছেন জাতিকে, অন্যদিকে 'বাংলার দেবতা' কবিতায় সেদিনের দেবার্চনা ও দেবারাধনার হৃদ্য ও অন্তরঙ্গ রূপটির একটি অনবদ্য আলেখ্য রচনা করেছেন। বাংলার গ্রাম্য ও লোকায়ত জীবনের দেবদেবীর সঙ্গে অশিক্ষিত, অদীক্ষিত মানুষের ছিল কত না আত্মীয়তা ও একাত্মতা। গ্রাম্য দেবদেবীর পূজায় ভক্ত ও ভগবান কতখানি অব্যবহিত ছিল! 'যার নাম ভালোবাসা তার নাম পূজা'—অভীষ্টের পূজার এ আদর্শ সেদিন জীবনে সত্যিই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 'দেবতারে মোরা আত্মীয় জানি আকাশে প্রদীপ জ্বালি,' এ সত্য শুধু কাব্যের নয়, যথার্থ জীবনের সত্য হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু এই অন্তঃরহস্য আজ বাঙালী হারিয়ে ফেলেছে। এ যুগের দেবপূজায় তাই এত আড়ম্বর ও সমারোহ, এত সংশয় ও সন্তর্পণতা। ভক্ত ও ভগবানের ব্যবধানই এনেছে এমন আড়ষ্টতা ও কৃত্রিমতা। একালের মঠ, মন্দির ও মসজিদের অন্তঃপুরে প্রবেশের পথে কত না বাধা ও বিপত্তি—অর্থ ও অনর্থ! কিন্তু সেকালের দেবদর্শনে স্পর্শনে হালও লাগতো না, হাতিয়ারেরও প্রয়োজন ছিল না বিশেষ।

তোমার কাছে যেতে হ'লে পাণ্ডা-প্রহরীকে
সাধতে না হয়, ঢুকতে না হয় কায়দা-কানুন শিখে॥

জীবন থেকে, অন্তঃপুর থেকে দেবতাকে নির্বাসিত করেই আজকের পূজা-অর্চনায় এমন

সাবধানতা ও হুঁসিয়ারী। আলোচ্য কবিতায় কবি জাতির সেদিনের শক্তি ও ভক্তির কথা, প্রত্যয় প্রীতি ও প্রার্থনার কথা চিত্তস্পর্শী ভাষায় ও ভঙ্গিমায় রূপায়িত করেছেন।

এযুগের দেবপূজায় ও দেব-আরাধনায় রূপ আছে, ভাব নেই। মন্ত্র আছে, মন নেই। আড়ম্বর আছে, আসক্তি নেই। বাঙালী জাতি এই ভক্তিবিহীন পূজায় ও মতিহীন মন্ত্রে শক্তি অর্জনের পরিবর্তে শক্তি হারাতেই বসেছে। বাংলা ও বাঙালীর মরমী কবি, এদেশের ঐতিহ্য-প্রেমিক কবি তাই ভালোবেসে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন জাতির দায় ও দায়িত্বকে।

'বাঙালীর সাধ' কবিতাটিও কবির দৃষ্টি ও দর্শনের এই বিশিষ্ট প্রকৃতির অন্যতম উজ্জ্বল সাক্ষ্য। স্বল্পে-সন্তুষ্টি ব্যবহারিক বা সাংসারিক জীবনে বাঙালী চরিত্রের উল্লেখ্য বিশিষ্টতা। হাতের নাগালের মধ্যে অনন্ত সুখসম্পদ পেয়েও নির্বিকার চিত্তে 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ—এই আদর্শের অনুসরণ করা বাংলার গণচরিত্রেরও স্বধর্ম বটে।—

'তুষ্ট আমি তোর 'পর যাহা ইচ্ছা মাগ বর,

যা চাহিবি তাই তোর হ'বে।'—এমনভাবে দেবী অন্নদা ঈশ্বরী পাটনীকে আশ্বাস দিলেও নির্লোভ ও নির্বিকার পাটনী ধন-দৌলত, রাজত্ব, প্রভুত্ব কিছুই না চেয়ে চাইল—'আমার সন্তান যেন চিরদিন থাকে দুধে ভাতে।' আবার শতায়ু কি স্বর্গবাস কিংবা মোক্ষ—এসব। তার অনভিপ্রেত বস্তু। সে চায়, সন্তানকে দুধে ভাতে মানুষ করে সংসারজীবনের নির্বিঘ্ন ও নির্বিকার শান্তি ও স্বস্তি। শিক্ষাদীক্ষা প্রাপ্ত বাঙালী নয়, পাটনীর মত এমন অশিক্ষিত বাঙালীরও, অদীক্ষিত বাঙালীরও জীবনদৃষ্টি ও দর্শনের এমন স্বাভাবিক ত্যাগপূত মহিমা সভ্যতার আধুনিক চরিত্রের দৃষ্টিতে বেশ বিস্ময়কর ও চমৎকারপ্রদ। সহজ বাঙালীর স্বভাবে এ-তত্ত্ব যেন নিত্যসিদ্ধ—'সুখ প্রতিদিনের সামগ্রী, আনন্দ প্রত্যহের অতীত। সুখ, কিছু পাছে হারায় বলিয়া ভীত। আনন্দ যথাসর্বস্ব বিতরণ করিয়া পরিতৃপ্ত। এইজন্য সুখের পক্ষে রিক্ততা দারিদ্র্য, আনন্দের পক্ষে দারিদ্র্যই ঐশ্বর্য।'

কবি বাঙালী জীবনের এই স্বভাবসিদ্ধ সাধ ও অভিপ্রায়কে অবিনশ্বর রূপ দিয়েছেন 'আলেখ্য' কবিতায়। জীবনে জীবন যোগ করতে না পারলে, হৃৎস্পন্দনকে নিবিড়ভাবে অনুভব করতে না পারলে মনের গুহ্যতম ও পবিত্রতম ভাবকে এমন ভাষাসম রূপদান সম্ভব হয় না। মধ্যযুগের রাজসভার কবির আলেখ্য অবলম্বনে কবিশেখর বাংলার গণসমাজের ভাব ও ভাবনার একখানি ভাষাময় তৈলচিত্র অঙ্কিত করেছেন।

বর্তমান যুগের সভ্যতার রূপ—মৈত্রেয়ীরূপের পরিবর্তে একান্তই কাত্যায়নী রূপ। এই রূপের মোহে জাতি আজ উদ্‌ভ্রান্ত ও বিভ্রান্ত। জাগতিক ঐশ্বর্যের মরীচিকার পিছনে ছুটে চলে জাতি যেন সম্পূর্ণই আত্মভ্রষ্ট। মানুষের ফুলে ওঠা পকেটের তলায় মানুষের চুপসে যাওয়া হৃদয় পড়েছে চাপা, সর্বভুক্ পেটুকতার এমন বিস্তৃত আয়োজন পৃথিবীর ইতিহাসে আর কোনো দিন এমন কুৎসিত আকারে দেখা দেয়নি।

জাতীয় জীবনের এই উদ্‌ভ্রান্তির অশুভলগ্নে কবির এই 'বাঙালীর সাধ' কবিতাটির তত্ত্ব ও সত্য যেন ধন্বন্তরির মত। আপনাকে খুঁজে পেতে হলে, জাতীয় জীবনের স্বরূপ ও স্বধর্মকে ফিরে

পেতে গেলে কবির এই জীবনসংকেত আমাদের অমোঘ পাথেয়। বাংলার জন ও গণমানসে, বাঙালী মনের মণি-কোঠায় কবিশেখরের স্থান তাই চির-ভাস্বর।

ঈশ্বরী পাটনীর মধ্যে যেমন বাঙালীর সাধ ও স্বপ্নের রূপ পূর্তি পেয়েছে, বাংলার পরা-পিতামহীর চরিত্রে তেমন বাঙালী মায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সাধ-আহ্লাদের ভাবমূর্তিটি চির-রূপায়িত। কত দুঃখ কষ্টে, কত না ত্যাগ, তিতিক্ষা ও সহিষ্ণুতা দিয়ে আদরের দুলালকে এঁদের মত পরা-পিতামহী লালনপালন করেছেন। কিন্তু সেই প্রাণপ্রতিম সন্তানের জন্য চাহিদা শুধু—'হাঁটু ঢাকি বস্ত্র দিও পেট ভরি ভাত।' অলোকসামান্য এই নির্লোভতা। কী অচিন্তনীয় এই চিত্তভূমি! কালক্রমে আমরা ভুলে গেছি এই নারীচরিত্রের দিব্য ভাব ও ভাবনাকে স্নেহ-ভালোবাসা ও সেবা-শুশ্রূষার আদর্শে যাঁরা স্বর্গের সৌন্দর্য-সুষমা ও গৌরব-ঐশ্বর্যকে তিরস্কৃত করেছেন, নির্লোভন ও ও নির্বিকারতার আদর্শেও তাঁরা কতখানি অনুপম চরিত্র। ঘরের মধ্যেকার এইসব নারীরূপিনী দেবীর কথা আজ চেষ্টা করেও স্মরণে আনা দুঃসাধ্য। নরদেহে তাঁরা ঈশ্বরীয় চরিত্রের বিলাস-বৈভবের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে দিয়েছেন জাতীয় জীবনের পুনঃ প্রতিষ্ঠায়। এ জীবনের পূর্ণ উপলব্ধিতে এইসব 'পরা-পিতামহী'ই আমাদের অনুধ্যানের চরিত্র। আজকের সভ্যতা অনেকখানি স্বতন্ত্র। এ যুগের সুখ-স্বস্তির ধ্যান ও স্বপ্ন রূপান্তরিত, একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু এ যুগ সে যুগ নির্বিশেষে বস্তু-নিরপেক্ষ বা ভাবাত্মক জীবনের যে আদর্শ এ জাতীয় কবিতার মর্মকথা, মনে হয় সব কালের বাঙালীর পক্ষেই তা অনুধ্যেয়। এই সূত্রে কবিশেখর কবি হিসাবে নিত্যকালের বাংলা ও বাঙালীর ভাবজীবনের কবি, অন্তর্জীবনেব রূপকার ও ভাস্যকার, এ কথা বিসংবাদের অতীত।

বাংলায় মনোময় ও ভাবময় জীবনেব এমন সুস্থ-সংস্কৃত এবং পূত ও তৃপ্ত জীবনের পরিচয়ের পাশাপাশি এদেশের সেকালের শিল্প ও বাণিজ্যগত জীবনের রূপালি ও বর্ণাঢ্য পরিচয়টিও কবি রেখেছেন 'সপ্তডিঙার বঙ্গদেশ' কবিতায়। এশিয়াময় বাংলা ও বাঙালীর ব্যাপক পরিচয় ও প্রতিষ্ঠা ছিল সেদিন। সাগর মহাসাগরের ঝড়-তুফান ও ঝঞ্ঝা-বাত্যা উপেক্ষা অগ্রাহ্য করে দেশে দেশে শিল্প ও বাণিজ্যগত জীবনকে ছড়িয়ে দিয়েছিল সেদিন বাঙালী ধনপতি, শ্রীমন্ত ও চাঁদ সদাগরেরা। সেদিনের অঋণী ও অপ্রবাসী বাঙালী জীবনের স্বচ্ছতা, সুস্থতা ও অবসরবহুলতাও ছিল অশেষ। বিষয়গত জীবনের সামান্য ও সাধারণ পরিচয়ের অন্তরালে আশয়গত জীবনের কতই না ছিল বৈভব ও বিভূতি। বাহ্যত জাতি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র না হলেও আভ্যন্তরীণ জীবনে তার ছিল না তেমন গ্লানি বা লাঞ্ছনা। স্বাধীনতা-উত্তর কালের জাতীয়জীবনে জীবন-প্রেমিক ও জীবন-জিজ্ঞাসু মানুষ মাত্রেরই মনের কথাটি কবি যেন ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত করেছেন :

> 'ফিরে যদি পাই তাই শুধু চাই, চাই না পৌর আড়ম্বর,
> ফিরে চাই সেই দুধের সর ॥'

কবিশেখর এখানে বাঙালীর হৃৎপিণ্ডটি যেন হাত দিয়ে স্পর্শ করেছেন। অন্তর্যামীর মত তার মনের মণি-কোঠার নিভৃততম, গোপনতম কথাটির যেন ধ্বনিময় প্রকাশ ঘটিয়েছেন। কবির কাব্য জগতের এই চিত্রগুলি আমাদের এই ধারণা ও বিশ্বাসকেই সুদৃঢ় করে, কবি শুধু আহারে বিহারে পোশাক-পরিচ্ছদে ও চলনে বলনে তথা চিন্তায় ও মননে যে আদর্শ বাঙালী ছিলেন তাই নয়, তাঁর

কাব্যজগৎকে বাঙালীর সহজ ও প্রত্যক্ষ মানসজগৎ ও জীবনের সঙ্গে একসুরে বেঁধে রেখেছিলেন। সতীত্বের যে অভ্রংলেহী রূপ বাংলার লোকায়ত জীবনপর্যায়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল, বেহুলার চরিত আখ্যানে কবি তার অক্ষয় মূর্তি দিয়েছেন। আবার,

মানুষই দেবতা গড়ে, তাহারই কৃপার 'পরে
করে দেব-মহিমা নির্ভর।।

মানব-দেবতাবাদের এই মহান আদর্শকে চাঁদসদাগরের চরিত্রে কবি প্রমূর্ত করে তুলেছেন।

এমনিভাবে বাঙালীর সহজ জীবন এবং তার স্বপ্ন ও আদর্শকে বিচিত্র চিত্র ও চরিত্রের মাধ্যমে কবি চিরভাস্বর করে রেখেছেন। তাঁর কাব্যচর্চা ও সাধনার সঙ্গে বাঙালীর জীবনচর্চা ও সাধনার একটা যেন নাড়ির যোগ ছিল। কবিশেখরের কবিতার ধারা বিচিত্র পথগামী বটে, কিন্তু সব পথই যেন একই তীর্থে গিয়ে পৌঁছিয়াছে। সে তীর্থ এই বাংলাদেশ—বাঙালীর জ্ঞান-বিজ্ঞানময়, ধর্ম-কর্মময়, শিল্প-বাণিজ্যময় জীবনক্ষেত্র এই পবিত্র বঙ্গভূমি।

শিক্ষাগুরু কালিদাস

ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য

আমার শিক্ষাগুরু কালিদাস রায় মহাশয় অবিভক্ত বঙ্গদেশে রংপুর জেলার কুড়িগ্রাম মহাকুমার উলিপুর নামক শহরে মহারাণী স্বর্ণময়ী উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। উলিপুর ছিল কাশিমবাজার জমিদারির বাহিরবন্দ পরগণার অন্তর্ভুক্ত। উলিপুরে তাঁদের বিরাট কাছারি, পূজামণ্ডপ প্রভৃতি ছিল। কালিদাস রায় কাশিমবাজারের রাজপরিবারের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন বলে অপেক্ষাকৃত তরুণ বয়সে ঐ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদলাভ করেন। তখন তাঁর কবিখ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত। রংপুরে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে তিনি 'কবিশেখর' উপাধি দ্বারা অভিনন্দিত হন। তখন তাঁর 'নন্দপুর চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার' লোকের মুখে মুখে ফিরত। আমি বাল্যকালে ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম, কবি সাংবাদিক শ্রীগোপাল ভৌমিকও ঐ বিদ্যালয়ে পড়তেন।

তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় ১৯৪২ সালে যখন আমি কলকাতায় এম. এ. পড়তে আসি। তিনি আমাকে শুধু স্নেহ করতেন বললে কিছুই বলা হয় না, প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষকতাকালে নানা বিষয়ে তাঁর কাছে জিজ্ঞাসু হয়ে গিয়েছি। তিনি সযত্নে প্রত্যেকটি বিষয় আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। সংস্কৃত সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব, ছন্দ, অলঙ্কার বিষয়গুলিতে তিনি গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। ছাত্রজীবনে দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন, সেজন্য পরবর্তীকালে ভারতীয় ও পাশ্চাত্য উভয় দর্শনশাস্ত্রে তাঁর বিশেষ অধিকার ছিল। সে পরিচয় তাঁর প্রকাশিত লেখায় বেশি নেই, কিন্তু তাঁর সঙ্গে যাঁরা নানা প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন তাঁরাই জানেন দর্শনশাস্ত্রে তাঁর গভীর অনুপ্রবেশের পরিচয়।

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও আধুনিক উভয় বিভাগের সাহিত্য সমালোচনায় তিনি উল্লেখযোগ্য দান রেখে গেছেন। তাঁর শেষগ্রন্থ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রচনার বিশ্লেষণ বহু নতুন দিক খুলে দিয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল কিরণে সেদিন সব কবিই অপেক্ষাকৃত আলোকিত হলেও কুমুদরঞ্জন মল্লিক 'বনতুলসীর' গন্ধে 'একতারা'র ঝঙ্কারেই মুগ্ধ ছিলেন, 'শান্তিজল' ও ধানদূর্বা' নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন করুণানিধান। তেমনই 'ব্রজবেণু'র সুরে মোহিত ছিলেন কালিদাস রায়। রবীন্দ্রনাথ তাই লিখেছিলেন কালিদাস রায়ের কবিতা পড়লে তুলসীমঞ্চ ও মাধবীকুঞ্জের কথা মনে পড়ে।

কালিদাস রায় ওয়ার্ডসওয়ার্থের ভক্ত ছিলেন। বোধকরি 'মাইকেল, ''লিচ গ্যাদারার' কবিতায় যেমন সাধারণ মানুষ এসেছে (রবীন্দ্রনাথের 'পুরাতন ভৃত্য' বা 'দুইবিঘা জমি' এ সূত্রে স্মরণীয়) কালিদাস রায়ের কবিতায় অনুরূপ ব্যক্তিরা এসেছে ওয়ার্ডসওয়ার্থেরই পথ ধরে। অন্যদিকে সংস্কৃত সাহিত্য, পালি সাহিত্য (গাথা অবদান) তাঁর কবিতায় বিপুল স্থান অধিকার করে আছে। ভারতীয় ও বঙ্গজ, ক্লাসিকাল ও লোকায়ত উভয় ধারাই তাঁর কবিসত্তায় অন্বয়রূপ লাভ করেছিল।

অধুনা যেসব কবিতা রচিত হয়েছে তার চরিত্র নাগরিক প্রশ্নবহ ও সমস্যাকীর্ণ। সুমিত শব্দ বা সমিল ছন্দের প্রতি তার অনীহা। দৃষ্টিতে ক্রোধ বা বিদ্রোহের জ্বালা। কালিদাস রায়ের কবিসত্তার অবস্থান বিপরীত কোটিতে। কবিতার স্বাদ সবার কাছে সব কালে এক নয়। আমাদের কাছে এখনো কালিদাস রায়ের কবিতা দূরশ্রুত সুমধুর সঙ্গীতের মতো সমানে বেজে চলবে। নানা ঝড় ঝাপটায়ও তার অবলুপ্তি ঘটেনি।

কবিশেখরের আর একটি পরিচয় আমার কাছে ছিল, তিনি ছিলেন আমাদের প্রধান পরীক্ষক। ম্যাট্রিকুলেশন (পরবর্তীকালে হায়ার সেকেণ্ডারি) থেকে এম-এ পরীক্ষায় তিনি কখন-বা প্রশ্নপত্ররচয়িতা রূপে, কখন-বা প্রধান পরীক্ষকরূপে, আবার বিশ্ববিদ্যালয় অথবা বোর্ডের সিলেবাস কমিটির চেয়ার ম্যানরূপে আমাদের কাছে এসেছেন। তখন তাঁকে আবার সেই শিক্ষাগুরু রূপেই পেয়েছি।

বেতালভট্ট

কুমারেশ ঘোষ

কবিশেখর কালিদাস রায়ের অজস্র কবিতাবলীর মধ্যে যে কবিতাটি সবচেয়ে বিখ্যাত তার প্রথম লাইনটা হচ্ছে—'নন্দপুরচন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার'—অপূর্ব ছন্দে কবিতাটি লেখা। কবিতাটি আমাদের সময়ে পাঠ্য-তালিকাভুক্ত হওয়ায় ছাত্রদের পড়তে হয়েছিল, মুখস্থ করতে হয়েছিল, তার সমালোচনা করতে হয়েছিল। তাই বা কেন, একযুগ ধরে কোন্ শিক্ষিত বাঙালী সে কবিতাটি পড়েন নি?

কবিশেখরকে একবার আমাদের গড়পার রোডের বাড়িতে আমন্ত্রণ করে এনেছিলাম এবং সেখানে সাহিত্য আলোচনায় কথায়-কথায় বললাম ঐ কবিতাটির কথা। কবিতাটির প্রশংসা করে খানিকটা মুখস্থও বললাম। শুনে বললেন, দেখো, লোকে আমার ঐ কবিতাটির কথাই বলে, কিন্তু আমি যে আরো কত কবিতা লিখেছি সেগুলো হয়তো পড়েইনি।

কথাটা ঠিক নয়। পড়েছে, পত্রপত্রিকাতে তাঁর বহু কবিতাই লোকে পড়েছে। তবে ভাসা-ভাসা পড়েছে, পরীক্ষায় নম্বর তোলার আশায় তো পড়েনি। তাই ভাল লাগলেও মনে রাখেনি। যেমন, আরো অনেক কবির বেলাতেও এই রকম ব্যাপারই ঘটছে এবং ঘটেছে।

নইলে কবিশেখর শুধু কবিতাই লেখেননি, অনেক সমালোচনামূলক প্রবন্ধও তিনি লিখেছেন। তিনি নিজে শিক্ষক ছিলেন, তাই তাঁর অনেক রচনাবলী রীতিমতই শিক্ষাপ্রদ। তাছাড়া তিনি শেষ বয়সে গার্হস্থ্য আচার ব্যবহারের বিষয়ে যেসব সহজ সরল সরস রচনাগুলি লিখতেন, তা বাংলা সাহিত্যে অনবদ্য। মনে হয় তাঁর সঙ্গেই সেই ধারার অবসান ঘটল।

একদা-শিক্ষক কবিশেখরের কবিতাবলীর বেশীর ভাগই গুরুগম্ভীর এবং সেটাই স্বাভাবিক। সেগুলি ছড়িয়ে আছে তাঁর 'হৈমন্তী' 'পর্ণপুট' 'বল্লরী' 'ব্রজবেণু' 'ঋতুমঙ্গল' 'লাজাঞ্জলি' প্রভৃতি কাব্যে। গদ্যরচনাবলী হিসেবে 'সাহিত্যপ্রসঙ্গ' 'বঙ্গসাহিত্যের ক্রমবিকাশ' রচনাদর্শ' 'শরৎ সাহিত্য' বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়, প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য ইত্যাদিও উল্লেখযোগ্য। 'গীতালহরী' নাম দিয়ে গীতার অপূর্ব বঙ্গানুবাদ করেছেন কবিশেখর।

গুরুগম্ভীর কবিতার কবি, সমালোচক ও শিক্ষক মানুষটির মধ্যে একটি হাস্যরসিক মন থাকতো লুকিয়ে, যার কাজ ছিল সুন্দর স্বাচ্ছন্দ-ছন্দে রঙ্গব্যঙ্গ করা। আর সে রঙ্গ-ব্যঙ্গ আড়াল থেকে করবার জন্যেই 'বেতালভট্ট' ছদ্মনাম নিয়েছিলেন গুরুগম্ভীর কবিশেখর।

এই বেতালভট্টের সঙ্গেই ছিল আমার বেশী ভাব। তাঁরই আকর্ষণে, তাঁরই কবিতার প্রার্থী হয়ে আমি প্রায়ই যেতাম তাঁর বাড়িতে টালিগঞ্জে 'সন্ধ্যার কুলায়ে'। কবিশেখর কালিদাস রায় আর বেতালভট্ট তখন এক হয়ে যেতেন, সাহিত্যের নরনারায়ণ মূর্তিতে দিতেন দেখা। গিয়ে প্রণাম করে দাঁড়াতেই বলতেন, বসো কুমারেশ, কেমন আছো বলো। যষ্টিমধু কেমন চলছে? ইত্যাদি।

তারপর বাইরের ঘরের চৌকিতে সামনাসামনি বসে চলতো অতীত আর বর্তমান বাংলা সাহিত্য আর সাহিত্যিকদের নিয়ে সরস আলোচনা। মোটা চেহারা, গরমকালে খালি গা, গলায় পৈতে মুখখানা গোল, নাকটা চওড়া, নস্যি নেবার যোগ্য নাকের ছেঁদা, সামনের দিকে মাথায় অল্প টাক, কাঁচা-পাকা গোঁফ আর বাঁ দিকের চোখের নীচে বেশ বড় আঁচিল, অনেকটা বিউটি স্পটের মত—অর্থাৎ কবিজনোচিত চেহারা নয়, তবু সবটা মিলিয়ে কেমন যেন উদ্ভাসিত আকর্ষণীয়, শ্রদ্ধেয়। যাওয়ার সময় প্রণামী নিয়ে যেতাম বেলঘরিয়ার এ-জে পরিমল নস্যির সামান্য একটা কৌটো আর প্রণাম করে ফেরবার সময়ে নিয়ে আসতাম পকেট ভরে বেতালভট্টের অসামান্য সরস কবিতাবলী—পরিমলের মতোই সুগন্ধী। আমাদের যষ্টিমধু-র মান বাড়তো।

এই বেতালভট্টের কবিতাগুলি নিয়েই আমার যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা। রঙ্গব্যঙ্গের কবিতাগুলি 'রসকদম্ব' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। কাব্যখানি প্রকাশ করেন কালিদাস রায়, ১৫ রাজা বসন্ত রায় রোড, রসচক্র সাহিত্যসংসদ থেকে এবং উৎসর্গ করেন কবিবন্ধু হৃষীকেশ ভট্টাচার্য সাহিত্য সুধানিধিকে। দাম এক টাকা। এই রসকদম্বের দ্বিতীয় সংস্করণের একখানি বই কবিশেখর উপহার দিয়েছিলেন তাঁর 'অনুজকল্প শ্রীমান কুমারেশ ঘোষের করকমলে' আর বলেছিলেন, আমাদের রসচক্রে এর অনেক কবিতাই পড়া কবিশেখরের বাড়িতে 'রসচক্র' ছিল তৎকালীন নামকরা একটি সাহিত্যিক আড্ডা। শরৎচন্দ্র থেকে শুরু করে চুনোপুঁটি সব রকম সাহিত্যিকের জন্যে অবারিত দ্বার ছিল সে আড্ডায়। পরবর্তী কালে লেখা তাঁর অন্যান্য সরস কবিতাগুলি নিয়ে আর একখানি রসমধুর কবিতাগ্রন্থ প্রকাশিত হয় 'দন্তরুচি কৌমুদী'। বইখানির তেমন প্রচার হয়নি যে কেন তা জানি না।

বেতালভট্ট রঙ্গব্যঙ্গ কবিতা লেখার কারণ ও কৈফেয়ৎ হিসেবে রসকদম্বের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় লিখছেন—প্রথম সংস্করণের কবিতাগুলি আমার যৌবনকালের রচনা, ঐগুলি রঙ্গরচনা। যে কবিতাগুলি এই সংস্করণে সংযুক্ত হইল সেগুলি প্রধানতঃ ব্যঙ্গ রচনা। সামাজিক জীবনের বহু প্রকারের কাপট্য, ইতরতা, নীচতা ও আত্মম্ভরিতা লক্ষ্য করিলে চিত্তের প্রসন্নতা রক্ষা করা যায় না। অপ্রসন্ন চিত্তে অবিমিশ্র রঙ্গরসের উন্মেষ হয় না। তাই প্রৌঢ় বয়সের রচনায় রঙ্গরস ব্যঙ্গরসে পরিণত হইয়াছে। বলা বাহুল্য, সাহিত্যের দিক হইতে ইহাতে লাভ হয় নাই, ক্ষতিই হইয়াছে।'

শেষের কথাগুলি মানতে রাজী নই। কারণ, ব্যঙ্গ রচনার মাধ্যমেই আমরা পাই তৎকালীন সমাজের হুবহু পরিচয়। মাইকেল থেকে শুরু করে গিরিশ ঘোষ, অমৃতলাল বসু, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডি এল রায় প্রভৃতির রচনায় এবং তারো আগের হুতোম পেঁচার নক্সা, আলালের ঘরের দুলাল ইত্যাদি ব্যঙ্গ গদ্য ও পদ্য রচনা থেকেই আমরা পেয়ে আসছি সেকালীন সমাজচিত্র।

বেতালভট্ট রচিত কয়েকটি প্যারডি বা লালিকা পেয়েছি উক্ত রসকদম্বে। প্যারডি-রচনার কৈফেয়ৎ দিয়েছেন ভূমিকায়—মনে রাখিতে হইবে সৎ-কবিতাকে ব্যঙ্গ করিবার জন্য প্যারডি

রচিত হয় না। প্যারডি এক প্রকারের বাক্‌কলা। ইহা লোকপ্রসিদ্ধ সর্বজন-সমাদৃত সৎকবিতা অবলম্বনেই চিরদিন রচিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র চণ্ডীর শ্লোকেরও প্যারডি করিয়াছিলেন।

ভূমিকার শেষে রসিক বেতালভট্ট বাস্তব রসকদম্বের পরিচয় দিতেও ভোলেন নি। উপসংহারে বক্তব্য, রসকদম্ব নদীয়া-মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের এক শ্রেনীর সন্দেশের নাম, পাঠক যেন একথা স্মরণে রাখেন।

তারপর ১৯৬১ সালের কথা। তখন 'বেতালভট্টে'র ছদ্মনামী খোলস ছেড়ে কবিশেখর কালিদাস রায়কে দেখতে পাচ্চি তাঁর নবতম ব্যঙ্গকাব্য 'দন্তরুচি কৌমুদি'তে। এই ব্যঙ্গ কাব্যটিতে কবি হিসেবে কবিশেখরের নামের তলায় বেতালভট্ট ব্রাকেটে ছাপা। তখন হয়তো তিনি বুঝতে পেরেছেন রঙ্গব্যঙ্গটা দোষণীয় নয়। তাই জনপ্রিয় কবি বুক ফুলিয়ে আড়াল থেকে সদর দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন। 'দন্তরুচি-কৌমুদি' প্রকাশিত হয়েছে ১৯৬১ সালে, প্রকাশ করেছেন এস. কে. পালিত এণ্ড কোং ৮, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলকাতা-১২ থেকে (অর্থাৎ রসিক গৌড়জনকে খাওয়াবার জন্যে নিজের গাঁটের পয়সায় রসকদম্ব তৈরী করতে হয়নি।)। কোন কিছুর দামই যদি মান হয়, তবে এই বইখানির দামও উচ্চতর—দু টাকা পঁচিশ নয়া পয়সা এবং আকারেও বড়। আর উৎসর্গও করেছেন প্রখ্যাত রসসাহিত্যিক 'কৌতুকরসবিলাসকুতূহলী শ্রীমান পরিমল গোস্বামী, অনুজকল্পেষু। ব্যঙ্গ কাব্যখানির ভূমিকায় কবিশেখর কালিদাস রায় (বেতালভট্ট) লিখছেন—'দন্তরুচি কৌমুদি'র অনেক গান ও কবিতা রসকদম্বে ছিল। বেতালভট্ট উপনামেই অধিকাংশরচনা প্রকাশিত। অনেকগুলি নতুন গান ও কবিতা এতে যেমন সংযোজিত হল, তেমনি অনেকগুলি বর্জিত হল। এই গ্রন্থের কতকগুলি কবিতা যষ্টিমধুতে, বাকিগুলি নানা অপ্রসিদ্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। একটি কথা বলে রাখি, এর বেশির ভাগ রচনা ৪০।৫০ বৎসর আগে রচিত। তখনকার সমাজকে লক্ষ্য করেই রঙ্গ ব্যঙ্গের সন্ধান হয়েছে এবং এগুলির মধ্যে সেকালের সমাজের একটা মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যাবে। ঠিকানা, সন্ধ্যার কুলায়, কলিকাতা ৩৩।

১৯৬১ সালের পরেও কবিশেখর বেতালভট্ট নামে আরো অনেক রঙ্গব্যঙ্গের কবিতা লিখেছেন। সেগুলি নানা পত্রপত্রিকায় ছড়ানো। অনেকগুলি যষ্টিমধুতেও প্রকাশিত। অবিলম্বে সেগুলি সংগ্রহ করে একটি কাঁটাফুলের গুচ্ছ বাঁধা দরকার।

জীবনের দুঃখকষ্ট অশ্রুধারা থেকে খানিকক্ষণের জন্যে মাথাটাকে বাঁচানো যাক রঙ্গব্যঙ্গের ছাতা দিয়ে। 'ছত্রবিয়োগ' কবিতায় কিন্তু কবি তাঁর ছাতাটি হারিয়ে ফেলে খুবই দুঃখিত—

> বর্ষাসাথী আমার ছাতি আজকে তুমি নাই,
> যাচ্ছে ফাটি বুকের ছাতি তোমার শোকে ভাই।

কারণ ছাতা শুধু মাথা বাঁচায় না, আর অনেক কিছুই করে—

> ছিলে কি আর শুধুই ছাতি, তুমিই ছিলে ছড়ি,
> গ্রীষ্মকালে ঘাম মুছেছি তোমায় রুমাল করি।
> হাত চলে না পিঠে যেথায়, চুলকে দিতে তুমিই সেথায়,
> তোমায় দিয়ে আম পেড়েছি পাঁচিল 'পরে চড়ি॥

তাছাড়া ঐ ছাতা দিয়েই কবি তাগিদদারের কাছ থেকে আড়ালে থেকেছেন, ব্যাঙের ছাতা মাসিকগুলোর ডাকাত এডিটারদের হাত থেকে বেঁচেছেন, ডগা দিয়ে লেমনেডের বোতলের কাঁচের গোল ছিপি খুলেছেন, টেবিলের তলে নভেল রেখে লুকিয়ে পড়া ছাত্রদের পিটিয়েছেন ঐ ছাতা দিয়ে। তবে দেনাদারদের গলায় ছাতা বাধিয়ে টেনে ধরেছেন কিনা জানাননি কবি।

কবির 'অন্যমনস্ক' কবিতাটি হাসির গান হিসাবে একদা অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল—

শ্রীমান মনোমোহন বাবু থাকেন সদাই অন্যমনে
খেতে চলেন গোয়ালঘরে শুতে চলেন ধুতরো বনে।
মশারীটায় চাদর বলে কাঁধে ফেলে গেলেন চলে,
একদা এক চাঁড়াল বাড়ি মেয়ের পাত্র অন্বেষণে॥

এই মনোমোহনবাবুর অনেক গুণ। তিনি ভুলে হাতে মোজা পরেন, কানে কলম গুঁজে খুঁজে বেড়ান সেটা। টিঙ্কারআইডিন মেখে ষ্টেশনে স্নান করতে যান। ছড়ি ভেবে শাবল নিয়ে তিনি বেড়াতে যান, নিজেকে লাঠি ভেবে ঘরের কোণে দাঁড়িয়ে থাকেন সারারাত।

'বিয়ের পদ্য' কবিতায় কবি বলেছেন, বিয়েতে পদ্য লেখার অর্ডার প্রায় সব কবির কাছেই আসে। কারণ, 'বর না হলেও চলে কিন্তু বিয়ের পদ্য চাই।' অথচ সবার মন খাবার দিকে, বরকনের মন পরস্পরের দিকে। তাই 'ছন্দ ছড়া নিয়ে তারা করবে কি আর ছাই?'

কবি 'শুর্ধকথা' কবিতায় শুদ্ধকথা নিয়েও রঙ্গ করেছেন—

শুর্ধ করে কথা বলার আমার সদাই চেষ্টা,
আমি বলি কৃষ্টপ্রসাদ লোকে বলে কেষ্টা।
চিত্রকলায় চিত্তরম্ভা, কাঁচিরে কই কাক্ষী,
কাশিরে কই বারাণসী, হাঁচিরে কই হাক্ষী॥

'নেশাখোরের অভিধান'-এ কবি অনেক নতুন রম্য-কথার সৃষ্টি করেছেন—

গাঁজা খেলে 'গেঁজেল' যদি, মদ খেলে হয় 'মাতাল',
নস্যি নিলে 'নেসেল' তবে, চা-খোরেরা 'চাতাল'।
ফুরুক ফুরুক গুড়ুক তবে টানলে পরে 'গুরখা' হবে,
চুরুট খেলে 'চোরঠা' বুঝি, গুলি খেলে 'গুলাল'॥

তেমনি চরস খেলে 'চৌরস', চণ্ডু খেলে 'চণ্ডাল', সিদ্ধি খেলে 'সিঁধেল' আর বিড়ি খেলে হয় 'বিড়েল'।

ঈশ্বরগুপ্তের পাঁঠা আনারস তপসে মাছ ইত্যাদি কবিতার মত খাদ্য নিয়েও বেতালভট্টের সরস কবিতার অভাব নেই। চীনাবাদাম, কাঁটাল, চায়ের গান কবিতাগুলি রীতিমতই রসালো।

ইস্কুলে যবে পড়িতে যেতাম মিটাতে আমার ক্ষুধা,
টিফিনের কালে দুই পয়সায় রসনায় দিতে সুধা।

দু মাইল পথ হাঁটিতে হইবে ? তুমি দাও উদ্যম,
চার পয়সায় অনায়াসে তুমি ভুলাতে পথের শ্রম ।।

(চীনাবাদাম)

সেয়ানা লোকেরা বোকায় মাথায় তোমারে ভাঙিয়া খায়
একেবারে বোকা ঠকে না, গড়ানো রস কিছু কিছু পায় ।
সৌরভ তব ফুল সৌরভে গৌরবে করে জয়
তাই চুরি করি চাঁপা সে গন্ধ কাঁটালিয়া চাঁপা হয় ।।

(কাঁটাল)

ভেবেছিলাম চায়ের আয়েই চা খাব পেট ভরে
চাবাগানের শেয়ারগুলো লুটল সবি চোরে ।
স্বর্গবাসের নেইকো ক্ষুধা, চা সেথা নেই আছে সুধা,
চা যদি পাই নরকে যাই হেথায় ছুটি হলে ।
চোরের সঙ্গে সেথায় দেখা হতেও পারে মলে ।।

(চায়ের গান)

এন্টোনি সাহেব, কবিয়াল ভোলা ময়রা, গোপাল ভাঁড় ইত্যাদি কবিতায় কবি সরস ছন্দে তাঁদের সংবর্ধনা জানিয়েছেন । এন্টোনি সাহেবকে কবি বলেছেন 'যারা সব লুটলো মোদের ধন, তাদেরি সঙ্গে এসে রঙ্গরসে লুটলে মোদের মন ।' ভোলা ময়রাকে বললেন 'মোদকমশায়, তোমার পেশায় আমোদ যত দিলে, একালে তা কোন কবিতায় মিলে ?' গোপাল ভাঁড়কে মনে করিয়ে দিয়েছেন, 'অন্তরে ছিল রসের ভাণ্ড তাই তোমা বলে ভাঁড়, গোপাল তুমি যে হইলে রাখাল চরাইয়া যত ষাঁড় '

বেতালভট্টের রঙ্গকবিতাগুলি নানা রঙ্গে রঙীন । তবে সব কবিতাই ষোলো আনা রঙ্গের নয় । কোথাও একটু করুণ রসের স্বাদ মিশিয়েছেন, কোথাও-বা ব্যঙ্গের । কারণ বেশি মিষ্টি আবার ভাল নয়, মুখ মেরে দেয় । 'মেসের পত্র', 'পেটের দায়', 'কবি-খ্যাতি', 'মালাসঙ্কট', 'অভিনন্দন', 'নতুন নেতা', 'টাকার ছড়া', 'দরিদ্রের সান্ত্বনা' ইত্যাদি কবিতাগুলি ঐ ধরনের খাদ মেশানো রসোত্তীর্ণ সরস কবিতা ।

কবি বলেছেন, চারিদিকের অনাচার, কাপট্য ইত্যাদি দেখেই ব্যঙ্গ কবিতাগুলি লিখেছেন প্রতিবাদ হিসেবে, অনাচারী কপটদের মুখের মুখোশ খুলে দেবার জন্যেই ।

ইংরেজি বাংলা মিশিয়ে যাঁরা কথা বলেন তাঁদের ব্যঙ্গ করে 'অবিমিশ্র ভাষা' কবিতায় কবি বলছেন —

খিচুড়ি ভাষায় কথা বলা আমি লাইক করি না মোটে,
বিদেশী ওয়ার্ড ইভেন্ড করিতে সংযম চাই ঠোঁটে ।
এমনি করিয়া লুজ করিতেছি ন্যাশনাল প্রেসটিজ,
এমনি করিয়া বনিতেছি মোরা এক কিউরিও চীজ ।।

'সরস্বতী আবাহনী' কবিতায় কবি মা সরস্বতীকে আহ্বান করছেন—'বিদ্যা যেখানে বেচাকেনা হয়

বোতলে পুরিয়া লেবেল আঁটি, বারো আনা যার মেকি ও ভেজাল, সাড়ে চার আনাও মিলে না খাঁটি।'

'তোমরা ও আমরা' কবিতায় গরীব বড়লোককে বলছে 'হোমড়া চোমড়া তোমরা মোটরে ধাও, আমরা হোঁচট খাই। চাকার কাদায় ছিটেয় সাজিয়া ভূত অফিসের পানে ধাই।' আর বড়লোক বলছে গরীবকে, 'জেলে যেতে যেতে বেঁচে যে করেছি টাকা, তার ভাগ বুঝি চাও? দুপুর বেলায় একটু ঘুমুই তাই হিংসেয় মরে যাও।'

'নব্যা' কবিতার বিষয়বস্তু পুরানো হলেও বলবার ঢংটি নতুন: 'জানো বিশ্রামটাও কাজের অঙ্গ সেটাই বড় কাজ? আজে বাজে কাজের জন্য তোমার মা ভগিনী ভাজ। কাপড় কাচো, বাসন মাজো, এঁটো ঘুচাও, বাপ। দুদিন পরে বলবে, কর পায়খানাটাও সাফ।'

হামবড়াইদের ব্যঙ্গ করেছেন 'নিজের কথা কবিতায়'—

নিজের কথা ফলাও করে বলাও জেনো একটা দোষ,
আপন কথা একটি দিনও বলেছে এই নন্দঘোষ?
এই যে আমার ছোট ছেলে, এম-এ ল-এ বৃত্তি পেলে
বলিছি কি কন্যা নিয়ে সাধছে হাকিম চন্দ্রবোস?

কবি ব্যঙ্গ করেছেন বাঙ্গালী সাহেবকে, [illegible] দাতাকে। তথাকথিত কবি সাহিত্যিক সমালোচকদের অহংকারকে ব্যঙ্গ করতেও ভোলেননি কবি। 'সমালোচনা' কবিতায় বলছেন—

বইখানা যা পাঠিয়েছ [illegible] হলাম আনন্দিত,
মলাটখানির ললাটপটে নামটি তোমার সুমুদ্রিত।
ছবি কখানা এঁকেছে বেশ, নিখুঁত করে ছেপেছে প্রেস,
বিশেষতঃ কভারখানি হয়েছে ভাই অনিন্দিত॥

আবার ভালো শ্রোতাও যে কী দুর্লভ, তা-ও কবি জানিয়েছেন 'কবিতার শ্রোতা' কবিতায়—

কবিতা শুনিতে চায় না হায়রে যে আসে আমার কাছে।
জিজ্ঞাসে এসে ভালো পাত্রের সন্ধান কিছু আছে?
কিংবা, কেহ এসে বলে একখানা বাড়ি
চাই ভাই দেখে দাও তাড়াতাড়ি।
অথবা, তোমাদের দেশে মুসুরি সস্তা
দাও না আনিয়ে দুচার বস্তা।
এবং, মেয়ে পরীক্ষা দিয়েছে এবার
আনিয়াছি তার রোল নাম্বার,
চেষ্টা করিও অনেকেরই সাথে তোমার তো পরিচয়॥

কবি-জীবনে এ একটা কম ব্যঙ্গ নয়, ট্রাজেডি তো বটেই! রঙ্গব্যঙ্গের লেখক যেমন পরকে নিয়ে রঙ্গব্যঙ্গ করেন তেমনি নিজেকেও ছেড়ে কথা কন না। এই শক্ত কাজটি যে কবি বা লেখক করতে পারেন, তিনিই রসোত্তীর্ণ রস-সাহিত্যিক বা কবি। বেতালভট্ট নিজের নস্যির নেশাকেও ব্যঙ্গ করতে ছাড়েননি। 'নস্যের গান' কবিতায় নস্যি নেবার পরিণতিকে ব্যঙ্গ করে বলছেন—

নস্য নিয়ে নিয়ে নাকের সকল নালি ভাইরে,
ভরভরে এই নাকে ফুলের গন্ধ নাহি পাইরে।
গহ্বরটা হচ্ছে বড়, যাচ্ছে চলে যতই ভরো
তালুর খোলে হচ্ছে জড়ো তামাক পাতার ছাইরে।।
কাসলে পরে আলকাতরা হাঁচলে ওড়ে কালীর ছিটে,
সমান আমার বিষ্ঠা আতর বোটকা পচা টাটকা মিঠে।
লোকে বলে নাকের মাঝে জীব জন্তু অনেক বাজে,
গর্জে তারা নানা স্বরে নিন্দা করে যাইরে।।

কবিশেখর ওরফে বেতালভট্ট আগেই সাফাই গেয়ে রেখেছেন, 'মনে রাখিতে হইবে, সৎকবিতাকে ব্যঙ্গ করিবার জন্য প্যারডি রচনা হয় না। প্যারডি একপ্রকারের বাককলা।' এই বাককলাতেও বেতালভট্ট যে সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে নীচের কয়েকটি নমুনা থেকেই—

কান্তকবি রজনীকান্তের 'কেন বঞ্চিত হবো চরণে' গানের প্যারডি —

কেন বঞ্চিত হব ভোজনে।
মোরা কত আশা করে নিজ বাসা ছেড়ে
খেতে এসেছি আমরা কজনে।
হয়ে, ক্ষুধার জ্বালায় অন্ধ, এসে দেখিব কি খাওয়া বন্ধ?
তবে—তাড়াতাড়ি 'পাত করো' বলে ডাক
তব আত্মীয়স্বজনে।। (বঞ্চিত)

রবীন্দ্রনাথের 'যদি প্রেম দিলে না প্রাণে' গানের প্যারডি—

যদি ধন দিলে না গাঁঠে,
কেন—সারা শহর ভরে দিলে এত দোকান পাটে?
কেন—মিঠাই মনোহরা, এত ফলে বাজার ভরা?
কেন—বড় বড় রোহিত মৎস্য মেছুনীরা কাটে?
যদি ধন দিলে না গাঁঠে (যদি-তবে)

দ্বিজেন্দ্রলালের 'যখন সঘন গগন গরজে বরিষে করকাধারা'র প্যারডি—

যখন সঘন গৃহিণী গরজে বরিষে বকুনি-ধারা,
সভয়ে অমনি আবরি নয়ন, লুপ্ত সংজ্ঞা সাড়া।
রক্তিমাধরে অধীর রাগে তাহার আননখানি,
সতত কুঠার-পাণি সে যে গো আমার নিদয়া রাণী।।

(কেরানীর রাণী)

রজনীকান্তের 'তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে' গানের অনুকরণে—

তুমি নির্মম করে চুরমার কর নারীর মর্ম খোঁচায়ে
অন্নবসন দিতে অক্ষম হয়েছ শাসন ওঁচায়ে।...
আমি ধোঁয়ায় কাসিয়া কাঁদিয়া নিতি মরছি রাঁধিয়া রাঁধিয়া
তবু যশ নাই দোষ দাও কেন ধুতিও দিই না কোঁচায়ে॥

বেতালভট্টের ফোঁটা ফোঁটা কবিতা বা চলতি ভাষায় চুটকী কবিতার সংখ্যাও কম নয়। চার লাইনের বা দুলাইনের রঙ্গ-ব্যঙ্গের এই কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা'র কবিতাগুলির কথা মনে করিয়ে দেয়। তবে নিশ্চিত তার অনুকরণ নয়। এগুলির ভাব ও ছন্দ আলাদা। যেমন সূক্ষ্ম তেমনি তীক্ষ্ণ। ছররা গুলী যেন। পত্র-পত্রিকায় পাদ পূরণে এই সব চুটকী কবিতার স্থান কবিতার যেন অসম্মান বলে মনে হয়। বেতালভট্ট এইগুলিকে চৌপদী ও দ্বিপদী নামকরণ করেছেন। তবে কবিতাগুলির নাম নেই। চৌপদী-র কয়েকটি নমুনা—

নিজের শুভের কথা সুসংবাদ কারেও বলো না,
মিছামিছি দেবে কেন অন্যেরে বেদনা?
বলো সবে ঘটে যদি ক্ষয়ক্ষতি অশুভ দুর্যোগ,
আনন্দ দেওয়ার কেন ছাড়িবে সুযোগ॥

আর একটি—

ইঁদুর বলে বয়স হলে আমিই হব হাতী,
দূর্বা বলে বংশ হব আমি তো তার নাতি।
রুই কাতলা যা-হোক হব কয় পুঁটিমাছ হেঁকে,
গুগলি বলে শঙ্খ হব হুগলি গাঙেই থেকে॥

আরো একটা—

একেবারে হাসে না যে ঠোঁটে যাহার আগল
দূরে দূরে রাখতে হয় তায়।
কথায় কথায় হাসে যে, সে না হয় যদি পাগল,
তারি কাছে বিশেষ আছে ভয়॥

এবার কয়েকটি দ্বিপদী-র নমুনা—

(১) বুড়োরা তল্পী তোল,
তরুণ জ্যাঠার শাসনে তোদের ঠাঁই যে পিঁজরাপোল॥

(২) অতিথি আর পাকা কাঁঠাল দুদিনই নয় মন্দ,
তারপরেতেই নাকে কাপড় বিশ্রী তাদের গন্ধ॥

(৩) দুলাইনে আমার গাঁয়ের সুপরিচয় দিতে পারি,
গয়লা চাষীর ভাঙা কুঁড়ে, কেবল শুঁড়ির কোঠাবাড়ি॥

(৪) শোভার তরে রাঙায় নারী রাঙানো যায় যা যা
কানকোতে রঙ মেখে চিতল দেখায় কেমন তাজা॥

কোনো কিছুর সামান্য নমুনা দেখিয়ে তার পুরো পরিচয় দেওয়া সম্ভবপর নয়। যেমন এক গণ্ডুষ সমুদ্রের জল দেখিয়ে বোঝানো যায় না সমুদ্রের বিশালতা। তবু এটাই নিয়ম। আর পাকা রাঁধুনীদের মতে, একটা ভাত টিপলেই নাকি বোঝা যায় হাঁড়ির ভাতের খবর। তাই ভোজে বসবার আগে এই একটু চেখে দেখবার আয়োজন।

কালিদাস রায়ের কবিকৃতি

দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ

কবিশেখরের কাব্যরচনার যখন জোয়ারের কাল রবীন্দ্রনাথের কবিপ্রতিভা তখন মধ্যগগনে। সে প্রতিভার নিত্য নতুন বিদ্যুচ্চমকিত স্ফুরণে বাঙালী পাঠক যখন বিস্মিত, কালিদাস রায় নিতান্ত সাদামাঠা সুরে তাঁর কাব্যবীণার সুর তুলে সহৃদয় বাঙালী পাঠকের হৃদয় জয় করছেন—এটা কম কৃতিত্বের কথা নয়। এ কৃতিত্বের মূলে রয়েছে বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর অন্তরঙ্গ প্রাণের যোগ। বাঙলা দেশের যে বিচিত্র পল্লী তাঁর ধাত্রীমাতা, সে পল্লীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, পল্লীর মানুষের সহজ সুখদুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনার সুরটিকে কবি তাঁর একতারায় সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন—কবিশেখরের কাব্যের অব্যর্থ সংক্রমণশীলতার (Infection) চাবিকাঠি ছিল সেখানে।

রবীন্দ্রনাথ নিজে সূক্ষ্ম অনুভূতির জগতে বিচরণশীল এবং পরিশীলিত মনের প্রসাধনপ্রিয় কবি হলেও কবিশেখরের সহজ সরল আন্তরিক কবি-অনুভূতির দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে লিখেছিলেন—'তোমার কবিতা বাংলা দেশের মাটির মতই স্নিগ্ধ ও শ্যামল। বাংলা দেশের প্রতি গভীর ভালোবাসায় তোমার মনটি কানায় কানায় ভরা, সেই ভালোবাসার উচ্ছলিত ধারায় তোমার কাব্যকানন সরস হইয়া কোথাও-বা মেদুর কোথাও-বা প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। তোমার কবিতাগুলি পড়িলে বাংলার ছায়াশীতল নিভৃত আঙিনার তুলসীমঞ্চ ও মাধবীকুঞ্জ মনে পড়ে।'

কবিশেখরের কাব্যের সুর-স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্ত মন্তব্য বিশ্লেষণ করলে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে—

১) কালিদাস রায়ের কাব্যরূপ স্নিগ্ধ ও সজীব।

২) যেহেতু সে কাব্যের উৎসে রয়েছে বাংলাদেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা সে কারণে সে কাব্যজগৎ কোথাও-বা ব্যথাকরুণ, কোথাও-বা আনন্দরোমাঞ্চিত।

৩) সে কাব্য গ্রামীণ জীবন-পরিবেশ এবং জীবন সংস্কারের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

কালিদাস রায়ের কবিকৃতির স্বরূপ নির্ণয়ে রবীন্দ্রনাথ যে লক্ষণগুলির ওপর জোর দিয়েছেন তা খুবই সংক্ষিপ্ত হলেও সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সে তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে সমকালীন অভিনবত্বপ্রয়াসী কাব্যকবিতার সঙ্গে কালিদাস রায়ের কবিতার বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গের তুলনামূলক বিচারপ্রসঙ্গে।

কবিশেখর কালিদাস রায়ের কাব্য কবির স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণাজাত, মহৎ জীবনভাবনায় অনুরঞ্জিত এবং বক্তব্যপ্রধান হলেও গীতিরসবঞ্চিত কাব্যপাঠক মহলে তেমন সমাদৃত নয়। তার কারণ অনুসন্ধান

করতে হবে এ যুগের তথাকথিত কাব্যের হাওয়া বদলের মধ্যে। যে কাব্য ছিল এককালে দৈবী প্রতিভার অধিকারী সহৃদয় কবির অকৃত্রিম অন্তর থেকে স্বতঃ-উৎসারিত, সে কাব্য আজকাল মননবিলাসী একশ্রেণীর শিক্ষিত ব্যক্তির মানসিক কসরতের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে যে কাব্য ছিল একসময়ে জনসাধারণের আস্বাদনের সামগ্রী, সে কাব্য এ যুগে অঙ্গুলিগণ্য পাঠকসমাজে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। অনেককে সকৌতুকে এমন মন্তব্য করতেও শোনা যায়, বর্তমানে কবিতাপাঠকের সংখ্যার চাইতে কবিতালেখকের সংখ্যা বেশি।

বাংলা কাব্যে 'ডেকাডেন্স'-এর ক্ষত যখন উৎকটভাবে আত্মপ্রকাশ করে নি কালিদাস রায়ের সুস্থ কবিকল্পনা তখন বাংলা কাব্যে সোনার ফসল ফলিয়েছে। রবীন্দ্র-প্রতিভার অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিতে বাঙালী কাব্যপাঠকের হৃদয়-মন যখন উদ্ভাসিত, কালিদাস রায়ের কাব্যকবিতা তখনও একই পাঠক সমাজকে তৃপ্তি দিয়েছে—এটাই কালিদাস রায়ের কবিকৃতির অন্যতম পরিচয়। রবীন্দ্র-কাব্যের সূক্ষ্ম ভাবসচেতন কাব্যের অন্তর্লোকে প্রবেশের পথে কাব্যপ্রিয় যে সাধারণ পাঠক বাধা অনুভব করছিলেন, কালিদাস রায়ের অতিস্পষ্ট বিচিত্র অথচ স্বাভাবিক কাব্যলোকে প্রবেশ করতে তাঁরা কোনো বাধার সম্মুখীন হন নি। তাঁর কাব্যে রবীন্দ্রকাব্যের সুকুমার মসৃণ পেলবতা হয়তো নেই, নেই হয়তো ধ্বনিপ্রধান সুরতরঙ্গ, অন্তর্জগতকে ভাবের দোলায় আলোড়িত করবার মতো সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা। কিন্তু কালিদাস রায়ের বহুমুখী ভাবকল্পনা বাংলা দেশের গ্রামীণ জীবন, পল্লীপ্রকৃতি, বাঙালীর আবাল্যলালিত সংস্কার আশা, আকাঙ্ক্ষা, ব্যর্থতা, বেদনাকে কেন্দ্র করে যে অপূর্ব রূপ ও রসজগত সৃষ্টি করেছে তার প্রত্যক্ষতার আবেদন সচেতন কাব্যপাঠকের মনে আবেগসৃষ্টির পক্ষে ছিল যথেষ্ট। মনীষী শিল্পসমালোচক টলস্টয় সার্থক কলাকৃতির উপায় হিসেবে যে সংক্রমণশীলতার ওপর জোর দিয়েছেন, কালিদাস রায়ের কবিকর্মে তা প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। এ কারণেই কালিদাস রায়ের কাব্যকবিতা এককালে বালক তরুণ বৃদ্ধ সকলের হৃদয় জয়ে সক্ষম হয়েছিল। তিনি ছিলেন সরল সহজ ভাবের সহজিয়া কবি। তত্ত্বপ্রিয়তাকে তিনি কাব্যসৃষ্টির বিঘ্ন মনে করতেন, যদিও তাঁর কাব্যে তত্ত্বপ্রেরতার কিন্তু অভাব ঘটেনি।

আধুনিক বাংলা কাব্যজগতে কালিদাস রায়ের কাব্যের বৈশিষ্টতা হল সে কাব্যের একটা বড় অংশ বাঙলা দেশের ভেজা মাটির গন্ধ মেশানো। জীবিকা উপলক্ষে ইট-কাঠ ঘেরা সানবাঁধানো মহানগরীর হৃদয়হীন বুকে বাস করতে বাধ্য হওয়ায় পল্লীপ্রকৃতির প্রতি কবির আকর্ষণ আরো দুর্নিবার হয়ে উঠেছিল। সে আকর্ষণ আবেগময় রূপ পেয়েছে তাঁর কাব্যে নস্টালজিয়ার আকারে। তাই বলে কালিদাস রায়কে পল্লীকবি জসীমুদ্দীনের মতো Pastoral poet বলা চলে না। কাব্যরচনায় কবি ছিলেন মুখ্যত ক্লাসিকপন্থী, কাব্যের 'ফর্ম' সম্পর্কে তিনি ছিলেন অতি-সচেতন। বিষয়বস্তু পল্লীর হোক, নগরের হোক, বর্তমানের হোক, অতীতের হোক—নির্বাচিত শব্দ সংযোজন, চিত্রকল্প, এবং ছন্দের যাদুর সাহায্যে তাকে উপভোগ্য কাব্যরূপ দিতে তিনি ছিলেন সদা মনোযোগী। কল্পনার বহুমুখিতা তাঁর বিচিত্রধর্মী কাব্যকে যে প্রকাশের অতিচারিতায় মূল্যহীন করে দিতে পারে নি তার প্রধান কারণ এই বহু-অধীত কবির ক্লাসিক সংযম।

মুখ্যত ক্লাসিক ধারার কবি হলেও কালিদাস রায়ের কাব্যে যে রোমান্টিক ভাববিভোরতা নেই তা বলা চলে না। তবে তাঁর রোমান্টিক মন কখনও অতি বাস্তব জগৎ ও জীবনকে অতিক্রম

করে নি। ideal ও real-এর চমৎকার সমন্বয় ঘটেছে তাঁর কাব্যে—যা একমাত্র শুদ্ধ ভাবকল্পনার পক্ষেই সম্ভব।

স্মৃতির পাখায় ভর করে অতীত গৌরবময় স্মৃতি রোমন্থন এবং পুরাণপ্রীতি কবিশেখরের কাব্যকে যে মহান গৌরব দান করেছে তার মূলে রয়েছে কবির অনির্বাণ দেশাত্মবোধ। আধুনিক বিলাসবহুল আড়ম্বরপূর্ণ সংস্কৃতি কবির মনোজগতের উপর তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি—যেহেতু সে সংস্কৃতি বিদেশাগত, কৃত্রিম। তাঁর প্রশস্তিমূলক কবিতাগুলির ভিতর মানবমাহাত্ম্যের প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন। সাহিত্যে যাকে সাবলাইম বলা হয় সে সমুচ্চ ভাবচেতনার গভীর গম্ভীর প্রকাশ ঘটেছে এ কবিতাগুলির মধ্যে।

অতীত স্মৃতিচারণ কালিদাস রায়ের কবিমানসের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হলেও বর্তমান জগৎ ও জীবনের প্রতি তিনি নিস্পৃহ ছিলেন এমন বলা চলে না। ব্যঙ্গরসাত্মক কবিতাগুলিতে ব্যক্তিমানুষ এবং সমাজের সর্বপ্রকার দোষ দুর্বলতার উপর বিদ্রূপের কশাঘাত হেনে স্বার্থমগ্ন জাতিকে তিনি জাগাতে চেয়েছেন। ব্যঙ্গরস যদিও কাব্যজগতে উচ্চ মর্যাদার দাবী করতে পারে না, তথাপি কবির সমাজচেতনার বাহন হিসেবে তা একেবারে মূল্যহীন নয। আর এক পর্যায়ের কাহিনীকবিতায় সমাজের নীচুতলার মানুষের মধ্যে তিনি মানবমাহাত্ম্যের যে অমূল্য রত্নের সন্ধান পেয়েছেন তার তুলনা কাব্যজগতে বিরল।

কবিশেখর কালিদাস রায়ের পরিচয় শুধু তাঁর কাব্য কবিতার মধ্যেই আবদ্ধ নয়, কাব্যের ন্যায় গদ্যসাহিত্যেও তিনি ছিলেন সমান ধুরন্ধর। সাহিত্যের ঐতিহাসিক, সাহিত্যের সমালোচক ও প্রাচীন ও আধুনিক উভয় সাহিত্যের তুলনামূলক রসবিশ্লেষক রূপে তিনি সুবিদিত ছিলেন।

গুরুগম্ভীর প্রবন্ধের লেখকরূপে তিনি যেমন এক মহলে পরিচিত ছিলেন, লঘু রম্যরচনার জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক রূপেও তাঁর খ্যাতি কম ছিল না।

কবিশেখরের অকৃত্রিম আন্তরিক অনুভূতিজাত কাব্য স্বক্ষেত্রে স্বরাট, আধুনিক বাংলাকাব্যের উত্থানপতনময় তরঙ্গলীলায় স্থির সৌন্দর্যের দ্যুতিতে উজ্জ্বল।

বেদনার কবি কালিদাস

দক্ষিণারঞ্জন বসু

'তুমি আসতে চেয়েছ শুনে সুখী হলাম। কেউ তো খোঁজ নেয় না। আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে এখন আর ভাবি না। সাহিত্যের অর্থ তো এখন কথাসাহিত্য। চোখে ছানি পড়ার পর গল্প উপন্যাস পড়া বন্ধ। ভাযারা আজকাল কে কি লিখছেন তাও জানি না। আর আধুনিক কবিতা তো বুঝি না— এদের ভাষা আমার পক্ষে দুর্বোধ। ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশ কবে আর অপ্রিয় হতে চাই না। কোন লেখাব সুখ্যাতি করাও এখন বিপজ্জনক। অন্য দল চটে যায। নীরবতাই নিরাপদ। সাহিত্য ক্ষেত্রে বহু দলাদলি। প্রবন্ধসাহিত্য থিসিস-এর রূপ ধরছে। সে সব থিসিস পড়াব ক্ষমতা আর নেই। তবে এই শাখায় কিছু কাজ হচ্ছে এটা বুঝতে পারছি। কি মাছ-সবজির বাজাবে, কি কলেজ ষ্ট্রীটের বাজারে মাৎস্যন্যাযের শাসন চলছে। যে সব মাসিকপত্র খুব চলে সেগুলিব একখানিও আমার কাছে আসে না। কোন সাপ্তাহিকও আসে না। অতএব নিজের শোচনীয পরিণাম এবং মাঝে মাঝে হরিনাম ছাড়া আর ভাববার নেই কিছু।'

এই পত্রাংশটুকুব মধ্যে সাহিত্যপ্রাণ পত্রলেখকের গভীর মনোবেদনা ও অভিমান এমনভাবে প্রকাশ পেযেছে যে তা আর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। তিনি এখানে এযুগের বাংলা সাহিত্যের পরিবেশ সম্বন্ধে যে মতামত ব্যক্ত করেছেন তাও উপেক্ষণীয় নয। তাঁর কালে এবং তাঁর ক্ষেত্রে তিনি অসামান্য ছিলেন বলেই তাঁর কথা উড়িযে দেওযা চলে না।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যাঁর কবিতা পড়ে মুগ্ধ হযে বলেছেন, 'তোমার কবিতা বাংলা দেশের মাটির মতই স্নিগ্ধ ও শ্যামল', রবীন্দ্র পরিমণ্ডলের সেই শেষ কবি কালিদাস রায়ের সাহিত্যপ্রীতির গভীরতাকে বুঝাবার জন্যেই তাঁরই একখানা চিঠির উদ্ধৃতি দিযে তাঁর সম্পর্কে এ আলোচনাটি আরম্ভ করেছি।

এ চিঠিখানি তারিখবিহীন। তবু যতদূর মনে পড়ে এখানা কবিশেখরের ১৩৬৮ সালের শেষ দিকের লেখা চিঠি। মাঝে মাঝে তাঁর কাছ থেকে এমনি চিঠি পেতাম, খুব ভালো লাগতো। কিন্তু সে সবের উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। তবে এটুকু বলা যেতে পারে যে, ছাত্রবৎসল বন্ধুবৎসল এই শিক্ষক-কবির সে সব পত্রের অধিকাংশই ছিল অন্যের প্রয়োজনে লেখা, নিজের কথা তাতে কমই থাকতো, যদিও কথা বলার আগ্রহ প্রকাশ পেতো প্রায় পত্রেই, যেমন একবার তিনি লিখলেন, 'তোমার সঙ্গে একবার দেখা হলে অনেক কথাই বলা যেত। যাক্ একদিন দেখা কোথাও না কোথাও হবেই।' (২৮. ১২. ৫৯)

হ্যাঁ, তেমন দেখা হ'ত কখনো-কখনো সভা সম্মেলনে, নয়তো বাড়ীতে। বছর চব্বিশ আগের কথা। উত্তর শহরতলীর কোথায় একটা সাহিত্যসভায় আমিও যাবো কালিদার সঙ্গে। কথাই ছিল আমাকে পাইকপাড়ার বাসাবাড়ি থেকে তুলে নেবার সময়ে দাদা কিছুক্ষণ আমাদের বাসায় বিশ্রাম নেবেন। তাই হয়েছিল এবং সেদিন বিকেলের একটি ঘন্টা স্মরণীয় হয়ে আছে। বাড়ীর ছোট বড়ো সবার সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলোচনায় কালিদা মেতে উঠেছিলেন সেদিন। তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'নন্দপুর চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার' আমার পিতৃদেবের এতই ভালো লাগতো যে তিনি হঠাৎ-হঠাৎ এই কবিতাটি আবৃত্তি করতেন। কবিকে কাছে পেয়ে পিতৃদেব সেদিন তাঁর সঙ্গে ঐ কবিতাটির বৈষ্ণব ভাবপরিবেশ নিয়ে আলোচনা শুরু করে দিয়েছিলেন। বাড়ীর স্কুল-পড়া ছেলেদের সঙ্গেও তিনি কত রকমের গল্প জুড়ে দিয়েছিলেন তখন। তাঁর বাল্যকালের স্মৃতি বিজড়িত 'বিদ্যালয় পথে' কবিতা থেকে কিছুটা আবৃত্তি করে ছেলেদের তিনি শুনিয়েও ছিলেন আমাকে নিয়ে সভায় রওনা হয়ে যাবার আগে।

অনেক পরের আরেক দিনের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে। কবি তাঁর নিজ বাড়ি টালিগঞ্জের চারু এ্যাভেনিউস্থিত 'সন্ধ্যার-কুলায়'-এ শয্যাগত। সেই অবস্থাতেই তাঁকে তাঁর নিজস্ব পরিবেশে সম্বর্ধিত করার আয়োজন করেছিলেন কবিশেখরের স্নেহধন্যা শ্রীমতী অমিতা ঘোষাল তাঁর প্রতিষ্ঠিত শিশু শিল্প সঙ্গীত শিক্ষালয় 'তীর্থ-বাসর'-এর পক্ষ থেকে। সেই সুন্দর 'ঘরোয়া' অনুষ্ঠানে আমাকেও উপস্থিত থাকতে হয়েছিল শ্রীমতী ঘোষালের আমন্ত্রণে। সে উপলক্ষে অসুস্থ কবি উঠে বসেছিলেন তাঁর শয্যায়। শিশুশিল্পীরা তাঁকে বরণ করলে সেই সময়ে কবিশেখরকে ভারি প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল। আমি এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করে আমার পরিচয় দিতেই কবি খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন এবং বললেন, 'কিছুই আর দেখতে পাই না। তবু তুমি এসে খুবই ভাল করেছ। অনেকদিন ধরেই ভাবছিলাম আশীর্বাণী উপহার হিসাবে আমার একখানি বই তোমায় দেবো।' কথা কয়টি বলতে কবির বেশ কষ্ট হচ্ছিল লক্ষ্য করছিলাম। ততক্ষণে আমাদের সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেছে। কবি এই অনুষ্ঠানের জন্যে শ্রীমতী ঘোষাল ও তাঁর শিশু ছাত্রছাত্রীদের আশীর্বাদ জানালেন এবং তাঁর কাব্য সংকলন "সন্ধ্যামণি" আশীর্বাদী উপহাররূপে আমার হাতে দিলেন। আমি তা মাথায় তুলে নিলাম। চোখে না দেখতে পেলেও আন্দাজেই তিনি বইখানিতে 'কালিদা' কথাটি লিখে দিয়েছিলেন। অন্য হাতের লেখায় সেখানে তারিখ রয়েছে ২৬।১।৭১। কালিদার স্বাক্ষরিত সেই উপহার গ্রন্থখানি আমি সযত্নে আমার লাইব্রেরীতে রক্ষা করছি।

ঐ সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান থেকে বাড়ী ফেরবার পথেই আমি 'সন্ধ্যামণি' বইখানির পাতা উল্টে দেখছিলাম এবং 'গ্রন্থকারের নিবেদন' চোখে পড়তেই সে অংশটুকু আগে পড়ে ফেললাম। তাঁর একটি কথায় আমি চমকে উঠলাম। কবিশেখরের মুখেই তো একদিন আমি সে কথা শুনেছি। অনেক বছর আগে এক সভা থেকে ফেরবার পথে কথায় কথায় কালিদা বলছিলেন, 'কারো, এমন কি কবিগুরুর, রচনা-রীতিরও আমি জ্ঞাতসারে অনুকরণ করিনি।' কথাটা ঠিক বলেই লিখিতভাবে এ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করে রাখতে কবি কুণ্ঠাবোধ করেন নি।

'সন্ধ্যামণি' কাব্য সংকলনে 'গ্রন্থকারের নিবেদন' মুখবন্ধে কবিশেখর নিজের কাব্যসাধনা সম্বন্ধে আর যে সমস্ত কথা বলেছেন তাই কবি কালিদাস রায় ও তাঁর কবিতা বিচারের শ্রেষ্ঠ মাপকাঠি বলে আমি মনে করি। রায় কবি লিখেছেন, 'যেরূপ দ্রুতগতিতে যুগের পরিবর্তন হয়েছে তাতে যুগের সঙ্গে তাল রেখে চলা ঊনবিংশ শতাব্দীতে সঞ্জাত কবির পক্ষে সম্ভব নয়।' এর যাথার্থ্য কে অস্বীকার করবে? রবীন্দ্রনাথের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র আর মাইকেল মধুসূদনকেও বোধহয় কেউ বাতিল করতে সাহস পায় না।

সে যাই হোক, কবিশেখর তাঁর নিবেদনে আরো লিখেছেন, 'আমি কোন পরিকল্পনা নিয়ে কাব্যসাধনা করিনি, যখন যে ভাব মনে এসেছে তাই ছন্দে প্রকাশ করেছি। আমার কাব্যসাধনার মূলে বেদনা, ব্যথিতের কথাই বেশী লিখেছি, তবে আমি আমার ঘনিষ্ঠ কবিবন্ধুর মত দুঃখবাদী হইনি। ব্যথার সান্ত্বনা খুঁজেছি কবিতায়। তা অবশ্য পেয়েছি।' এর পরেই তিনি একালের কাব্য সমালোচনার ধারার পটভূমিকায় নিজের মতাদর্শ বিশ্লেষণ করে বলেছেন, 'আজকালকার সমালোচকরা কবির কাব্যে কোন একটা মতবাদ খোঁজেন, আমি কোন মতবাদের চারিপাশে ঘুরপাক খাইনি—তাত্ত্বিকতা আমার লক্ষ্য নয়, সাত্ত্বিকতাই আমার লক্ষ্য! আমার বিশ্বাস কবিতায় সরসতা যদি হয় মূল, তবে তাত্ত্বিকতা তার ফল। মতবাদকে আমি কাব্যের অন্যতম উপাদান বলেই জানি। কাব্যের এই উপাদানকেই যাঁরা বৈশিষ্ট্য ব'লে মনে করেন, পৃথক পৃথক কবিতা সম্বন্ধে আলোচনা না ক'রেই তাঁরা সব জড়িয়ে প্রচণ্ড প্রয়াসে একটা তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের সন্ধান করেন। আমি জানি রচনারীতির বৈশিষ্ট্যই কবির আসল বৈশিষ্ট্য।'

অন্য কবির রচনারীতির অনুকরণ বা অনুসরণ না করে কবিশেখর তাঁর কাব্যকলায় যে স্বকীয়তা বজায় রেখেছেন সে কথাটিই তাঁর মূল বক্তব্য 'গ্রন্থকারের নিবেদন' অংশে।

সন্ধ্যামণি কাব্য সংকলনখানি সম্পাদনা করেছেন শ্রীনারায়ণ চৌধুরী। দীর্ঘ সম্পাদকীয় নিবেদনে তিনি যথার্থ ভাবেই কবিশেখরকে রবীন্দ্রোত্তর কাব্যসাহিত্যে ক্ল্যাসিক্যাল ধারার অনুবর্তী কাব্যসাধনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি বলে উল্লেখ করেছেন। শ্রী চৌধুরীর আরেকটি মন্তব্যেরও সমর্থন করতেই হয় যেখানে তিনি বলেছেন, 'আজকালকার বাংলা কাব্য আলোচনায় দেখতে পাই, অগ্রজ কবিদের কাব্যসাধনার সমৃদ্ধ ফলশ্রুতিকে অস্বীকার করবার একটা প্রবণতা যেন অধিকাংশ আলোচনাকেই আবিষ্ট করে রেখেছে। এটি খুবই বেদনাদায়ক ব্যাপার।' অনুরূপ কথাই শ্রীরামপুর টাউন হলে ত্রয়ী সংবর্ধনায় (কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কবিশেখর কালিদাস রায় ও কবি সাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের সংবর্ধনা) সভায় আমি বলেছিলাম বছর চৌদ্দ-পনেরো আগে। কবিশেখর সে সভায় অবশ্য উপস্থিত হতে পারেননি। তবু প্রায় সব বক্তাই কুমুদরঞ্জন ও কালিদাসের পল্লীপ্রবণতা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে উভয় কবির নানা উদ্ধৃতি তুলে ধরায় সেদিনের সভায় এক অপূর্ব প্রশান্তি নেমে এসেছিল।

'চৈতন্যমঙ্গল' রচয়িতা লোচনদাসের বংশোদ্ভব কবিশেখরের কাব্যে স্বাভাবিক ভাবেই প্রকাশ পেয়েছে বৈষ্ণবকবিতার অনুরণন্। জন্মসূত্রেই যে তিনি পেয়ে ছিলেন বৈষ্ণবীয় জীবনাদর্শের অধিকার। সেই অধিকারের জন্যই তো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাঁকে পদাবলী সাহিত্যের ওপর

লীলা বক্তৃতামালার ভাষণ দিতে আহ্বান করা হয়েছিল। তাঁর সেই বক্তৃতার প্রতিদিনের অনুষ্ঠানেই পৌরোহিত্য করেছিলেন ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যের আচার্য শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং কবিশেখরের প্রত্যেকটি ভাষণ তাঁকে অত্যন্ত মুগ্ধ করেছিল। ঐ বক্তৃতাবলী 'পদাবলী সাহিত্য' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে আচার্য শ্রীকুমার গ্রন্থপরিচিতিতে তা অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করে লিখেছেন 'কালিদাসের কাব্যে পদাবলী সাহিত্যের প্রভাব অতি গভীরে প্রায় সর্বব্যাপী।' পদাবলী সাহিত্য সমালোচনায় কবিশেখর যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তার প্রশংসা করে শ্রীকুমার বাবু লিখেছেন, 'রচনার উৎকর্ষ ও স্থায়িত্বের দিক দিয়া কবি কালিদাস সমালোচক কালিদাসকে অতিক্রম করিয়াছেন, ইহা নিঃসন্দেহ; কিন্তু এই সঙ্গে ইহাও সত্য যে, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের দিক দিয়া সমালোচকেরই প্রাধান্য। এইটাই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।'

কবিশেখরের 'কবিতার রস পূর্ণমাত্রায় উপভোগ' করার পর কাব্য সমালোচনার ভিতর দিয়ে তাঁর যে নতুন পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তাতে বিস্মিত এবং পুলকিত হয়েই আচার্য শ্রীকুমার অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।

লোচনদাস, উদ্ধবদাস, গোকুলানন্দ সেন প্রমুখ বৈষ্ণব কবিদের কাছে যে উত্তরাধিকার তিনি পেয়েছেন সে সম্বন্ধেই তাঁর 'উত্তরাধিকার' কবিতায় লিখেছেন—

এঁদের পুঁথির পাতায় পাতায় পেয়েছি যে চিন্তামণি,
তাই রেখে যাই নতুন ছাঁদে, জানি এ ধন চিরন্তনই।।

যাই হোক, কালিদাস রায়ের কাব্য বা সমালোচনা সাহিত্য বিশ্লেষণ এ রচনার লক্ষ্য নয়, তবু স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে খুব স্বাভাবিক ভাবেই মনে পড়ে প্রাচীন কাব্যধারাকে আশ্রয় করে শান্ত ও মধুর রসের সংযোজনে কবিশেখর এমন অপূর্ব সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছেন যার ছন্দ ও সুষমায় আমরা ছাত্র জীবনেই আবিষ্ট হয়ে পড়তাম। তাঁর প্রথম জীবনের রচনা 'বৃন্দাবন অন্ধকার' কবিতাটি এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। কালিদাস রায়ের কবিতার ভাব-ঐশ্বর্য বাঙলা দেশের সরস মাটিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। তাই তো কবিগুরু বলছিলেন, 'তোমার কবিতা বাংলা দেশের মাটির মতই স্নিগ্ধ ও শ্যামল। বাংলা দেশের প্রতি গভীর ভালবাসায় তোমার মনটি কানায় কানায় ভরা—সেই ভালবাসার উচ্ছ্বলিত ধারায় তোমার কাব্য-কানন সরস হইয়া কোথাও-বা মেদুর কোথাও-বা প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। তোমার কাব্যগুলি পড়িলে বাংলার ছায়াশীতল নিভৃত আঙ্গিনার তুলসীমঞ্চ ও মাধবীকুঞ্জ মনে পড়ে।'

বাংলা দেশ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কবিশেখর নিজেই বলেছেন—

সংসারে কি মন লাগে এই পাগ্‌লা দেশে?
ঘরছাড়া ডাক কেবল শুনি সর্বনেশে।

'ঘর করণা মায়ার খেলা'

শুনায় যে ভর দুপুর বেলা
একতারাতে পথ-ভিখারী নিত্যি এসে॥

এই ঘরছাড়া ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে কালিদাস বঙ্গপল্লীর তুলসীতলায় মাথা নুইয়েছেন, মাধবীকুঞ্জে শান্তি পেয়েছেন, গান গেয়েছেন বৈষ্ণব কবিদের সঙ্গে, অনুভব করেছেন শ্রীরাধিকার বিরহ-ব্যথা, ছুটে গেছেন পথে পথে আর আবিষ্কার করতে চেয়েছেন প্রাচীন বাংলা তথা উদাসীন বৌদ্ধ ভারতকে। শান্তিপূর্ণ গার্হস্থ্যজীবনের জন্যে তাঁর আকুল আকাঙ্ক্ষা। 'স্নেহস্মৃতি' কবিতায় তিনি জীবনের ছোটখাট ঘটনা স্মরণ করে বলেছেন—

পাথেয় ফুরায়ে গেছে মোর
বাকি জীবনের লাগি, পুন রক্ষাকবচের ডোর
পথের সম্বলরূপে লভিবারে স্নেহের জগতে
আবার এসেছি যেন দূর দূর কল্পনার পথে
রিক্ত নিঃস্ব অসহায়। শিশু হয়ে চারিপাশে চাই
স্নেহ বিগলিত কণ্ঠে পুন সেই আশীর্বাদ পাই॥

শান্তরসের কবি হলেও দেশের প্রতি একটা আকুলতার সুর কবিশেখরের অনেক কবিতাতেই এমনভাবে পরিব্যাপ্ত যে পাঠকের মনকে তা স্পর্শ না করে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে তাতে গোধূলির বিষাদ থাকলেও আসন্ন সন্ধ্যার প্রশান্তিও আছে। তাঁর শেষ দিকের কবিতায় পুরোনো যুগের অবসানে তাঁর মানসিক বেদনা ও ক্ষোভের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন একটি কবিতায় তিনি লিখেছেন—

বিদায় নিল টুকটুকে সেই আলতা রাঙা পা,
বিদায় নিল সব-বেশনে গামছা মাজা গা।
বিদায় নিল আয়ুষ্মতীর লোহা সিঁদুর শাঁখা,
পথের বাঁকে কলসী কাঁখে পিছন ফিরে থাকা।
রাঙা ঠোঁটে শাঁখ বাজানো এয়োর হুলুধ্বনি,
বিদায় নিল দীঘির ঘাটের চটুল আলাপনী।
চাকায় সিঁদুর উড়িয়ে যখন নিচ্ছে বিদায় রবি,
তাহার সাথে বিদায় নিল কবি॥

প্রাচীন চিন্তাভাবনার সঙ্গে একালের মানুষ যেভাবে সম্পর্ক সংযোগ ছিন্ন করে চলেছে তাতে কবির ক্ষোভের অন্ত ছিল না। কালিদাসের 'কবিতারও সাথে আজ নাই মাটি-মা-টির সংযোগ;' তাঁর 'মাটি' কবিতায় এই বলে কবিশেখর যে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন তেমনি আক্ষেপের সুর তাঁর আরো অনেক কবিতাতেই ধ্বনিত। শুধু তাই নয়, শেষ জীবনের কথাবার্তায় এবং চিঠিপত্রে দাদার সেই বেদনা ও একটা অভিমান প্রকাশ হয়ে পড়ত। এ সবই তাঁর অন্তর্নিহিত দেশপ্রেমসঞ্জাত!

কবিশেখরের কবি প্রতিভা

নারায়ণ চৌধুরী

বাংলা কাব্যসাহিত্যে কবিশেখর কালিদাস রায় একটি সুপরিচিত ও শ্রদ্ধেয় নাম। বাংলার সাহিত্য সংসারে নবীন-প্রবীণ অনেকের সঙ্গেই মেশার সুযোগ হয়েছে কিন্তু এমন নিরভিমান, রাশভার-বর্জিত মহদাশয় খুব কমই দেখেছি। আমাদের যৌবনে বাংলার সাহিত্যসমাজে এই রকমের একটি কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল যে, 'জলধরদাদার' (রায়বাহাদুর জলধর সেন) মতো অজাতশত্রু সাহিত্যিক আর কেউ নেই, সেই কিংবদন্তীর মূলে যথেষ্ট সত্য ছিল। জলধরদাদা চলে যাওয়ার পর তাঁর শূন্যস্থান কেউ যদি সার্থকভাবে পূরণ করে থাকেন তো তিনি শ্রীকালিদাস রায়। বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর কেউ শত্রু আছেন বলে আমি অন্তত জানি না।

আপন অধিকারে সুপ্রতিষ্ঠ গুরুর পদ দেশ থেকে একপ্রকার লোপ পেয়েই গেছে আজকাল, যে কয়জনার মধ্যে সেই মহৎ ঐতিহ্য এখনও টিকে আছে, নিঃসন্দেহে কালিদাস রায় তাঁদের অন্যতম।

আজ কবিশেখরের সাহিত্যকৃতির একটি সাধারণ মূল্যায়নের জন্য লেখনী ধারণ করেছি। এই আলোচনায় তাঁর জীবনীভাগকে আমি বাদ দেব। বর্ধমান জেলার কড়ুই গ্রামে তাঁর পৈত্রিক নিবাস, জন্ম ১৮৮৯ সনের জুন মাস, শিক্ষালাভ করেছেন বহরমপুরে ও কলিকাতায়, শিক্ষকজীবনের আদিপর্বে ছিলেন রংপুর জিলার কোন একটি স্কুলে, পরে দীর্ঘকাল কলিকাতা ভবানীপুরের মিত্র ইনস্টিট্যুশনে শিক্ষকতা করেছেন—এসব বৃত্তান্ত আমার আলোচনার পক্ষে জরুরি নয়। এখানে তাঁর সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের উপরই সবটুকু মনোযোগ নিবদ্ধ করা হবে এবং গদ্যপদ্য উভয় ধারার রচনাই আলোচনার বলয়ের মধ্যে স্থান পাবে।

কবিরচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম 'কুন্দ', এটি তাঁর ছাত্রাবস্থায় প্রকাশিত হয়। তারপর একে একে 'কিশলয়,' 'পর্ণপুট', 'বল্লরী', 'ব্রজবেণু', 'রসকদম্ব', 'লাজাঞ্জলি', 'ক্ষুদকুঁড়া', 'হৈমন্তী,' বৈকালী প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাঁর কাব্য সংকলন গ্রন্থগুলির নাম—'আহরণ,' 'আহরণী', 'সন্ধ্যামণি' এবং 'শ্রেষ্ঠকবিতা'। সর্বশেষ প্রকাশিত সংকলনের নাম 'পূর্ণাহুতি', যা রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছে। এতে তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ের রচিত কবিতাগুলি গ্রথিত। তাঁর গদ্যগ্রন্থ-সমূহের মধ্যে সর্বাধিক প্রসিদ্ধ প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য, বঙ্গসাহিত্য পরিচয়, দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা ও গান, শরৎসাহিত্য। গত কয়েক বছরে দৃষ্টিক্ষীণতার জন্য ভারী প্রবন্ধ নিবন্ধ রচনায় মনোনিবেশ করতে পারেন নি, বিশ্লেষণাত্মক সমালোচনা সাহিত্যের বদলে মধ্যবিত্ত পরিবারজীবনের জীবিকা ও জীবনযাত্রার সমস্যাকে কেন্দ্র করে একাধিক হাল্কা চালের সুখপাঠ্য নিবন্ধ রচনা করেছেন। এই

প্রবন্ধসমূহের গদ্য লঘুভার স্বচ্ছন্দগতি, অনায়াস; বেশীর ভাগ রচনাই অনুলিখনের সাহায্যে গ্রথিত, অর্থাৎ তিনি মুখে মুখে বলে গেছেন, আরেকজন তাঁর কথা লিপিবদ্ধ করে নিয়েছেন। এই জাতীয় নিবন্ধের বইয়ের নাম 'চালচিত্র' 'চণকসংহিতা', 'রঙ্গচিত্র' প্রভৃতি।

প্রথমে তাঁর কাব্যের কথাই বলা যাক।

কবি কালিদাস রায়ের কবিতায় যে ভাবটি সবচেয়ে পরিস্ফুট তা হল বৈষ্ণব ভক্তি ও দীনতার সুর। সেই যে কবিজীবনের প্রারম্ভভাগে তিনি "নন্দপুরচন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার" দিয়ে তাঁর কাব্যের গানের ধুয়া সৃষ্টি করেছিলেন সেই ধুয়াটিই তাঁর গোটা কাব্যসংগীতের সুরে থেকে থেকে বেজে উঠেছে। এরই অনুরণন তাঁর প্রায় সকল কবিতার মধ্যেই পাই, যদিও বৈষ্ণব বিষয়ের কবিতা ছাড়া তিনি জীবনে আরও অনেকানেক বিষয়ে কবিতা লিখেছেন—গাথাকবিতা, আখ্যায়িকা কবিতা, পল্লীবিষয়ক কবিতা, গীতিকবিতা, পৌরাণিক কবিতা, ব্যঙ্গ কবিতা ইত্যাদি। বৈষ্ণবভাব কবি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছেন—বিখ্যাত বৈষ্ণবকবি লোচনদাস তাঁর পূর্বপুরুষ—সুতরাং এই ভাব তাঁর মধ্যে অবলীলায় এসেছে, এজন্য তাঁকে বিশেষ অনুশীলন পরিশীলন করতে হয়নি। আর এই সহজাত বৈষ্ণবসংস্কারের জন্যই দেখা যায় বাংলাদেশের পল্লীগ্রাম যেন কালিদাস রায়ের কবিতায় পবিমূর্ত হয়ে উঠেছে। ছেড়ে-আসা পল্লীর সুখনীড়ে ফিরে যাওয়ার আকুতিতে এবং ফিরে যেতে না পারার ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাসে কবির কবিতা বিধুর। পিছনে ফেলে আসা গ্রামের বাস্তভিটার জন্য এই যে কাতরতা, এই যে 'নস্টালজিয়া,' এই ঐকান্তিক গৃহগতপ্রাণতা অকারণ নয়। কবির মানসগঠনের মধ্যেই এর ব্যাখ্যাসূত্র নিহিত আছে। বাংলার বৈষ্ণবসংস্কৃতি মূলত পল্লীসংস্কৃতি, পল্লীর সুরভি বৈষ্ণব সংস্কৃতির রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবপদকর্তাদের অধিকাংশেরই জন্ম পল্লীবাংলায়, এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। নাগরিক আবহাওয়ায় বৈষ্ণব ভাবের তেমন স্ফূর্তি হয়নি। যে নবদ্বীপ বৈষ্ণব সংস্কৃতির জন্মভূমি তাকে নগর না বলে পল্লীরই একটি উন্নততর, অধিকতর জনাকীর্ণ রূপ বলা যেতে পারে। কাজেই কোনো কবি বৈষ্ণব সংস্কৃতির অনুরক্ত বললে সঙ্গে স্বতঃই বলা চলে যে, তিনি পল্লী-সংস্কৃতিরও অনুগামী।

কালিদাস রায়ের বেলায়ও এ কথার ব্যত্যয় হয় নি। বরং তাঁর বেলায় এ নিয়ম আরও বেশী করে খেটেছে। কেন না স্বভাবতই এই কবি পল্লীঅন্তপ্রাণ। জীবনের একটা মোটাভাগ কলকাতা শহরে কাটালেও তিনি বরাবর আধুনিক জটিলতায় জটে আষ্টেপৃষ্টে বদ্ধ এই বিশাল নগরীতে প্রবাসীর জীবন যাপন করেছেন—অন্তরে অন্তরে তিনি পল্লীর সন্তান, পল্লীর স্নেহের দুলাল, সকলের অগোচরে পল্লীতে মনোজীবনযাপনকারী। আধুনিক নগরজীবনের প্রশ্নসমস্যাজটিলতার স্বরূপ তিনি বুঝতে চান নি, চাইলেও বুঝতে পারতেন কিনা সন্দেহ। কেন না তাঁর মানসিক গঠন ও প্রকৃতি একেবারেই ভিন্ন মেজাজের, সে মেজাজ জুড়ে আছে বাল্যে অর্জিত গ্রামীণ জীবনের সংস্কার আর পল্লীর অমোচনীয় নিসর্গচেতনা। শহরজীবনের দৃশ্যপট ও ঘটনা নিয়ে তিনি কবিতা না লিখেছেন এমন নয়, কিন্তু প্রায়ই সে সকল কবিতার সুর সমালোচনাত্মক কিংবা ব্যঙ্গাত্মক। পূর্ণাহুতি কাব্যগ্রন্থের একাধিক কবিতা এবং 'বেতালভট্ট' ছদ্মনামের আবরণে রচিত বিদ্রূপ-কবিতাগুলি একথার প্রমাণ। অর্থাৎ নগরজীবনকে

আঘাত করাই তাঁর উদ্দেশ্য, সহানুভূতিপ্রবণ অন্তর নিয়ে তিনি আধুনিক সভ্যতার সমস্যাকে বোঝবার চেষ্টা করেননি। যৌবনে তিনি ইংলণ্ডীয় রোমান্টিক কবিকুল ওয়ার্ডসওয়ার্থ কোলরীজ শেলী কীট্স প্রমুখের কাব্যকবিতার সবিশেষ চর্চা করেছিলেন ; তবে একমাত্র ওয়ার্ডসওয়ার্থের কবিতার নিসর্গের সুর ছাড়া ওই গোষ্ঠীর আর কারও কবিতার সুরের অনুরণন তাঁর কাব্যে পাই না। এদিকে রবীন্দ্রপ্রভাবও যে তাঁর মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে কার্যকর হয়েছে তার নিদর্শনও তেমন পাওয়া যায় না। যদিও তাঁকে রবীন্দ্রভক্ত এবং রবীন্দ্র-অনুসারী কবিসমাজের অন্যতম প্রধান বলে গণ্য করা হয়, কিন্তু সংজ্ঞার্থে তিনি রবীন্দ্রভাবের ভাবুক কবি মোটেই নন।

আসলে তিনি নগরচেতনা থেকে স্বয়ং বিচ্ছিন্ন ঐকান্তিক পল্লীপ্রকৃতির কবি। ভারতীয় সনাতন সংস্কৃতি আর বাংলা কাব্যের দীর্ঘদিনের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য তাঁর পল্লীচেতনার মূলে নিরন্তর শক্তি জুগিয়েছে। জাতীয় সংস্কৃতির স্তন্যরসে এই কবির অন্তর্জীবন লালিত বর্ধিত হয়েছে এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই সংস্কৃতিরই অঞ্চলসংলগ্ন হয়ে তিনি আছেন। ভারতীয় ঐতিহ্যের আদর্শের প্রতি তাঁর নিবিড় নিষ্ঠা যুগপৎ তাঁর শক্তিমত্তা ও অপূর্ণতার দ্যোতক। শক্তিমত্তা এই কারণে যে, জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ মনোভাব ব্যতিরেকে মাতৃভাষায় আর যে কিছুরই চর্চা সম্ভব হোক-না কেন, কাব্যচর্চা করা চলে না। অপূর্ণতা এইজন্য যে, কবি কালিদাস রায় শুধু জাতীয় ভাবেরই চর্চা করেছেন, আধুনিক ভাবেব চর্চা তেমন ভাবে করেন নি! শুধু যে কাব্যের আঙ্গিকের দিক দিয়েই এ কথা প্রযোজ্য তাই নয়, মনোভঙ্গীর দিক দিয়েও। এ কবির মনের গড়ন আশ্চর্য সরল, একমেটে, জটিলতার চিহ্ন বিহীন। আধুনিক কালোচিত মানসকূট, সন্দেহ সংশয়, আত্মিক যন্ত্রণা, দ্বিধা দ্বন্দ্ব কিছুরই কোনো ছাপ পড়েনি এই কবির কাব্যশরীরের উপর। এটাকে তাঁর কাব্যের একটা ঐশ্বর্য বলে ভাবতে পারতুম যদি আজ থেকে সত্তর আশি বছর আগে তাঁর কাব্যকবিতাগুলিকে আমরা পেতুম। কিন্তু এখনকার কালে বাস করব অথচ একালের দ্বিধাদ্বন্দ্বের চেতনার দ্বারা কাব্যদেহকে সংস্পৃষ্ট করব না এটাতে তথাকথিত আধুনিকতার কতকটা বিচ্যুতি ঘটে। 'আধুনিকতা' কথাটাকে এখানে তার শ্রেষ্ঠ অর্থে ধরছি, তার চলতি চটুল পথে নয়। আধুনিকতার শ্রেষ্ঠ অর্থে মাইকেল মধুসূদন আধুনিক কবি, রবীন্দ্রনাথ আধুনিক কবি, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত-মোহিতলাল-নজরুল আধুনিক কবি ; কিন্তু কালিদাস রায় বা কুমুদরঞ্জন মল্লিক নন। কালিদাস রায়ের চিন্তাকল্পনা একান্তভাবেই পুরাতন পৃথিবীকে ঘিরে আবর্তিত। বিগত জীবনের জন্য কেবলই তাঁর কবিতায় দীর্ঘশ্বাসের উদ্বেলতা, কেবলই হা-হুতাশা, কেবলই ক্ষোভখিন্ন হাহাকার ; আধুনিক জীবনের হাহাকার, জটিল মননের অনুধাবনে তিনি অপারগ।

কালিদাস রায়ের কবিতায় যদি কেবল পুরাতন পৃথিবীরই স্বাদ লেগে থাকে, কেবল ভারতীয় চেতনারই অভিপ্রকাশ ঘটে থাকে, আধুনিক যুগোচিত চিন্তনমননের রেখাপাত যদি তাতে না হয়ে থাকে, তা হলে তাঁর কবিতার উৎকর্ষের প্রমাণ কিসে? উৎকর্ষের প্রমাণ তাঁর রচনার প্রকরণে, তাঁর আঙ্গিকের পরিচ্ছন্নতায়, তাঁর ভাষার পারিপাট্যে ও প্রাঞ্জলতায়, সর্বোপরি ওই পরিচ্ছন্ন ভাষাদেহের অন্তরালবর্তী প্রজ্ঞাভূয়িষ্ঠ একটি জ্ঞানী মনের অস্তিত্বে। ক্লাসিক বা চিরায়ত কবিদের অনেকগুলি চারিত্রলক্ষণ এই কবির কবিতায় প্রতিফলিত, ধ্রুপদী কবিদের মতো তেমনি এই কবির কবিতায় ফর্মের পরিচ্ছন্নতা ও উজ্জ্বলতা, অর্থবোধের স্পষ্টতা, শব্দবৈদগ্ধ্য, ছন্দোনৈপুণ্য, মিলের স্পষ্টতা, বস্তুমুখীনতা

বহির্মুখীনতা এবং সব কিছুকে ছেয়ে থাকা অন্তর্গূঢ় জ্ঞানের সংস্কার। আধুনিক কবিতার অন্য যত গুণই থাকুক, পাঠকের বোধবুদ্ধিকে বিপর্যস্ত করবার পক্ষে আধুনিক কবিতার তুল্য মোক্ষম বস্তু আর কিছু নেই। কিন্তু কবিশেখরের কবিতার রীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তা পাঠকের সহজ লজিককে অস্পষ্টতার কুয়াসার মধ্যে ফেলে বিভ্রান্ত করে না, অস্বচ্ছ বাতাবরণের বায়ুশূন্যতার মধ্যে ফেলে তার হাঁপ ধরায় না। কবিতার ভাষা যদিও গদ্যের ভাষা থেকে পৃথক এবং আক্ষরিক স্পষ্টতা অপেক্ষা ব্যঙ্গার্থ অর্থাৎ ব্যঞ্জনার দিকে তার ঝোঁক, তা হলেও সে ভাষা হযবরল-ধর্মী নয়, তারও একটা নিজস্ব যুক্তিক্রম আছে। এখনকার কালের যেসব কবি হেঁয়ালির ভাষায় কবিতা লেখেন এবং আত্যন্তিক মাত্রায় আত্মরতিপ্রিয়, রোমান্টিক নৈরাজ্যের পক্ষপাতীও, তাঁদের রচনায় এই যুক্তিক্রম পদে পদে লঙ্ঘিত। ফলে রস জমে উঠতে পায় না, পাঠকচিত্তে কবির আবেগের কোন সংক্রমণ হয় না; কবিতা, বিশেষত গীতিকবিতা, ব্যক্তিমনের আশা আকাঙ্ক্ষার দর্পণ হলেও তা তার স্বেচ্ছাচারী মনের প্রতিচ্ছবি নয়। আধুনিক কবিদের একটা অংশ এ কথাটা বুঝতে চান না বলেই যত রাজ্যের ছিং টিং ছট মার্কা রচনায় আধুনিক কবিতার অঙ্গন ভরে এলো। কবিশেখরের কবিতা এই ক্ষেত্রে একটি অত্যুজ্জ্বল ব্যতিক্রম, আধুনিক কাব্যের অতিরিক্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, উচ্ছৃঙ্খলতা নৈরাজ্যের প্রতিষেধক দৃষ্টান্ত রূপে তাঁর কবিতার অশেষ কার্যকারিতা।

উপরে কবির কবিতার যে লক্ষণ বর্ণনা করা হল সেই নজিরে কোন-কোন সমালোচক কালিদাস রায়কে বিশিষ্ট কবি আখ্যা দিতে দ্বিধান্বিত। তা যদি হয় তো অধিকাংশ ক্লাসিক কবিরই 'অকবি' আখ্যায় বাতিল হবার সম্ভাবনা। কেন না ব্যক্তিকেন্দ্রিক অস্পষ্টতা তাঁদের কারুরই কাব্যলক্ষণের অন্তর্গত নয় এবং তাঁদের সকলেরই কবিতা পরিচ্ছন্ন ছিমছাম, বহির্মুখী, বস্তুনিষ্ঠ। কবির 'সন্ধ্যামণি' কবিতা সংগ্রহের ভূমিকারূপে গ্রথিত কাব্য পরিচিতি অংশে আমি দেখিয়েছি, রচনাশৈলী আর আঙ্গিকের দিক দিয়ে কালিদাস রায় ইংলণ্ডের ড্রাইডেন আর পোপের সঙ্গে তুলনীয় কবি। অষ্টাদশ শতকীয় ইংরেজ কবি ড্রাইডেন আর আলেকজাণ্ডার পোপকে একসময়ে গদ্যধর্মী কবি বলে নস্যাৎ করবার একটা প্রবণতা কাব্য সমালোচকদের মধ্যে বলবৎ ছিল। কিন্তু কালের চাকা ঘোরবার সঙ্গে সঙ্গে কাব্যসমালোচনার 'নর্ম'ও বদলে গেছে। এ যুগের সমালোচকেরা ড্রাইডেন আর পোপকে অখ্যাতির অন্ধকার থেকে উদ্ধার করে তাঁদের সত্যিকারের প্রাপ্য কবিমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। যা তাঁদের কাব্যের দুর্বল অংশ বলে মনে করা হয়েছিল, নব মূল্যায়নের আলোকে তাই তাঁদের শক্তিমত্তার প্রমাণ বলে নির্দেশিত হয়েছে। তাঁদের কাব্যের স্পষ্টতা ও পারিপাট্য তাঁদের কাব্যের অনুকূল গুণ বলে চিহ্নিত হয়েছে। মনে হয় এই প্রতিতুলনা কালিদাস রায়ের কাব্যের বেলায়ও সর্বাংশে প্রযোজ্য। আজ যারা তাঁকে ক্লাসিফায়ারের অধিক সম্মান দিতে চাইছেন না, মূল্যমানের পরিবর্তনহেতু তারাই আবার একদিন তাঁকে মাথায় তুলে নাচবার আকুলতা বোধ করতে পারে। কাব্যসাহিত্যের ইতিহাসে এ-জাতীয় রুচিবিবর্তনের নজির বিরল নয়। আর তাদের বিচারকেই বা কে পাত্তা দিচ্ছে? জনগণ কবিশেখরকে তাদের নিজের অতি আপনজন, মনের কবি বলে বহুদিনই স্বীকার করে নিয়েছে।

উদ্ধৃত কবিতাটিতে কবি-বৈশিষ্ট্যের দুই দিক, দৃষ্টিভঙ্গী ও রচনাশৈলী প্রতিফলিত হয়েছে বলে এটিকে একটি প্রতিনিধিস্থানীয় কবিতা মনে করা যেতে পারে—

আরতি বাদ্যের ধ্বনি দূর হতে সন্ধ্যায় প্রভাতে
ভেসে আসে কভু ভোর রাতে,
বড়ই মধুর লাগে করি করজোড়
নিঃশব্দে প্রণাম করি দেবতারে মোর।
নগরমন্দিরে যবে ঘড়ি ঘন্টা কাঁসর ঝাঁঝর
এক সাথে বেজে উঠে প্রাণ মোর করে ধড়ফড় ॥
বড়ই মধুর কান্ত দেবতা আমার
মাধুর্যের সে যে অবতার,
বাঁশরীর দেবতা সে, কাঁসরীর দেবতা সে নয়।
কুঞ্জের নাগর সে যে, গঞ্জের নাগরে করি ভয়।
যা-কিছু মধুর বিশ্বে তারই মাঝে তাঁরে আমি পাই।
রাজসিক কোলাহলে হট্টগোলে তাহারে হারাই। [আমার দেবতা]

নিম্নোদ্ধৃত কবিতাংশটিও কবির মনোভঙ্গীর বৈশিষ্ট্যজ্ঞাপক—

সুখ যদি দিতে হয়, দাও তবে দয়াময়,
নিয়ে গিয়ে এমন জগতে—
যেখানে না শুনি যেন করুণ কাতর হেন
আর্তনাদ হায়, পথে পথে।
সেথা যেন চারিধারে গৃহগুলি হাহাকারে
উল্লাসের ধিক্কার না হানে ;
যেন কাঙালিনী মেয়ে দ্বারে নাহি রয় চেয়ে
আমাদের উৎসবের পানে ॥ [আকিঞ্চন]

উদ্ধৃত কবিতাংশদ্বয়ের প্রথমটি 'পূর্ণাহুতি' থেকে নেওয়া। পূর্ণাহুতি থেকে আরও একটি কবিতাংশ তুলে দিচ্ছি যার থেকে কবির বিশিষ্ট মনোভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যাবে। এ পুরাতন প্রীতি ও আধুনিক জীবনরীতির সমালোচনায় এক সুন্দর যুগ্ম নিদর্শন—

সেবা তাদের ধর্ম ছিল, বিদ্যা ছিল স্নেহে।
হাতে তাদের তালের পাখা, ভরা কলস কাঁখে
রান্নাঘরের ধোঁয়া তাদের রঙ দিল দুই আঁখে।
গৃহাশ্রমের তপস্বিনী, তাদের তপের ফলে
সভ্য বলে গণ্য মোরা হলাম ধরাতলে।
ক্ষয়ে-যাওয়া তাদের শাঁখা ঘর্মকণা-পাতে
আজকে হল সোনার ঘড়ি মহিলাদের হাতে।
তাদের শোণিতধারাই আজো বইছে রূপান্তরে
ভুললে তা আজ চলবে কেন ? ভুলে তা বর্বরে।

খড়োঘরের লক্ষ্মী তারা ষষ্ঠীবটের ছায়
প্রণাম জানাই পাদুকাহীন তাদের ধূলিপায় ॥ (প্রাচীনা)

কবির গভীর ঈশ্বরানুভূতির প্রকাশে 'প্রণাম' কবিতাটি ভাবগাঢ় হয়ে উঠেছে। তার শেষাংশ তুলে দিচ্ছি—

প্রণাম তোমায় জানাই প্রভু ভূধরে ভূধরে
যেথায় তোমার স্নেহের ধারা নামে,
প্রণাম তোমায় জানাই প্রভু সাগরে সাগরে
যেথায় তোমার স্তব কভু না থামে ॥
প্রণাম তোমায় জানাই প্রভু নদীর তটে তটে
ঘটে ঘটে যেথায় তৃষা হরো।
প্রণাম তোমায় জানাই প্রভু প্রতি অশথ বটে
তপ্ত তনু যেথায় শীতল করো ॥
প্রণাম তোমায় জানাই প্রভু প্রতি তৃণাঙ্কুরে
লভে জীবন যেথায় মাটির ধূলি,
প্রণাম আমার ছড়িয়ে দিলাম সারা ভুবন জুড়ে
জানি আমি নেবেই নেবে তুলে ॥

সর্বশেষে কবির একটি স্বীকৃতিমূলক কবিতার চার লাইন তুলে দিচ্ছি যাতে তাঁর কাব্যাদর্শনের স্বীকৃতি রূপ পেয়েছে। কবিতার নামও 'স্বীকৃতি'।

ভক্ত আমি নই,
অজানার উদ্দেশে আমি প্রাণের কথা কই।
নরনারীর প্রেমের কথাই ব্রজলীলার ছলে
গেয়ে গেছি জানি না হায় ভক্তি কারে বলে ॥

কবির সমালোচনা-গ্রন্থগুলির মধ্যে তিন ভাগে প্রকাশিত 'প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য' সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান যে কতো গভীর ও বিস্তৃত এ গ্রন্থে তার সাক্ষ্য মিলবে। এর প্রথম ভাগে চর্যাপদ, বিদ্যাপতি, কৃত্তিবাস, বড়ু চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, দুই চণ্ডীদাস, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মঙ্গলকাব্য, রামেশ্বরের শিবায়ন প্রভৃতি এবং দ্বিতীয় ভাগে বিভিন্ন কবির রচিত মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল, কাশীরাম দাস, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, ময়মনসিংহ-গীতিকা প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন। প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য তিনি কী গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করেছেন এই গ্রন্থত্রয়ের ভিতর তার সাক্ষ্য মিলবে এবং এ থেকে আরও বুঝতে পারা যাবে তাঁর কাব্যপ্রেরণার উৎস কোথায় নিহিত। আমি কবিকে ভারতীয় সংস্কৃতি ও বাংলা কাব্যের দীর্ঘকালীন ঐতিহ্যের সুন্দরসধারাপুষ্ট কবি বলে অভিহিত করেছি। এই বর্ণনার সত্যাসত্য যাচাই করে নেওয়া যাবে এই বই তিনটি থেকে। তিনি প্রাচীন বাংলা কাব্যের স্বাদে গন্ধে ভরপুর কবি বললেও অত্যুক্তি হয় না। এই ওতপ্রোততাই তাঁর শক্তির নিশানা।

পাঁচখণ্ডের 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়' বইয়ে আছে ইংরেজ-অভ্যুদয়ের পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের অর্থাৎ সংজ্ঞার্থে আধুনিক সাহিত্যের রথী-মহারথীদের সম্বন্ধে আলোচনা। দুই খণ্ডের 'শরৎসাহিত্যে' আছে শরৎচন্দ্রের বইগুলির গ্রন্থ-ওয়ারি আলোচনা—প্রতি গ্রন্থের আখ্যানাংশ সমেত।

কবি কালিদাস রায়ের গদ্য স্টাইল পরিচ্ছন্ন, সংহত, যথাযথ অর্থপ্রকাশক। তাঁর গদ্য গদ্যের চালেই চলে, কবি গদ্য লিখলে যেমন হয়, সেরূপ কাব্যঘেঁষা চালে নয়। তাঁর কবিতায় যেমন ছিমছাম পারিপাট্য, তাঁর গদ্যও তেমনি পরিপাটি গঠনশিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। একজন প্রথম শ্রেণীর বৈয়াকরণের চারিত্রধর্ম এই রচনায় ষ্টাইলে প্রতিফলিত। বাংলা সাহিত্যে বর্তমানে ব্যাকরণজ্ঞানী খুব কমই আছেন। যে ক'জন আছেন তাঁদের মধ্যেও তাঁর স্থান অনেকের উপরে। তিনি এই ক্ষেত্রে শীর্ষস্থানের অধিকারী বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না। বস্তুতঃ প্রসিদ্ধ ছান্দসিক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় দৈনিক সংবাদপত্রের বাংলা বানান সম্পর্কিত এক বিতর্ক প্রবন্ধে কালিদাস রায়কে শ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণের সম্মান দিয়েছেন। ছান্দসিকের সঙ্গে ব্যাকরণবিদের সম্পর্ক বৈজ্ঞানিক মেজাজের সাজুয্যে। সুতরাং ছান্দসিকের অভিমত বলেই এ অভিমতের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। আজকাল তো বাংলা গদ্যের ষ্টাইলের ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই স্ব স্ব প্রধান, কেউ কারও আনুগত্য স্বীকার করতে চান না। কোন ষ্ট্যাণ্ডার্ড গদ্যরীতিও নেই যার মান্যতা সকলের পক্ষে আবশ্যিক। আমার ধারণা এই ক্ষেত্রে কালিদাস রায়ের গদ্য নূতন লেখক মাত্রের পক্ষেই শিক্ষণীয় হতে পারে, তাঁর গদ্যের চাল সজ্ঞানে অনুশীলন ও অনুকরণ করলে অন্বয়বিন্যাসে বিশৃঙ্খলা, শব্দব্যবহারে অযত্নপ্রসূত শৈথিল্য, অর্থপরিস্ফুটনে যাথাযথ্যের অভাব ইত্যাদি দোষ কেটে যাবে। তিনি সারাজীবন বৃথা শিক্ষকতা করেন নি! শিক্ষকতার সূত্রে ব্যাকরণের শিক্ষাটি পাকা করে নিয়েছিলেন।

প্রসঙ্গতঃ বলি এ কবির জীবনের এক ট্রাজিডি, যিনি এম. এ. পরীক্ষাপত্র এবং ডক্টরেটের থীসিস পরীক্ষার সর্বাংশে যোগ্য ছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর দায়িত্বযুক্ত অধ্যাপকের পদে আসীন হলেই যাঁকে সবচেয়ে ভাল মানাত, তাঁকে সারাটা জীবন এক মাধ্যমিক স্কুলের প্রেরণাহীন পরিবেশে ঘ'সে ঘ'সে জীবন কাটাতে হয়েছে। এ জন্য তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষার তাড়নার অভাব হয়তো কতকটা দায়ী, কিন্তু আমাদের দেশের সমাজস্থিতিও এর জন্য কম দায়ী নয়। এ দেশে তেলো মাথায় তেল দেওয়াটাই রীতি, একজন সত্যিকারের গুণীর জীবন অবহেলার অন্ধকারে অবসিত হয়ে গেলেও কারও কিছু যায় আসে না। সান্ত্বনা এই, ডক্টর সুশীলকুমার দে এবং মোহিতলাল মজুমদার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালে ঐ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁর কাছে থীসিস পরীক্ষার ডাক এসেছিল, কিন্তু বাংলা সাহিত্যের প্রধান প্রধান গুণীদের সম্পর্কে কলকাতার সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানকার্পণ্য কি কোনোদিনই ঘোচবার নয়?

কালিদাস রায়ঃ জীবন ও সাহিত্য

ডঃ সুশীলকুমার গুপ্ত

রবীন্দ্রযুগে রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রভাবিত হয়েও যে স্বল্পসংখ্যক কবি স্বকীয়তার উজ্জ্বল পরিচয় দিতে সমর্থ হয়েছেন তাঁদের মধ্যে কবিশেখর কালিদাস রায় নিঃসন্দেহে অন্যতম। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ কবিদের ন্যায় কবিশেখরও রবীন্দ্রনাথের দ্বারা সংশয়াতীতভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাই বলে তাঁকে রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের অন্তর্ভুক্ত করে শুধু রবীন্দ্রমণ্ডলীর সদস্য হিসাবেই চিহ্নিত করলে তাঁর প্রতি মারাত্মক অবিচার করা হবে। 'অনুসারী' কথাটির মধ্যে মৌলিকত্বের ন্যূনতা বড় বেশী প্রকট। কিন্তু কবিশেখরের কাব্যের বহিরঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যে পরিমাণে পড়েছে তাঁর কাব্যের অন্তরঙ্গে তার তুলনায় অনেক কম দেখা যায়। ছন্দ, শব্দ, ভাষা ইত্যাদির সহযোগে কাব্যের বহিরঙ্গ গঠিত হয় এবং এই বহিরঙ্গের দেউড়ি দিয়েই অন্তরঙ্গে প্রবেশের ব্যবস্থা থাকে। অনেক সময় বহিরঙ্গের রূপ অন্তরঙ্গের পরিচয়ে নানা বিভ্রান্তি ঘটায়। কবিশেখরের কাব্যের বহিরঙ্গের উপরকার রবীন্দ্রপ্রভাব তাঁর কাব্যের অন্তরঙ্গের যথাযথ পরিচয় লাভের পথে কতকটা বাধা সৃষ্টি করেছে। তাঁর কাব্যের অন্তরঙ্গের মৌলিকত্বের প্রকৃত মূল্যায়নের অভাবে তাঁকে সরাসরি রাবীন্দ্রিক বলে দায় সারা হয়েছে। কিন্তু একটু সতর্কতার সঙ্গে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে বিষয়বস্তু ভাবভাবনায় গঠিত অন্তরঙ্গের বিচারে কবিশেখর তাঁর সমসাময়িক অন্য অনেক কবির তুলনায় রবীন্দ্রনাথ থেকে লক্ষণীয় স্বতন্ত্রতা দেখাতে সমর্থ হয়েছেন।

কবিশেখরের কাব্যের বহিরঙ্গে যে রবীন্দ্রভাবের কথা বলা হল তার মানে এ নয় যে কাব্যের বহিরঙ্গনির্মাণে তাঁর স্বকীয়তা অনুপস্থিত। এই কথাই বোঝাতে চেষ্টা করা হয়েছে যে বহিরঙ্গের তুলনায় অন্তরঙ্গগঠনে তাঁর স্বাতন্ত্র্য অধিক মাত্রায় পরিস্ফুট হয়েছে। বিষয়বস্তুর উপর নির্ভরশীল অন্তরঙ্গে কবির বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর লৌকিক জীবনবোধ, গার্হস্থ্যভাবনা পল্লীপ্রেম, বৈষ্ণবানুভূতি, প্রাচীন আদর্শের মূল্যচিন্তা, যুগচেতনা ইত্যাদি নিঃসন্দেহে মৌলিকত্বের দাবি করে। এইসব দিক দিয়ে তাঁর কাব্যে ক্ল্যাসিক্যাল মনোভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং তা রবীন্দ্রনাথের মূলত রোমান্টিক মানসিকতা থেকে পার্থক্য সূচিত করেছে। কবিশেখরের রোমান্টিক কবিতার সংখ্যা খুব কম নয়। যেখানে তিনি রোমান্টিক, সেখানে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তাঁর উপর বেশী মাত্রায় পড়েছে। এই দিক দিয়ে কুমুদরঞ্জন মল্লিকের সঙ্গে তাঁর সমধর্মিতা বিশেষভাবে প্রতিভাত হয়। যতীন্দ্রমোহন বাগচী, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ও কিরণধন চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা ভাবে ও আঙ্গিকে রোমান্টিকধর্মী। মোহিতলাল মজুমদার

ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মনোভঙ্গি প্রধানত রোমান্টিক হলেও তাঁরা প্রকাশভঙ্গিমায় ক্লাসিক্যাল রীতির প্রবর্তনে উৎসাহী হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য তাঁদের এই উৎসাহের পিছনে ছিল রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী রোমান্টিক প্রভাব থেকে স্বকীয়তা রক্ষার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। মোহিতলালের তান্ত্রিক মনোভাব ও যতীন্দ্রনাথের বৌদ্ধবোধের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বৈপরীত্য সৃষ্টির প্রয়াস থাকলেও তাঁদের মধ্যে রোমান্টিকতার প্রেরণাই প্রবল। কাব্যপ্রকাশরীতিতে ক্লাসিক্যাল ভঙ্গির আশ্রয়ের ক্ষেত্রে মোহিতলাল ও যতীন্দ্রনাথের সঙ্গে কবিশেখরের সাযুজ্য সহজেই চোখে পড়ে। তবে তাঁর কাব্যের বহিরঙ্গে ক্লাসিক্যাল রীতিচর্চার চেষ্টা থাকলেও তাঁর অন্তরঙ্গেই এই ক্লাসিক্যাল মনোভাব বেশী। বহিরঙ্গের ছন্দে, শব্দচয়নে, পদবিন্যাসে কবিশেখর রবীন্দ্রনাথের দ্বারা যথেষ্টমাত্রায় প্রভাবিত হয়েছেন। তবে ক্লাসিক্যাল মনোভঙ্গির জন্য বহিরঙ্গেও তাঁর স্বকীয়তা পরিস্ফুট। বাঙলা সাহিত্যের দুটি প্রধান ধারা গীতিকাব্য ও মঙ্গলকাব্যের মধ্যে কবিশেখর মঙ্গলকাব্যের লৌকিকভাব ও মানববোধের দ্বারা বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং এই জন্য কি ভাবে কি প্রকাশরীতিতে তাঁর ক্লাসিক্যাল মানসিকতা গঠিত হয়ে উঠেছিল—এই প্রসঙ্গে কবিশেখরের 'আহরণ' কাব্যসংকলনে 'সম্পাদকের নিবেদনে সম্পাদক কবি সমালোচক মোহিতলালের যে মন্তব্যটি গ্রন্থের অন্যতম ভূমিকা স্বরূপ বলে উল্লেখ করেছেন সেটি সতর্কতার সঙ্গে অনুধাবন করা যেতে পারে। মোহিতলালের মন্তব্যটি হচ্ছে,

"কালিদাসবাবু রবীন্দ্রযুগের ছন্দোনৈপুণ্য মাত্র আশ্রয় করিয়া প্রাচীন বাংলার কাব্যধারাটিকে নবীন করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার বাগবৈদগ্ধ্য ও অলঙ্কারপ্রীতি যেমন সংস্কৃতের অনুরূপ, তেমনি সরল অকপট অনুভূতির সহিত অর্থগৌরব মিলিয়া তাঁহার কাব্যে খাটি ক্লাসিক্যাল ভঙ্গী ফুটিয়া উঠিয়াছে। এতদ্‌ব্যতীত তিনি তাঁহার কবিতাগুলিতে বাঙ্গালীসুলভ ভাবাকুলতা এবং বাংলার পল্লীজীবনের অন্তরবাহিরের রূপমাধুরীও পরিবেশন করিযাছেন, প্রাচীন বৈষ্ণবকবিদের প্রভাবও অল্প নহে। এই সকল গুণের সমবায়ে কবি কালিদাস রায়েব কবিতা যেমন লোকপ্রিয়তা, তেমনি একটি সহজ স্বকীয়তা অর্জন করিয়াছে।"

মোহিতলাল যাকে খাটি ক্লাসিক্যাল ভঙ্গি বলেছেন তা কবিশেখরের কাব্যের এক অংশের সম্বন্ধে প্রযোজ্য। আমার মনে হয়েছে তাঁর বেশির ভাগ কবিতায় ক্লাসিক্যাল ও রোম্যান্টিক মনোভঙ্গির একটা সমন্বয় প্রচেষ্টা ছিল। যেখানে তিনি ক্লাসিক্যাল গঠনরীতিকে বেশি করে অবলম্বন করে কাব্য রচনা করতে সমর্থ হয়েছেন সেখানেই তিনি সর্বাপেক্ষা বেশী স্বার্থকতা ও স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছেন। কিন্তু যেখানে তাঁর কাব্যে রোমান্টিক ভাব ও রীতি প্রাধান্য পেয়েছে সেখানে তাঁর উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বেশী মাত্রায় বিদ্যমান। কবিশেখরের কবিমানসগঠনে সংস্কৃতসাহিত্য ও অলঙ্কারশাস্ত্র, বৈষ্ণব কাব্য, বাংলা লোকসাহিত্য, বিশেষ করে মঙ্গলকাব্য, ইংরেজী ক্লাসিক্যাল ও রোম্যান্টিক কবিতা, মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের কাব্যের ক্রিয়াশীলতা উপলব্ধি করা যায়। আত্মজ্ঞান, আত্মসংযম, বাস্তববোধ, মানবানুভূতি, আলঙ্কারিক অনুশাসন, ঐতিহ্যপ্রীতি ইত্যাদির দিক দিয়ে তিনি যেমন ক্লাসিক্যাল মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন, তেমনি প্রেম ও প্রকৃতির মধ্যে আধ্যাত্মিক অনুভূতি, বিষণ্ণতাবোধ, বিরহব্যাকুলতা প্রভৃতির মধ্যে তাঁর রোমান্টিক মানসিকতা ফুটে উঠেছে। রোমান্টিক ও ক্লাসিক্যাল মনোভাবের সমন্বয় চেষ্টায় তাঁর ক্লাসিক্যাল প্রবণতাই লক্ষ্য করা যায় এবং এইখানেই তাঁর স্বকীয়তা,

সবচেয়ে বেশি ব্যক্ত হয়েছে। তাঁর স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ত ও অনাড়ম্বর ভাবাবেগের অলঙ্কৃত প্রকাশে ক্ল্যাসিক্যাল কবিদের প্রভাব স্পষ্ট। আর ছন্দ, শব্দচয়ন, ভাষা ইত্যাদির দিক দিয়ে দেশী ও বিদেশী রোমান্টিক কবিদের সঙ্গে তাঁর সহধর্মিতা লক্ষ্য করা যায়। এই ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তাঁর উপর অধিক মাত্রায় ক্রিয়াশীল হয়েছে।

কোনো-কোনো সমালোচক কবিশেখরকে প্রধানত বৈষ্ণব কবি ও 'পল্লীকবি' বলে চিহ্নিত করে তাঁর কাব্যের পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়নে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এর অনিবার্য ফলস্বরূপ এই সব সমালোচকদের কাছে তাঁর কাব্যের সর্বাঙ্গীণ রূপ ফুটে ওঠেনি। এ বিষয়ে কবিশেখর তাঁর 'আহরণী' কাব্যসংকলনের ভূমিকায় যা বলেছেন তা বিশেষভাবে অভিনিবেশ দাবি করে। তিনি একটু মনঃক্ষুণ্ণ হয়েই লিখেছেন—

"যৌবনকালে কতকগুলি বৃন্দাবনলীলার কবিতা ও পল্লীকবিতা রচনা করিয়াছিলাম—আজো আমাকে সকলে বৈষ্ণবকবি ও পল্লীকবি বলিয়াই জানে। মিত্র-ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত 'কথাসাহিত্য' পত্রিকার কালিদাস-সংবর্ধনা সংখ্যায় আমার অনুরাগী বন্ধুরা আমাকে প্রধানত বৈষ্ণব কবি বলিয়াই অভিনন্দিত করিয়াছেন। পর্ণপুট ও ব্রজবেণু রচনার পর ৩৭ বৎসর ধরিয়া নানা শ্রেণীর কবিতাই লিখিয়াছি। চারিপাশের সামাজিক জীবনকে আমি এড়াইয়া চলি বলিয়াও একটা জনরব শুনি। শুধু পুরাতন কথাই নতুন ছাঁদে ব্যক্ত করি—ইহাও অনেকের ধারণা। এই সংকলনটি বোধ হয় লৌকিক ধারণার কিছু পরিবর্তন ঘটাইতে পারে।"

কবি যে বিভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন সেগুলির মধ্যে ব্রজলীলা ও পল্লীজীবন নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে এবং এই দুই বিষয়ের ক্ষেত্রে তাঁর বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয় মাত্রায় প্রতিভাত হয়েছে কিন্তু তাই বলে তাঁকে শুধু 'বৈষ্ণব কবি' ও 'পল্লীকবি' হিসাবে চিহ্নিত করলে তাঁর প্রতি মোটেই সুবিচার করা হবে না। তিনি ব্রজলীলা ও পল্লীজীবন ছাড়াও প্রাচীন বঙ্গ ও ভারত, মানবিক প্রেম ও প্রকৃতি, গার্হস্থ্য জীবনের মাধুরী ও বেদনা, অতীত স্মৃতিচারণ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে বহু কবিতা লিখেছেন এবং এগুলির মধ্যে বেশ কিছুসংখ্যক কবিতা কবিশেখরের স্মরণীয় কবিকৃতি হিসাবে উদাহৃত হতে পারে।

কবিশেখরকে 'বৈষ্ণব কবি' বলে অভিহিত করার পিছনে তাঁর পারিবারিক পরিচয় অনেক পরিমাণে উৎসাহ জুগিয়েছে। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে কবিশেখরের পিতৃ ও মাতৃ এই উভয় কুলই বৈষ্ণবসমাজে বিশেষভাবে পরিচিত এবং এই উভয়কুলের ভাবধারায় তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন। খাঁটি বৈষ্ণবের বিনয়, নম্রতা ও সরলতা তাঁর কাব্যের মধ্যে আস্বাদন করা যায়। কিন্তু তাঁর কাব্যে নিছক বৈষ্ণবভাববিহ্বলতা ও আত্মনিবেদন নেই। তিনি বৃন্দাবনলীলার মাধুরী আস্বাদনের মধ্যেও জীবন ও জগৎ সম্পর্কে এক উদাসীন বৈরাগী ভাব অবলম্বন করেন নি। প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণব-ভাবের মধ্যে তিনি মানবলোক ও যুগজীবনের আর্তি ফুটিয়ে তুলেছেন। বৈষ্ণবরসমাধুরীকে মানববোধ ও যুগযন্ত্রণার মধ্যে আস্বাদন করে এক সহজ, গভীর ও আন্তরিক সুরসৃষ্টিতেই তিনি উৎসাহী হয়েছেন। বৈষ্ণবভাবের এই যুগোচিত রূপায়ণে তাঁর বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন বিদ্যমান। বর্তমান যুগের বেদনা, হতাশ্বাস ও নিপীড়ন থেকে উদ্ধারের জন্য কৃষ্ণের উদ্দেশে 'ব্রজবেণু' কাব্যগ্রন্থের 'জন্মাষ্টমী' কবিতায় তিনি বলে উঠেছেন—

জন্ম তব কারাগারে আবির্ভাব অন্ধকারে,
আলোকিত সৌধ না। তব জন্মভূমি,
যেখানে বন্ধনভয় উপদ্রব লভে জয়,
অবতীর্ণ যুগে যুগে সেখানেই তুমি।
রক্ষিবারে সাধুগণে দুষ্কৃতির বিনাশনে,
আবার মর্ত্যের হও, হে আদিপুরুষ
অবোধ কাঙাল যারা স্তন্য-অন্ন দানে তারা
আবার তোমারে প্রভু করুক 'মানুষ'॥

এই উদ্ধৃতির মধ্যে শেষ পঙক্তির শেষের 'মানুষ' কথাটি লক্ষণীয়। কবির মানবিক ভাবনা ও বোধ এই কবিতাটির মধ্যে অনবদ্য আন্তরিকতায় ঝঙ্কৃত হয়েছে।

বৃন্দাবনলীলার সূত্রে মানবিক বোধসম্পন্ন কবির মনে হয়েছে—

দেবীর অধরে সে মাধুরী নাই যাহা মানবীর হৃদয়ে বাজে।
জননীর স্তনে যে পীয় ধারা দিতে নারে তাহা চন্দ্রমা সে।
জীবনের কথা বলিব না আর, মরণও হেথায় করে সঞ্চার
যে নবীন স্বাদ বিচিত্রতার, মিলে তা কি অমরতার মাঝে?
মর্ত্য মানব স্বর্গই চায়, দৃষ্টি তাহার ঊর্ধ্বপানে
দেবতারা আসে স্বর্গ ছাড়িয়া মর্ত্য মাটির মধুর টানে।
যাতায়াত করে চিরকাল ধ'রে স্বর্গ মর্ত্য বাঁধা প্রেমডোরে
দেবতা নরের প্রেমের লীলায় কে বড় কে ছোট কে-ই বা জানে?

[মর্ত্যের টান : আহরণ]

কবি এখানে স্পষ্টতই বলতে চেয়েছেন যে, মানবজীবনের বিচিত্র নবীনতার স্বাদ স্বর্গের অমরতার মধ্যে নেই এবং দেবতা-নরের প্রেমের লীলায় দেবতা ও নরের সমানই গুরুত্ব ও মর্যাদা। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী'র অন্তর্গত 'বৈষ্ণব কবিতা' শীর্ষক কবিতাটি স্মরণ করা যেতে পারে।

কালা ননীচোরা গিরিধরলাল বনমালীকে কবি মানবলীলার মধ্যে প্রত্যক্ষ করে স্থিরবিশ্বাস ও গভীর তৃপ্তিতে উচ্চারণ করেছেন—

শেষে ঘরে ঘরে হৃদয়ে হৃদয়ে লুকাতে লাগিলি ননীচোরা,
গৃহকোণগুলি খুঁজিতে কি বাদ দিব মোরা?
প্রিয়ার প্রণয়ে প্রতিবিম্বিত তোর প্রীতি,
সখার সখ্যে শুনি তোর দূর বেণু-গীতি,
চিনি যে শিশুর চারু চাপল্যে নিতি নিতি,
মানা ত মানে না গোপন কথাটি কয় ওরা।
কায়া তো লুকাস্ ছায়াটি লুকাতে পারিস্ না তো রে ননীচোরা॥

[লুকোচুরি : ব্রজবেণু]

বৈষ্ণবভাবধারার প্রকাশে কবিশেখরের স্বাভাবিক প্রবণতা থাকলেও তিনি শাক্তমনোভাবেরও লক্ষণীয় পরিচয় দিয়েছেন। ভক্তিবিহীন শক্তিপূজা দেখে ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ কবির উক্তি :

শক্তিরে মোরা কখনো পূজি না, পূজি শুধু মোরা মাটির ঢেলা,
শক্তি-মায়ের পুতুল বানায়ে করি তিনদিন পূজার খেলা।
কণ্ঠের জোরে চীৎকার করি' হয়নাক কেহ শক্তিমান,
ছাগের রুধির আমরা সঁপেছি, বাঘের রুধির করিনি দান।
শক্তিমায়ের সন্তান বলি নিজেরে সে ভবে করে প্রচার,
লজ্জা করে না সে হতভাগার উদরান্নও জুটে না যার?
মনে ত হয় না শক্তি-মায়ের আমরা কখনো করেছি সেবা,
যুগ যুগ হ'তে শক্তি পূজিয়া পরপদানত হয়েছে কেবা?
ভক্তিবিহীন শক্তিপূজার কি ফল তাতেই গিয়েছে বুঝা।
শক্তির পূজা কখনও করিনি, শক্তের শুধু করেছি পূজা!

[শক্তিপূজা : কালিদাস রায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা]

প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় ধর্মাদর্শের উদার মনোভাবের জন্য তিনি কোনো সঙ্কীর্ণগণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকেন নি। তাঁর প্রকৃত কবিধর্ম তাঁকে ধর্মসংস্কারের সর্বপ্রকারের তুচ্ছতা ও ক্ষুদ্রতা থেকে মুক্ত রেখেছিল। সেই কারণে তাঁর পক্ষে বিভিন্ন হিন্দু দেবদেবীর সঙ্গে বুদ্ধদেব ও খ্রীষ্টদেবের বন্দনা করাও সম্ভবপর হয়েছে। শাশ্বতকাল সত্য বুদ্ধদেবের জয় ঘোষণা করলেও তিনি তাঁর নির্বাণ না চেয়ে কামনা বাসনার সূত্রে এই বিচিত্র পৃথিবীর সঙ্গে জন্মজন্মান্তর ধরে জড়িত থাকতে উৎসাহী হয়েছেন। জরামৃত্যু পাপতাপে ভরা দুঃখালয় অশাশ্বত পৃথিবীতে মানবজীবনভোগে উন্মুখ কবি ঘোষণা করেছেন—

শুনিয়াছি চিরলুপ্ত, স্বর্গ, মুক্তি, নরকের কথা,
হে সুগত, শুনাইলে তুমি শুধু আশার বারতা।
বুঝিলাম, না হইলে ধ্বংস কামনার,
জন্মপথে এ জগতে আসিতে হইবে বার বার।
আশ্বস্ত করিলে শাস্তা, মৃত্যু নেই মোর
ছিন্ন কভু হইবে না ধরণীর সাথে বাঁধা ডোর॥

[বুদ্ধদেব : সন্ধ্যামণি]

কবি যীশুখৃষ্টের মানবিকতাকেই বড় করে তুলে ধরেছেন। তাঁর ধারণায় খ্রীষ্ট এই মানবিকগুণের জন্যই পৃথিবীর সকলের হৃদয় জয় করতে সমর্থ হয়েছেন। তিনি একান্ত বিশ্বাসের সঙ্গেই খ্রীষ্টের উদ্দেশে বলেছেন—

জন্মিয়া মানবীগর্ভে নৃ-ধর্মই করেছ পালন,
বর্ণে বর্ণে। মানুষীশক্তির সীমা কর নি লঙ্ঘন,
ঐশ্বর্য-সংযমে হলে মানুষের অন্তরঙ্গ জন,
তাই তুমি পরিত্রাতা মানুষের ভ্রাতা চিরন্তন।

... .

হত নও, মানবেব কল্যাণার্থে তুমি দিলে প্রাণ।
ঐশ্বর্য-সর্ব্বি তুমি মানবেবে যা করিলে দান,
সে দানের সুধাসিন্ধু দেশে কালে ভুবন ডুবায়,
উদ্বেলিত কবে তাবে বহু সুধাধাবা মিশি তায় ।।

[খ্রীষ্টদেব : পূর্ণাহুতি]

কবির ধর্মবোধেব মধ্যে মানবিক অনুভূতিই সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। মানবলীলার মধ্যেই তিনি দেবলীলাকে প্রত্যক্ষ কবে দেবতাকে দুঃখ-সুখেব শবিক কবে নিয়েছেন। যুগযন্ত্রণা ও হতাশ্বাসের মধ্যে তাঁব দেবতা শুভ ও কল্যাণেব শক্তিরূপেই উপলব্ধ হয়েছেন। কোনো বিশেষ ধর্মবন্ধনের দ্বাবা তাঁর দেবতা আবদ্ধ নন। এক তীব্র মানবিক অনুভূতি ও জীবনবোধ থেকে তিনি বাঙলাব দেবতার যে চিত্র এঁকেছেন তার মধ্যে তাঁব ক্ষুদ্র ধর্মীয় সংস্কাবমুক্ত প্রকৃত কবিমানসেরই উজ্জ্বল স্বাক্ষর উপস্থিত। তিনি লিখেছেন—

ভাগ্যে তোমাব বাগটিও নাই, নেইক অভিমান,
মোদেব চেয়েও অল্প পেয়েও তুষ্ট তোমার প্রাণ।
মহামাবীর দিনে ঠাকুব ভাবো মোদেব তবে,
বাদল-বাতে মোদেব সাথে ভিজছ ভাঙা ঘবে ॥

বন্যা-দিনে কবছ উপোস আমাদেরি সাথে,
মোদেব সহ জেগে বহু মহোৎসবেব বাতে।
মন্ত্র কোথা? যা' খুসী তাই ব'লেই পূজো করি,
ভাগ্যে তুমি কাঙাল ঠাকুব, দীন-দুখীদের হরি ।।

[বাঙলার দেবতা : আহরণ]

কবির পূর্ণাহুতি' কাব্যগ্রন্থের 'আমার দেবতা' কবিতায় আছে—

যা কিছু মধুব বিশ্বে তাবই মাঝে তাঁরে আমি পাই।
বাজসিক কোলাহলে হট্টগোলে তাহারে হাবাই ।।

আশা করি উপবের আলোচনা থেকে কবিশেখবকে শুধু 'বৈষ্ণব কবি' বলে চিহ্নিত করা যে কত ভ্রমাত্মক তা বোঝা কঠিন হবে না।

এবার কবিশেখরকে 'পল্লীকবি' বলে আখ্যা দেওযার বিষযটির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে। কবি বাঙলার প্রকৃতি ও জীবনেব সম্বন্ধে অনেক কবিতা রচনা করেছেন। তবে আগেই বলেছি এইসব কবিতা তাঁর সমগ্র কাব্যসৃষ্টির একটি অংশ মাত্র। আব এই সব কবিতার মধ্যে তাঁর বৈশিষ্ট্য যে বিশেষ ভাবে প্রকাশিত হয়েছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আমাব মনে হয় পল্লীজীবন ও প্রকৃতির মধ্যে গার্হস্থ্যজীবনেব মাধুর্য আস্বাদনে কবিব বৈশিষ্ট্য এক উৎকর্ষের চূড়া স্পর্শ করেছে। এই সংক্রান্ত কবিতার অন্তরঙ্গের সঙ্গে বহিবঙ্গেও তাঁর ক্ল্যাসিক্যাল ভঙ্গি বিশেষভাবে পরিস্ফুট। তিনি যে পল্লী জীবনের ভাষ্যকার ও রূপদানকারী তা বাঙলা দেশের পল্লীজীবন। এই পল্লীজীবনের সূত্রেই তিনি

বাংলাদেশ ও বাঙালী জীবনের সুখদুঃখ, আশা আকাঙ্খা ও মহিমা মাধুরীর আন্তরিক, স্বাভাবিক ও বাস্তববোধসম্পন্ন চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। এই কারণে অনেক সময়ে তাঁকে বিশেষভাবে বাংলা ও বাঙালীর কবি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি জানেন যে পল্লীজীবনই বাংলার প্রকৃত জীবন। তাই নগরজীবনের প্রতি তাঁর ঔদাসীন্য লক্ষ্য করা গেছে। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'সন্ধ্যামণি' কাব্যগ্রন্থের 'আমার লেখা' কবিতাটি পড়া যেতে পারে —

আমার লেখাই ক্ষণিকজীবী সোনালী পতঙ্গ।
আমার লেখা গঙ্গাফড়িং সবুজ তাহার অঙ্গ।
বাংলা মায়ের বর্ণ ক'রে চুরি
লতাপাতায় বেড়ায় উড়ি ঘুরি,
সহজে তায় পায় না ঢুঁড়ি শিকারী বিহঙ্গ॥

লুকিয়ে রয় রঙ মিলায়ে সবুজ পাতার অঙ্গে,
মিতালি তার কুঞ্জলতার মঞ্জরীদের সঙ্গে।
নগরপথে যায় না সে তো উড়ে,
প্রখর আলোর সংঘাতে জ্বলে পুড়ে,
শেষের শয়ন ডুবার তার মধুর পল্লী উৎসঙ্গ॥

এখানে 'নগরপথে যায় না সে তো উড়ে' কথাটির মধ্যে কবির নগরবিমুখতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি তাঁর 'বৈকালী' কাব্যগ্রন্থের 'পল্লী-শ্রী' কবিতার শেষে দ্বিধাহীন কণ্ঠে জানিয়েছেন :

মনে হয় এতদিনে বসতি ফেলেছি চিনে।
ধন্য হই, এই নদীতীরে
জীবন কাটায়ে দিতে পারি যদি এ নিভৃতে
ছায়াচ্ছন্ন একটি কুটিরে।
তরীযাত্রা হয় শেষ শান্ত হয় সব ক্লেশ
বন্ধ হয় সকল সন্ধান,
নগরের কলরোলে ক্লান্ত হয়ে মা'র কোলে
ফিরে আসে মায়ের সন্তান॥

কবি পল্লীজীবনের মধ্যেই তাঁর ক্লান্ত হৃদয়ের আশ্রয় খুঁজে পেয়েছেন। বাংলার পল্লীজীবন ও প্রকৃতির বিচিত্র বর্ণবিন্যাস ও লীলামাধুরী তাঁর কাব্যে এক অকৃত্রিম আন্তরিকতায় রূপায়িত হয়েছে। তাই শহরকেন্দ্রিক দ্বন্দ্বমুখর রুদ্ধশ্বাস জীবনে তাঁর পল্লীপ্রাণগত কবিতাবলী নিবিড় মুগ্ধতায় আস্বাদনীয় হয়ে উঠেছে। কবিশেখরের কাব্যের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আশীর্বচনে লিখেছিলেন :

"তোমার কবিতা বাংলা দেশের মাটির মতই স্নিগ্ধ ও শ্যামল। বাংলা দেশের প্রতি গভীর ভালবাসায় তোমার মনটি কানায় কানায় ভরা—সেই ভালবাসার উচ্ছলিত ধারায় তোমার কাব্যকানন সরস হইয়া কোথাও বা মেদুর, কোথাও বা প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। তোমার এই কাব্যগুলি পড়িলে বাংলার ছায়াশীতল নিভৃত আঙিনায় 'তুলসীমঞ্চ' ও 'মাধবীকুঞ্জ' মনে পড়ে।"

এখানে 'তুলসীমঞ্চ' ও মাধবীকুঞ্জ' কথাদুটি লক্ষণীয়। এই দুটি কথায় গ্রামবাংলার সৌন্দর্যময় লৌকিক ধর্ম ও প্রেমের ব্যঞ্জনা প্রকাশিত হয়েছে। কবি নিজেকেও বাংলা ও বাঙালীর কবি বলে অভিহিত করেছেন। এই বাংলা বিশেষ করে গ্রামবাংলা। কবির কণ্ঠে শোনা যায়—

আমি বাঙালীর কবি, বাঙালীর অন্তরের কথা,
বাঙ্গালার আশা তৃষা, স্মৃতি-স্বপ্ন, চিরন্তন ব্যথা
ছন্দে গেয়ে যাই আমি। অভ্রভেদী নহে তার তান,
দেশ-দেশান্তর লাগি নহে মোর কুলায়ের গান।

. ...

হরিল বিজাতী শিক্ষা যাহাদের বিধিদত্ত মন,
যাহারা জাতীয় ধর্ম হেলা ভরে দিল বিসর্জন,
তাহাদের জন্য নয়, পশ্চিমের ঝঞ্ঝার মাঝারে,
যাহারা বাঙ্গালী মর্ম রাখিয়াছে অঞ্চলের আড়ে
তুলসীর দীপসম, তাহাদের তরে মোর বাণী।
গৌরবের কথা নয় এ যুগে তা, জানি তাও জানি।
শুনি তারা রহিবে না,—কোন দিন তারা যদি মরে,
ডুবুক আমার গান, দুঃখ নাই, বঙ্গোপসাগরে॥

[শেষ কথা : বৈকালী]

'তুলসীর দীপসম' কথাটির ব্যঞ্জনা লক্ষণীয়। পল্লীজীবনের একটি অতিপরিচিত স্নিগ্ধ মাধুর্যময় ধর্মভাবের জ্যোৎস্না রয়েছে কথাটির মধ্যে।

নগর সম্পর্কে তাঁর বিরূপ মনোভাবের উচ্চকিত প্রকাশ ঘটেছে কবির 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ' কবিতায়। পল্লীপ্রাণ কবির কাছে পল্লীই তার স্বদেশ আর নগর হচ্ছে কৃত্রিম বিলাত। তাঁর ভাষায়—

গঞ্জ থেকে কুঞ্জে যেন, খাঁচা থেকে ঘুঁযের মাচায়,
গদ্য হতে পদ্যে এসে ফিরিতে না চায়।
ঝি'র কোল থেকে যেন মা'র কোলে বাড়ায় সে হাত—
এই ত স্বদেশ মোর, নগর-ত নকল বিলাত॥

এরি পাঠশালে মোর বিদ্যা হ'ল সুরু,
এরই গান গাহিবার দীক্ষা মোরে দিল কবিগুরু।
এর ভাষা লিখিলেন পিতা-পিতামহ—
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মে জানি ভয়াবহ॥

[স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ : সন্ধ্যামণি]

পল্লীকেন্দ্রিক বাঙালী জীবনের রূপরস মাধুরীতে কবি মুগ্ধ। তাই পল্লীর নরনারী, জীবনযাত্রা, গৃহস্থালী প্রভৃতির রূপায়ণে তাঁর স্বাভাবিক স্ফূর্তি অনায়াসেই ব্যক্ত হয়েছে। পল্লীর জীবন ও প্রকৃতির চিত্রণেই যে বাঙালীত্ব ও স্বাতন্ত্র্য সূচিত হতে পারে এমন একটা ধারণা তাঁর কবিতায় উপলব্ধি করা

যায়। 'তবু ভালো লাগে' কবিতায় তাঁর অকপট স্বীকৃতি —

রবীন্দ্রনাথের গানে পরিতৃপ্ত কান,
তবু ভালো লাগে আজো নিধু-দাশু শ্রীধরের গান।
কতই বিলাস হর্ম্যে ভরি আছে এই রাজধানী,
তবু ভালো লাগে সেই তক্তকে বেঁশো ঘরখানি,
পাঁশ-ঢিপি বাঁশঝাড় কলাবনে ঘেরা
বাঁধা যার চারি পাশে রাঙচিতা বেড়া॥
... ...
রজনী দিবস আজি বনিয়াছে বিদ্যুৎ আলোকে
আলোর ছটায় শিল্প হেরি আজি চমকিত চোখে।
তবু ভালো লাগে সেই দীপখানি তুলসীর তলে,
সাঁঝে যাহা মিটি মিটি মিঠি মিঠি জ্বলে॥
[তবু ভাল লাগে : কালিদাস রায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা]

এই কবিতার শেষে কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে —

শুনি নাকি হইয়াছি অধিকারী বিশ্ব সভ্যতার,
বাঙ্গালী আমি যে তাহা কী আছে উপায় ভুলিবার?
ভুলিতে পারিনি আমি তা'ত।
এ সভ্যসমাজ মাঝে তাই আমি ব্রাত্য অবজ্ঞাত॥

কবির 'আমরা বাঙালী' কবিতায় তাঁর বাঙালী অভিমান ও স্বজাত্যবোধের এক স্বতঃস্ফূর্ত অন্তরঙ্গ অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়। কবির ভাষ্যে—

আমরা বাঙালী, হৃদয়ধর্মে তীর্থ মোদের বাংলা দেশ
অন্নজীবন, পুণ্যপাবন, ব্রতের সাধক, রিক্ত বেশ।
চাহিনাক মোরা রক্তারক্তি, ভুবনে আমরা প্রচারি ভক্তি,
পরধনে নাই লালসাসক্তি, কারো প্রতি নাই অসূয়া দ্বেষ॥

আমরা বাঙালী, অন্ন যোগাই জীবজগতের ক্ষুধিত মুখে,
সান্ত্বনা দিই শোকসন্তাপে, আশ্বাস দিই ব্যথিত বুকে।
স্মরি বটে চাঁদ-প্রতাপে গাথায় যুদ্ধ মোদের নয় ব্যবসায়,
নমি মোরা সম্বুদ্ধের পায়, দৈন্যে জীবন কাটায় সুখে॥
[আমরা বাঙালী : আহরণী]

পল্লীর গার্হস্থ্য জীবনের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্খা বেদনা নৈরাশ্যের চিত্রণে কবিশেখরের বিশিষ্টতা বিশেষভাবে বিধৃত হয়েছে। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে একটা কাহিনী বা কাহিনীর রূপরেখা থাকায় বর্ণনার আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সব চিত্র বাস্তববোধ, মানবানুভূতি ও সহৃদয়তার গুণে এক অসামান্য উজ্জ্বলতা লাভ করেছে। কবিশেখরের যে বৈশিষ্ট্যসূচক ক্লাসিক্যাল মনোভঙ্গির কথা বলেছি তা

বিশেষ মাত্রায় এই ধরনের কবিতাবলীর মধ্যে আছে উদাহরণ স্বরূপ 'কৃষকের শোক' কবিতার প্রথম স্তবকটি পড়া যেতে পারে। গৃহলক্ষ্মীর বিয়োগব্যথায় কাতর কৃষকের জবানীতে কবি বলেছেন :

এমন করে কেমন ক'রে আঁধার ঘরে আর
তোমায় ছেড়ে রইব আমি নিয়ে তোমারি ভার ?
দুয়ারে নেই জলের ছড়া—উঠানে নেই ঝাঁট,
বিহানে আর গোয়ালঘরে করে না কেউ পাট।
গাইয়ের দুধ শুকায় বাঁটে হয় না গাই দোয়া,
খামার ক্ষেতে তোমার ধান খড় যে যায় খোয়া।
গোয়ালে নেই সাঁজাল ধোঁয়া, জলে না ঘরে সাঁজ,
মাদুর পেতে কে দেবে ? শুই গামছা পেতে আজ।
বারেক ফিরে এসে
লক্ষ্মী মোর লওগো ভার তোমার ঘরে হেসে ॥

[কৃষকের শোক : আহরণী]

গ্রাম্যজীবনের ক্ষেত্রে অতিপরিচিতা কুড়ানীর ব্যথাবেদনার রোজনামচা বর্ণনায় তাকে দিয়েই এক স্থলে কবি বলিয়েছেন —

বর্ষা ফুরায় লাউ কুমড়ায় গোটা চাল যায় ভ'রে,
পুকুর ডোবায় কলমী শুশুনী তুলে আনি ঝুড়ি ক'রে।
নালাটি শুকায় কাঁকড়া লুকায় মাছ ঢুঁড়ে মরা মিছে,
কুড়াই ঝিনুক গুগুলি শামুক ছেলেদের পিছে পিছে।
তালটি বেলটি কুড়ালে লোকেরা হাঁ হাঁ ক'রে আসে ছুটে,
মোর ভাগে খোয় লোকে যা না ছোঁয় নিতে হয় যা যা খুঁটে।
এমনি ক'রেই তিলটি কুড়িয়ে তালটি ক'রেই জড়ো
কুড়ানো ভাতে এ পেটটি ভরায়ে হয়েছি তো এত বড়।
পড়সীরা কয়—"গতর দেখ না, হাতমুখ গোলগাল,
এত যে খাওয়াই মোদের মেয়ের শুকুনির মত হাল।"

খোঁড়া মা আমার ঘরে পড়ে রয়, বাপ মরা মনে নাই।
ঘর পুড়ে গেলে পাড়াপড়সীরা দেয় নিক কেউ ঠাঁই।
কাঁচা আলে কারো দিই না পা আমি, পাকা ধানে কারো মই,
বাসনও মাজি না, ভিখারী সাজি না এমনি ক'রেই রই।
চলি এইবার আজ হাটবার ডেকো নাক আর পিছু
যাই হাটতলা সেথা শেষ বেলা কুড়ালে মিলবে কিছু ॥

[কুড়ানী : আহরণী]

এই ধরনের কবিতাবলীর অন্তরঙ্গে ও বহিরঙ্গে কবিশেখরের স্বকীয়তা অনস্বীকার্য। বৎসরের বিভিন্ন ঋতুতে কুড়ানীর দুঃখকষ্টের বর্ণনায় নিঃসন্দেহে মঙ্গলকাব্যের বারমাস্যার প্রভাব আছে। কুড়ানীর জীবনচরিত রচনায় কবির বাস্তববোধ, সাধারণ পল্লীজীবনের ভাব ও প্রচলিত শব্দচয়ন, গভীর মানবিক অনুভূতি বিশেষ ভাবে মনোযোগ দাবি করে। কুড়ানীর আত্মবিবৃতির মধ্যে নাটকীয়তা গুণ লক্ষণীয়। কবি পল্লীজীবনের ফুল, ফল, পাখি, ধ্বংসস্তূপ, দীপশিখা প্রভৃতি নানা বস্তু নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন। বাঙালী ও বাংলার বিবিধ বস্তুর প্রতি আগ্রহের ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে কবিশেখরের সমধর্মিতা দেখা যায়। পল্লীর বিভিন্ন চরিত্র, প্রকৃতি ও পরিবেশ তাঁর কবিতায় সার্থক ভাবে রূপায়িত হয়েছে। পল্লী প্রকৃতির মধ্যে গোধূলিতে গার্হস্থ্যজীবনের ছবি কিভাবে গ্রথিত হয়েছে তার উদাহরণস্বরূপ কবির 'গোধূলি' কবিতার কয়েকটি পঙক্তি উৎকলিত করছি—

ধেনুদল আসে ফিরে যেন দুগ্ধগঙ্গার তুফান,
বধূরা ফিরিছে ঘরে তুলি ঘটে বাঁকনিয়া তান।
হাঁসগুলি ফিরিছে ঘরে শ্রান্তপদে সন্তরণ ছাড়ি,
কৃষকেরা ফিরে ঘরে শুষ্কক্ষেতে জলসেচ সারি ॥

[গোধূলি : কালিদাস রায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা]

দেবেন্দ্রনাথ সেন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, অক্ষয়কুমার বড়াল, কিরণধন চট্টোপাধ্যায়, প্রিয়ম্বদা দেবী, কুমুদরঞ্জন মল্লিক প্রমুখ কবিদের কাব্যে গার্হস্থ্যজীবনের বাস্তববোধসম্পন্ন চিত্র পাওয়া যায়। কিন্তু কবিশেখরের বাংলার পল্লীর পটভূমিকায় গার্হস্থ্যজীবন সম্পর্কিত কাব্যের অন্তরঙ্গে ও বহিরঙ্গে ক্ল্যাসিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গি অধিক মাত্রায় পরিস্ফুট বলে তা স্বতন্ত্র মর্যাদাসম্পন্ন। খাঁটি বাংলা দেশ বলতে কবি পল্লীবাংলাকেই বুঝিয়েছেন। এই পল্লীবাংলার হৃদয়ে বাঙালীর গার্হস্থ্যলীলাতেই তাঁর সর্বাধিক আগ্রহ ও আকুলতা। তিনি তাঁর 'পূর্ণাহুতি' কাব্যগ্রন্থের 'গাঁয়ের কবি' কবিতায় লিখেছেন—

যাদের বার্তা লিখেছি তারা যে বাংলা মায়ের আসল ছেলে,
মুচি, ডোম, হাড়ী, চাষী, মাঝি, দাঁড়ি, তাঁতি, বাগ্দী, ঝাঁকি, রাখাল, জেলে।
গান গেয়ে গেয়ে ধান কাটে যারা, দাঁড় বেয়ে বেয়ে দরিয়া তরে,
নেচে নেচে যারা কাঠ চেরে আর রাঙা লোহা থেকে কাস্তে গড়ে ॥

যাদের অধরে শাঁখ বাজে, যারা সাঁঝদীপ জ্বালে তুলসীতলে,
পশ্চিমে ভানু ঢলিয়া পড়িলে দীঘি নদী ঘাটে জলকে চলে।
আলপনা দেয় বাড়ীর উঠানে, পোষ মাস এলে বাউড়ি বাঁধে,
দশের জন্যে ভোগ বাঁধে আর ধেয়ার ছলনা করিয়া কাঁদে ॥

ষষ্ঠীতলায় পাড়ার সকল ছেলেমেয়েদের কুশল মাগে,
সকলের শেষে শুতে যায় যারা, প্রভাতে সবার আগেই জাগে।
যাহারা আমারে যোগাইল ফুল, মালা গাঁথি আমি তাদেরই তরে,
দাও নি কিছুই তোমাদের দাবি নেই এই গেঁয়ো কবির 'পরে ॥

তাদের কথাই লিখি যারা হেথা রচেনি ঘাঁটি বা উপনিবেশ,
এই বাংলার আসল মালিক, এ মাটি যাদের খাঁটি স্বদেশ ॥

পল্লী পরিবেশে গার্হস্থ্য রসসমৃদ্ধ আরও কিছু সংখ্যক কবিতাংশ উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

নবদম্পতির সংসারযাত্রার মধ্যে প্রেমলীলা—

নতুন হয়েছে বিয়ে ঘোরে নি বছর,
তখনো রোজই বাসে মোদের বাসর।
দিনে তুমি সংসারে পরিচারিকা,
নিশীথে কুঞ্জে মোর অভিসারিকা!
মনে পড়ে শাওনের বাদল রাতি,
গৃহকোণে মিটিমিটি জলন্ত বাতি।
ডোবায় বেঙের ডাক ও লাগত মিঠে,
আসত জানালা ফাঁকে জলের ছিটে।
যুঁই-এর গন্ধে ভরা বাতাস নিয়ে,
ভাবতাম কখন-বা আসবে প্রিয়ে ॥

[অভিসারিকা : কালিদাস রায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা]

গ্রামবাংলার পৌষমাসে সাধারণ গৃহস্থালীর বর্ণনা—

কৃষাণীরা ভাজে খই, বাঁধে নাড়ু, পাতে দই।
সকলেই খুব খুশী মওয়া আর পায়েসে।
সারা বছরের পরে অভাব ঘুচেছে ঘরে,
পোষ মাস কাটে বেশ হেসে খেলে আয়েসে ॥
মার মুখে মিঠে বুলি, শিশু খায় পিঠে পুলি,
বাবা বলে, খাও 'তবে খুব বেশী খেও না।
শাঁখ বাজে বারে বারে, আলপনা ঘরে দ্বারে
গায় সবে পোষ মাস তাড়াতাড়ি যেও না ॥

(পৌষের গান : কালিদাস রায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা)

পল্লীবাসী পাঁচুর বিয়োগকাতর গার্হস্থ্যজীবনের বেদনার এক অসামান্য আলেখ্য—

নীরব হয়েছে গ্রাম, অশথ পাতার গায়
জোছনা করিছে ঝিকমিক,
বাঁশবনে ঝিঁঝিঁ ডাকে, বাতাবি ফুলের বাস
মাঝে মাঝে ভুলে যায় দিক্।

ছেঁড়া মাদুরের পরে ঘুমাইছে অকাতরে
মাতৃহারা ছেলেমেয়েগুলি,
মাঝে মাঝে স্বপ্নঘোরে তাহাদের শীর্ণ বুক
দীর্ঘশ্বাসে উঠে ফুলি ফুলি।
দাওয়ায় বসিয়া পাঁচু ভাবে গালে রাখি' হাত
চোখে জল ঝরে দরদর,
সারাদিন খেটে খুটে ঝিরিঝিরি এই তার
কাঁদিবার শুধু অবসর।।

(পল্লীর বেদনা : কালিদাস রায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা)

এই রকম বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। এই ধরনের কবিতায় কবিশেখরের বৈশিষ্ট্যের বিশেষ প্রকাশ ঘটেছে এ কথা পূর্বেই বিস্তারিতভাবে উল্লিখিত হয়েছে।

কবিশেখরের ক্ল্যাসিক্যাল মানসিকতার এক নিবিড় অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায় প্রাচীন বঙ্গ তথা ভারতবর্ষের সনাতন আদর্শ ও ঐতিহ্যের রূপায়ণে। সংস্কৃত সাহিত্য সম্পর্কে গভীর জ্ঞান তাঁকে এ বিষয়ে সাহায্য করেছে। প্রাচীন ভারতের ধর্মাদর্শ ও ন্যায়নীতিতে দৃঢ়ভাবে শ্রদ্ধাশীল বলেই তিনি পশ্চিমের নগরসভ্যতার বিষয়ে প্রতিকূল মনোবৃত্তির অধিকারী। তিনি পল্লীজীবনের মধ্যে প্রাচীন ধর্মাদর্শ খুঁজে পেয়ে তৃপ্ত ও আশ্বস্ত হয়েছেন। ভারতবর্ষের নগরকেন্দ্রিক জীবনের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পল্লীপ্রাণ কবি পল্লীর মানুষ ও প্রকৃতির গভীর জীবনের চরম শ্রেয়, প্রেয় ও অমরতার আস্বাদন করে ধন্য ও কৃতার্থ বোধ করেছেন। যেখানে প্রাচীন ধর্মাদর্শ থেকে বিচ্যুতি লক্ষ্যগোচর হয়েছে সেখানেই তিনি অশুভ ও অকল্যাণের উপস্থিতি উপলব্ধি করেছেন। কবি যে ভারতমাতার বন্দনা করেছেন তিনি সনাতন ভারতবর্ষের জ্ঞানগরিমা ও ধর্মাদর্শের এক মহিমাময় প্রকাশ। এই ভারতমাতার বন্দনায় তিনি বলেছেন—

বন্দি ভারতমাতা অনিন্দিতা,
শঙ্কাতে সংকটে কন্টকভরা পথে অকম্পিতা।।

...

ধর্মে কামনাহীনা নিবেদিত প্রাণ,
সত্য তোমার দেহে বর্মায়মান।
করিতে কর্মফল ব্রহ্মেরে দান
শিখালো তোমারে দেবি তোমার গীতা।।

জ্ঞানে ধ্যানে গৌরবে অভ্যুদ্ধতা।
তোমারে ঘেরিয়া রাজে পবিত্রতা।
ঘরে ঘরে রাজে তব পতিব্রতা
অনসূয়া ঊর্মিলা ভদ্রা সীতা।।

(ভারতমাতা : পূর্ণাহুতি)

কবি তাঁর 'প্রাচীন বঙ্গ' কবিতায় ধর্ম ন্যায়নীতিপরায়ণ সুখী স্বাস্থ্যোজ্জ্বল শৌর্যবীর্যময় বাঙলা-দেশকে স্মরণ করেছেন এবং পাশ্চাত্য বৈশ্যসভ্যতার কবলে পড়ে সেই বাঙলা দেশের হৃতশ্রী লক্ষ্মীহারা অবস্থা দেখে তাঁর চিত্ত বেদনাহত হয়েছে। তিনি সেই পল্লীপ্রাণ বাঙলাকেই ফিরে পেতে চেয়েছেন। কবিতার শেষে তাঁর আকূতি—

সপ্তডিঙ্গার বঙ্গদেশ,
পুণ্যবাহিনী পূর্বকাহিনী কত বর্ণিব সে যে অশেষ।
সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে
এর বেশি কিছু চাওনি ধরাতে।
ফিরে যদি পাই তাই শুধু চাই, চাই না পৌর আড়ম্বর,
ফিরে চাই সেই দুধের সর॥

সপ্তডিঙার বঙ্গদেশ,
অশুভক্ষণে বিদেশীর পোত গঙ্গাসাগরে করি প্রবেশ
সপ্তডিঙারে ডুবাইল জলে
লক্ষ্মী পলায়ে গেলেন অতলে।
সাতশত পোতে সাতসমুদ্র মন্থন করি ফিরাব তাঁয়,
একি শুধু হবে স্বপ্ন হায়?

(প্রাচীন বঙ্গ : সন্ধ্যামণি)

নগরবিমুখতার ক্ষেত্রে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কবির সমধর্মিতা অনুভূত হয়। নাগরিক সভ্যতার মোহে প্রাচীন ধর্মাদর্শ থেকে বিচ্যুতি ও পল্লীজীবনকে যথাযোগ্য মর্যাদা না দেওয়ার প্রবণতাকে তিনি প্রধানত বাঙলা দেশের দুঃখদুর্দশার জন্য দায়ী করেছেন। বর্তমান ভারতবর্ষ ও বাঙলা দেশের, বিশেষ করে পল্লীসমাজের নানা ব্যথাবেদনা অবক্ষয় দুর্গতির রূপায়ণে তিনি যুগচেতনার পরিচয় দিয়েছেন। এই যুগচেতনার মূলে কোনো বিশেষ আধুনিক রাজনীতিচিন্তা বা ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ নেই। তিনি ধর্মবোধ ও মানবিকতার দিক দিয়েই এই সব অসাম্য, অন্যায়, অত্যাচার দুর্গতি ও অবক্ষয়ের অবসান চেয়েছেন। তিনি দুঃখবাদী নন। এক পরম ধর্ম ও প্রেমবোধের জন্য তিনি আশাবাদের সুর ধ্বনিত করতে পেরেছেন। যুগযন্ত্রণায় বিশেষ ভাবে সোচ্চার হয়ে ওঠা তাঁর মতো সনাতন ধর্ম ও প্রেমভাবে পরিপূর্ণ হৃদয়ের পক্ষে মোটেই সহজসাধ্য নয়। এ ক্ষেত্রে তাঁর সীমিত পদচারণা সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। তিনি তাঁর 'সন্ধ্যামণি' কাব্যসংকলনের 'গ্রন্থকারের নিবেদন'-এ লিখেছেন—

"গুরুর আশীর্বাদ নিয়ে শুরু করেছিলাম যাত্রা, কিন্তু তাঁর চলার পথে আগাতে পারি নি। তাঁর পদাঙ্ক-পরম্পরা খুঁজেও পাই নি। জানি না তিনি পদাঙ্ক মুছে মুছে চ'লে গিয়েছেন কিনা। তবে তিনি যে বলেছিলেন—'একতারাতে একটি যে তার আপন মনে সেইটি বাজা।' সেই একতারা বাজাতে বাজাতে এত দূর এগিয়ে এসেছি, যুগযাত্রার পথে নয়, জীবনযাত্রার পথে। যেরূপ দ্রুতগতিতে যুগের পরিবর্তন হয়েছে—তাতে যুগের সঙ্গে তাল রেখে চলা উনবিংশ শতাব্দীতে সঞ্জাত কবির পক্ষে সম্ভব নয়। একতারাও এ যুগে অচল।"

তবুও একথা মানতেই হবে ঐতিহ্যানুসারী হয়েও তাঁর কাব্যে বর্তমান যুগের সমস্যাবলী যথাসাধ্য গৃহীত হয়েছে বলে তার আকর্ষণ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

অতীত স্মৃতিচারণের ক্ষেত্রে কবিশেখর তাঁর ক্ল্যাসিক্যাল মনোভঙ্গির নিদর্শন রেখেছেন। তিনি একজন আদর্শ শিক্ষক ছিলেন। তাঁর জীবনের বহু বৎসর শিক্ষকতায় ব্যয়িত হয়েছে। আদর্শ শিক্ষকের কর্তব্যপরায়ণতা স্মৃতিচারণের সূত্রে তাঁর কাব্যে অনবদ্য মহিমায় ব্যক্ত হয়েছে।

রঙ্গব্যঙ্গাত্মক রচনাতেও কবি মৌলিকতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখ কবিদের রঙ্গব্যঙ্গের ধারাটিকে তিনি সামাজিক অভিজ্ঞতা, মানবিক অনুভূতি ও নৈতিকবোধের সাহায্যে এক বিশেষ তীব্রতা ও গাঢ়তায় প্রকাশ করেছেন। এই জাতীয় কবিতায় তাঁর সাফল্য তর্কাতীত। এই সুভাষিতাবলী কবিশেখরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তাঁর কয়েকটি রঙ্গব্যঙ্গাত্মক উক্তি চয়ন করে দেওয়া গেল। এই সব উক্তি থেকে তাঁর রচনানৈপুণ্যের নিশ্চিত পরিচয় মিলবে।

ভাগ্যবলে ভিড় ঠেলে উচ্চপদ পাইলে যে দিন
সেদিনই হইলে তুমি সর্বশাস্ত্রে পণ্ডিত প্রবীণ।
সবার মূর্ধায় হ'লা সেই হ'তে তোমার চেয়ার
ছারপোকা রূপে হ'ল সবগুণ-বিদ্যার আধার॥

(পদগৌরব : আহরণী)

ছাত্রের উকিল-পিতা শিক্ষক-বন্ধুরে হেসে ক'ন—
তুমিত চরাও গরু হাতে লয়ে বেতের পাঁচন।
শিক্ষক কহিল—গোরু চরানোর করি না বড়াই,
গোরু চরে আদালতে, তাহাদের বাছুর চরাই॥

(গোরু ও বাছুর : আহরণী)

মানব মন্দির রচে শিলা দিয়া অনিন্দ্য সুন্দর।
দেব-কারাগার, তায় বন্দী দেব ব্যথিত কাতর।
অশ্বত্থ মন্দির রচে বিদারি' সে দেউলের বুক,
দেবতা লভিয়া মুক্তি, অঙ্কে লভে যোগ-নিদ্রাসুখ॥

(দেবতার মুক্তি : সন্ধ্যামণি)

হয়েছে দেশের লোক বড় অর্থলোভী,
অর্থ দাবি করে, ভুলে আমরা যে কবি।
আমাদের কবিতায় অর্থ তারা খোঁজে,
কাব্য এটা, ব্যাঙ্ক নয়, এ কথা না বোঝে॥

(চৌপদী (৭) : কালিদাস রায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা)

নামধাতু কারে বলে ?
বানাযে তাদের লও ধাতুরূপ যা যা দিযে মাবা চলে।
যেমন—চাবুক, ঝাঁটা, ঠেঙা, লাথি, গুঁতো,
খোঁচা, বেত, শিঙ, জুতো ॥

(চৌপদী (১৫) : কালিদাস রাযের শ্রেষ্ঠ কবিতা)

কবিশেখবেব বোমান্টিক প্রেমমূলক কবিতাগুলি বৈশিষ্ট্যবর্জিত নয। এই সব কবিতায কিন্তু ববীন্দ্রনাথেব প্রভাব তেমন কিছু পডে নি। বাস্তববোধসম্পন্ন প্রেমাত্মক কবিতাবলীই তাঁব স্বকীযতার পবিচাযক। তাঁব প্রেমাশ্রিত কবিতায বক্তমাংসেব জীবনকে উপলব্ধি কবা যায। উদাহবণস্বরূপ তিনটি উদ্ধৃতি আহবণ কবা যেতে পাবে।

প্রেমজীবনেব স্মৃতিবোমন্থন কবেছেন কবি—

মনে পডে সখি সেই বেঁশো ঘব ফুটা চালে জল ঝবে,
পাশে ছাইভবা বাখিতাম সবা জল শুষিবাব তবে।
সাবাটি আঙিনা ভবা কাদাজলে আলতা বাঁচানো চাই,
সে কাদামাটিতে তোমাব হাঁটিতে ঝামাপাতা ছিল তাই
পাশেব ডোবায ব্যাঙ ডেকে যায একটানা তাব স্বব
মনে পডে সেই সে গান কতই লেগেছিল সুমধুব।

*   *   *

সিক্ত সমীবে যূঁই- এব গন্ধ আসিত ঝবোখা ফাঁকে,
চমকিযা মোবে তবা বাহুডোবে বাঁধিতে মেঘেব ডাকে ॥

(প্রেমজীবনেব স্মৃতি , আহবণ)

সাধাবণ সুখদুঃখে আন্দোলিত গার্হস্থ্যজীবনে প্রেমেব দুর্লভ সন্ধ্যায গৃহলক্ষ্মীব উদ্দেশে গৃহকর্তার উক্তি—

ভুলে গেছ ?—চাহ দেখি একবাব ঘবের বাহিবে
শবদ্দল ধৌত আজ শুভ্র শুচি জ্যোৎস্নাব ক্ষীবে ,
পাশেব বাগান হ'তে আসিতেছে হেনাব সৌবভ,
শুনিছ না তার মাঝে উঠে নামে পাপিযার বব।
এবাব পডে না মনে ? আযোজন ব্যর্থ নাকি সবি ?
তবে দেওযালেব 'পবে দেখ দেখি ঝুলিছে কি ছবি,
বিবাহের পরদিন দুইজনে তোলাইনু ফটো,
মুছে ওটা নিযে এস। লক্ষ্মী মোব, একবার ওঠো।
স্মর' সে দিনের কথা। হাস পুনঃ, ত্যজ অবসাদ,
এ সন্ধ্যা বিধিব দান, ব্যর্থ হ'লে হবে অপরাধ ॥

(দুর্লভ সন্ধ্যা : বৈকালী)

জীবনের শরৎশেষে হেমন্তে প্রিয়াকে লক্ষ্য করে কবির ভাষণ—

তুলসীমঞ্চের পাশে এস প্রিয়ে বসো তুমি কাছে।
স্বপ্নের গিয়াছে দিন, লীলা সে-ও নিয়াছে বিদায়,
রেখে গেছে স্মৃতি তার। সে কি তুচ্ছ ? নাহি বটে আয়,
স্মৃতির সঞ্চয় আছে, এ দুর্দিনে তাহাই সম্বল।
বসন্ত গিয়াছে বলি তা-ও কেন করিব নিষ্ফল
বেলাশেষে হেলা ভরে ? হৃদয়ের গুপ্তকক্ষ খুলি
এস প্রিয়ে প্রীতি দিয়ে সে স্মৃতি জীবন্ত ক'রে তুলি
হেমন্ত সন্ধ্যায় আজি। চন্দ্রালোকে সান্দ্র হোক প্রীতি,
গিয়াছে দিনের আলো, আছে তার হেমময়ী স্মৃতি ॥

(হেমন্তে : আহরণী)

কবিশেখরের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে নাম করতে হয় 'কুন্দ' (১৯০৮), 'কিসলয়' (১৯১১), 'পর্ণপুট' (১ম ভাগ ১৯১৪ ও ২য় ভাগ ১৯২১), 'ব্রজবেণু' (১৯১৫), 'বল্লরী' (১৯১৫), 'ঋতুমঙ্গল' (১৯১৬), 'ক্ষুদকুঁড়া' (১৯২২), 'রসকদম্ব' (১৯২৩), 'হৈমন্তী' (১৯৩৪), 'লাজাঞ্জলি' (১৯২৪), 'চিত্তচিতা' (১৯২৫), 'আহরণী' (প্রথম সংকলন ১৯৩২), 'বৈকালী' (১৯৪০), 'ব্রজবাঁশরী' (১৯৪৫), 'আহরণ' (সংকলন১৯৫০), 'গাথাঞ্জলি' (১৯৫৭), 'সন্ধ্যামণি' (সংকলন ১৯৫৮), 'কালিদাস রায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা' (সংকলন ১৯৬৪) ও 'পূর্ণাহুতি' (১৯৬৮)। তাঁর অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের মধ্যে 'তৃণদল', 'দন্তরুচি কৌমুদী' (সংকলন) উল্লেখযোগ্য। 'আহরণী' নাম নিয়েই 'আহরণ'-এর পর আর একটি স্বতন্ত্র কাব্য সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল। সেটি কবিশেখরের নিজস্ব সংকলিত কবিতার সঞ্চয়ন।

কবিশেখরের কাব্যের বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য স্বতঃই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর বিষয়বস্তুর মধ্যে আছে ভারতবর্ষ ও বঙ্গদেশের ধর্মাদর্শ ও ঐতিহ্য, পল্লীজীবন ও প্রকৃতি, জাতীয় ও সামাজিক সমস্যাবলী, গার্হস্থ্যজীবনপ্রীতি, ব্যক্তিগত জীবনের স্মৃতিচারণ, মানবিক প্রেমমাধুর্য ইত্যাদি। তিনি তাঁর 'সন্ধ্যামণি' কাব্য-সংকলনের অন্তর্গত 'অভিনন্দিত' কবিতায় তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তুকে এক অসামান্য নৈপুণ্যের সঙ্গে উপস্থাপিত করেছেন। এইসব বিষয়বস্তু বিশেষ ভাবে রূপায়িত হয়েছে তাঁর 'পর্ণপুট', 'ব্রজবেণু', 'ঋতুমঙ্গল', 'ক্ষুদকুঁড়া', 'হৈমন্তী', 'লাজাঞ্জলি', 'বৈকালী', 'আহরণী' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে। 'বল্লরী'তে স্বল্লায়তনের সরস কবিতা সংকলিত হয়েছে। 'রসকদম্ব' ও 'দন্তরুচি কৌমুদী' হাস্যরসাত্মক কবিতার সমষ্টি। 'গাথাঞ্জলি', 'গাথাকাহিনী', 'গাথাবলী' ও 'গাথা-মঞ্জরী'তে গাথাকবিতা গ্রথিত হয়েছে।

কবিশেখর মৃগ, গর্দভ, উষ্ট্র, উল্লুক, গাভী, সিংহ, বৃষভ, শৃগাল, মহিষ প্রভৃতি পশুজীবনবিষয়ক কতকগুলি কবিতা রচনা করেছেন। এইসব প্রতীকধর্মী কবিতায় একটা রঙ্গব্যঙ্গের বর্ণবিচ্ছুরণের মধ্যে যুগমানসিকতাকে উপলব্ধি করা যায়। এই শ্রেণীর কবিতাগুলির মধ্যে 'পূর্ণাহুতি' কাব্যগ্রন্থের 'সিংহ', 'বানর-প্রশস্তি', 'হস্তি-প্রশস্তি', 'শৃগাল', 'মহিষ', 'অশ্ব', প্রভৃতি সমধিক প্রসিদ্ধ।

ইতিহাস, পুরাণ ও সমসাময়িক নানা ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে কবিশেখরকে কাব্যসৃষ্টি করতে দেখা যায়। এই সব কবিতায় তাঁর দেশাত্মবোধ, ঐতিহ্যপ্রীতি ও কালচেতনার পরিচয় মেলে। এই সূত্রে 'পূর্ণাহুতি' কাব্যগ্রন্থের 'দ্বিজেন্দ্রলাল', 'শকুন্তলার কবি', 'মহারথ নেহেরু', 'বলেন্দ্রনাথ', 'খৃষ্টদেব', 'রবীন্দ্রনাথ' প্রভৃতি কবিতা এবং 'আহরণ' কাব্যচয়নিকার 'কৃত্তিবাস', 'চণ্ডীদাস', 'জয়দেব', 'গুরু গোরক্ষনাথ', 'বেহুলা', মেনকা', 'রামপ্রসাদ', 'ইন্দ্র' প্রভৃতি কবিতা স্মরণীয়। পৌরাণিক চরিত্রের নবরূপায়ণে কবির কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। শুধু দেশীয় নয়, বিদেশী কবিসাহিত্যিক মনীষীদেরও তিনি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'শেকস্পীয়ার', 'রবার্ট ব্রাউনিং', 'টেনিসনের প্রতি', 'শেলীর প্রতি', 'কীটসের প্রতি' প্রভৃতি কবিতা উল্লেখযোগ্য।

চম্পক, কুন্দ, ধুতুরা, ছাতিম, জবা, মালতী প্রভৃতি নিয়ে প্রকৃতিপ্রেমিক কবিশেখর কতিপয় প্রতীকধর্মী কবিতা প্রণয়ন করেছেন। এই সব কবিতায় তাঁর ইংরেজী ও সংস্কৃত সাহিত্যে গভীর জ্ঞান এবং ধর্ম ও ইতিহাস-বোধের নিদর্শন বর্তমান।

আঙ্গিক সম্পর্কে কবিশেখরের সচেতনা বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। তিনি নানাশ্রেণীর কবিতা রচনা করেছেন ; যেমন—সূক্তিমূলক, গাথাজাতীয়, নীতিবিষয়ক, রূপকাত্মক, প্রতীকাশ্রয়ী, রঙ্গাত্মক, ব্যঙ্গপ্রধান কবিতা প্রভৃতি। তাঁর বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, অলংকারপ্রিয়তা, ছন্দ ও ভাষার বিষয়ে সতর্কতা বিশেষ লক্ষণীয়। ক্ল্যাসিক্যাল মনোভঙ্গির জন্য কাব্যে বাস্তবতা পরিস্ফুটনের তাগিদায় তিনি অনেক জায়গায় সোজাসুজি ভাষণের উপযোগী গদ্যের কাছাকাছি ভাষার আশ্রয়ও নিয়েছেন। বহুক্ষেত্রে সাধারণ জীবন থেকে তিনি শব্দসঞ্চয় ব্যবহার করে কাব্যকে প্রাণময় করে তুলেছেন। এই সব স্থলে কবিশেখর বাস্তবতাকে বজায় রেখে কাব্যে যে ভাবে বিবিধ অলংকার প্রয়োগে রসসৃষ্টি করেছেন তা অতীব প্রশংসনীয় এবং তা রবীন্দ্রনাথের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

কবিশেখরের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রকাশভঙ্গি দেখানোর জন্য কয়েকটি উদ্ধৃতি দেওয়া গেল।

যৌথপরিবার থেকে সহোদর দুই ভাই পৃথক হয়ে যাওয়ার পর বর্ণনা—

দুই হেঁসেলে রান্না করে আজিকে দুটি জায়ে।
দুই চালেরই ধোঁয়া কিন্তু মিল্‌ছে সেই ঠাঁয়ে।
দুই নালীরই জলের ধারা এক ঠাঁয়েতেই হচ্ছে হারা।
দুই মোড়েতে মুখ ফিরিয়ে বসেছে দুই ভায়ে।
হয় না মনে ধরল পেটে এদেরে এক মায়ে॥

[পৃথক : পর্ণপুট]

কন্যাদায়ে বেহায়া বেয়ানের দাবি মিটানোর জন্য নিজ মায়ের কাঁকনজোড়া বিক্রি করতে স্বর্ণকারের দোকানে গিয়ে কন্যার পিতা যখন স্বর্ণকারকে কাঁকনজোড়া গলানো দেখাতে লাগল তখন তার মনের অবস্থার অভিব্যক্তি—

হাপরের দীর্ঘশ্বাসে রাঙা হ'ল কাঠের আঙার,
রক্ত-নেত্রে তিরস্কার যেন তাহা বহ্নি-দেবতার।

পুড়িতে লাগিল স্বর্ণ—তার সাথে আমার পাঁজর।
তরল হইল স্বর্ণ, নয়নে ঝরিল ঝরঝর,
পাষাণ গলিয়া অশ্রু। ফিরিলাম গৃহে আপনার
যেন রে দ্বিতীয়বার জননীর করিয়া সৎকার॥

[মায়ের কাঁকন : বৈকালী]

পল্লীবধূর আলেখ্য—

পল্লীর কুটীর জীর্ণ, নিতান্তই দরিদ্রের ঘর,
স্বল্প তার আয়োজন, চারিদিকে অভাব বিস্তর।
গৃহের দুঃখিনী বধূ নানা কাজে করে বিচরণ,
হাতে দুটি শাঁখা ছাড়া অঙ্গে কোন নাইক ভূষণ,
সীমন্ত ভরিয়া তার আছে শুধু উজ্জ্বল সিঁদুর
আয়তির চিহ্নটুকু, ভূষা বলি হবে কি মঞ্জুর?

[পল্লীবধূ : আহরণ]

পল্লীবাংলার গৃহলক্ষ্মীর রূপচিত্রণ—

রান্নাঘরের হলুদমাখা ময়লা তেলে জলে,
আটপহুরে শাড়ীর আঁচল থাকুক তোমার গলে।
নখ গেছে ক্ষয়ে বাটনা বেটে কুটনা কেটে আঙুল কেটে,
চুন খয়েরে দাগ পড়েছে তোমার করতলে।
জাহ্নবী তো হবেই মলিন আষাঢ় মাসের ঢলে॥

[গৃহলক্ষ্মী : পর্ণপুট]

পল্লীসন্ধ্যার সময়ে গৃহস্থালীব চিত্র—

করিয়া সেঁচা শেষ কৃষাণ প্রান্তরে,
ধুইতে কাদামাটি পুকুরে স্নান করে।
কৃষাণী চালাঘরে অন্নে থালা ভরে।
বাছুর ছাড়া পেয়ে অমৃত পান করে।
বউলতলে বসি বাউল গান ধরে॥

[পল্লীসন্ধ্যা : সন্ধ্যামণি]

পূর্বের সন্তান কৃষকজীবনের রূপরেখা—

খরানির রোদ পেয়ে কৃষাণী শুকায় ধান আর
ছোলা, মাষ, বড়ি, কুল-আমের আচার।
কুটীরের ছিটে-বেড়া দেওয়ালের পরে
ঘুঁটে দেয় ঘরের গোবরে।

মাঠে আর শস্য নেই, সারা মাঠ শূন্য করে ধু ধু
বৈকালে আখের ক্ষেতে যায় চাষী একবার শুধু।
চাষীদের করিতে পোষণ
সূর্য করে সমুদ্র শোষণ,
বাষ্পজালে রচি' মেঘ পাঠিয়ে সে দেয় একে একে।
চাষীর হৃদয় নাচে শিখিসম তাই দেখে দেখে ॥

[সূর্যের সন্তান : সন্ধ্যামণি]

জীর্ণসৌধের ইতিহাস প্রসঙ্গে উক্তি—

একশো বছর আগে সদাগরী গদির দেওয়ান
মুৎসুদ্দি অথবা বেনিয়ান—
যেই হোক একজন গড়েছিল মস্ত বাড়িখানা
তার আজ নাম নেই জানা।
সংখ্যায় অনেক হবে অংশীদার বংশধরগণ
একে একে অনেকেই অন্য ঠাঁয়ে করেছে গমন।
কেউ কেউ দীন দুঃস্থ দিয়ে আজ বহু ঘর ভাড়া,
নিভন্ত অঙ্গার হয়ে রাখে কুলধারা ॥

[জীর্ণ সৌধ : শ্রেষ্ঠ কবিতা]

শিক্ষকজীবনের স্মৃতিকথা—

ঘন ঘন আনাগোনা কত দিন দেখা-শোনা
তবু কেন মনে নাহি থাকে ?
ব্যক্তি ডুবে যায় দলে, মালিকা পরিলে গলে
প্রতি ফুলে কে বা মনে রাখে ?
এ জীবন ভেঙ্গে গড়ে শ্যামল সরস ক'রে
ছাত্রধারা ব'য়ে চলে যায়,
ফেনিলতা উচ্ছলতা হয়ে যায় তুচ্ছ কথা,
উত্তালতা সকলি মিলায় ॥

[ছাত্রধারা : আহরণী]

উপরের উদ্ধৃতিগুলি একটু ভালভাবে দেখলেই কবিশেখরের রচনাবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা করতে কষ্ট হয় না। তাঁর ভাষা কাব্যময় গদ্যের সমতুল্য হলেও বাস্তববোধসম্পন্ন স্বতঃস্ফূর্ত কবিত্বে মণ্ডিত এবং ক্ল্যাসিক্যাল মনোভঙ্গির নিদর্শনবিশিষ্ট। ভাবরূপ চিত্রসমূহ পরিচ্ছন্ন, হার্দ্য ও পুঙ্খানুপুঙ্খ।

'সন্ধ্যামণি' কাব্যচয়নিকার 'গ্রন্থকারের নিবেদন'-এ কবিশেখর লিখেছেন :

"আমি জানি রচনারীতির বৈশিষ্ট্যই কবির আসল বৈশিষ্ট্য। কারো, এমন কি কবিগুরুর রচনারীতিরও আমি জ্ঞাতসারে অনুকরণ করিনি,—জানি না রচনারীতির বৈশিষ্ট্য আমার কিছু আছে কিনা।"

কবিশেখরের রচনার বৈশিষ্ট্য অবশ্যই আছে, তবে তাঁর কথা অনুযায়ী জ্ঞাতসারে না হলেও অজ্ঞাতসারে তাঁর রচনায় যে রবীন্দ্রপ্রভাব এসে পড়েছে এ কথা না স্বীকার করে উপায় নেই।

কবিশেখরকে কেউ কেউ নীতিবাদীকবি বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু সামগ্রিকভাবে বিচার করলে দেখা যায় তাত্ত্বিকতা নয়, সাত্ত্বিকতাই তাঁর অভিপ্রেত ছিল। তিনি বাগ্‌বৈদগ্ধ্য ও অলংকার প্রয়োগ করে এই সাত্ত্বিকতাকে ফোটাতে চেয়েছেন এবং সেইভাবেই রসসৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছেন। 'সন্ধ্যামণি' কাব্যচয়নিকার 'গ্রন্থকারের নিবেদন'-এ কবি বলেছেন :

"আজকালকার সমালোচকরা কবির কাব্যে কোন একটা মতবাদ খোঁজেন, আমি কোন মতবাদের চারিপাশে ঘুরপাক খাইনি—তাত্ত্বিকতা আমার লক্ষ্য নয় সাত্ত্বিকতাই আমার লক্ষ্য। আমার বিশ্বাস, কবিতায় সরসতা যদি হয় ফুল, তবে তাত্ত্বিকতা তার ফল। মতবাদকে আমি কাব্যের অন্যতম উপাদান বলেই জানি।"

কবিশেখর কাব্যের রচনারীতির উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। তিনি যখন উষ্ট্র, সিংহ, বানর মহিষ ইত্যাদি প্রতীকধর্মী কবিতাগুলি লিখেছিলেন তখন আমাকে বলেছিলেন, কবি যদি গুম্ফনবিদ্যায় পারদর্শী না হন তবে তাঁর পক্ষে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কবিতা রচনা করা সম্ভবপর নয়। রচনারীতির গুরুত্ব স্বীকার নিশ্চয়ই করতে হবে, কিন্তু বিষয়বস্তু অবশ্যই উপেক্ষার বস্তু নয়। বস্তুত উভয়ের সম্মেলনেই অভিপ্রেত রসনিষ্পত্তি হয়। রসসৃষ্টির বিচারে কবিশেখর বেশ কিছু সংখ্যক স্মরণীয় কবিতা রচনা করে বাঙলা কাব্যভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন।

গীতরচনাতেও কবিশেখর নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর গীতি চয়নিকার গ্রন্থটি সত্বর প্রকাশিত হবে। এ ছাড়াও তাঁর 'গীতগোবিন্দ' (১৯৩০), 'গীতালহরী' (১৯৩২), 'শকুন্তলা' (১৯৪৪), 'কুমারসম্ভব' (১৯৫২), 'ইন্দুমতী' (১৯৫২) ও 'মেঘদূত' (১৯৫৫) নামক অনুবাদগ্রন্থে তিনি অশেষ কাব্যদক্ষতা দেখিয়েছেন।

শিশুসাহিত্যেও কবিশেখরের অবদান কম নয়! শিশু কবিতা রচনা করা ছাড়াও তিনি পুরাণ, জাতক, ইতিহাস, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি থেকে বিবিধ ধর্মমূলক কাহিনী গল্প ও প্রবন্ধাকারে রচনা করেছেন। তাঁর 'গাথামঞ্জরী,' 'গাথাকাহিনী', 'গল্পকাহিনী' ইত্যাদি পুস্তকগুলি শিশু ও কিশোরদের কাছে বিশেষভাবে পরিচিত। বাংলা দেশে শিশুপাঠ্য এমন কোনো গ্রন্থ বোধহয় পাওয়া যাবে না যাতে কবিশেখরের কোনো না কোনো রচনা গৃহীত হয় নি। 'তৃণদল' (১৯৭০) তাঁর কিশোর কবিতার চয়নিকা।

প্রবন্ধরচয়িতা হিসাবে কবিশেখর বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর 'প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য' (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড), 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়' (১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম খণ্ড), 'শরৎসাহিত্য' (১ম ও ২য় খণ্ড), 'সাহিত্যপ্রসঙ্গ' (১ম ও ২য় খণ্ড), 'পদাবলী সাহিত্য,' 'দ্বিজেন্দ্রলালের গান ও কবিতা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর বিশিষ্ট কাব্যচয়নিকা 'মাধুকরী' (১৯৬২)তে গভীর রসবোধ ও

গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়েছেন। বিভিন্ন রম্যরচনাতেও তাঁর রঙ্গব্যঙ্গবোধ, সামাজিক সমস্যাচেতনা, ধর্মনীতিজ্ঞান এবং সর্বোপরি এক জীবনরস-রসিকতাজনিত গভীর মানবিক অনুভূতির নিদর্শন পাওয়া যায়। এই সূত্রে তাঁর 'চণকসংহিতা', 'রঙ্গচিত্র', 'চালচিত্র' প্রভৃতি গ্রন্থগুলির নাম করা যেতে পারে।

ব্যাকরণ ও অলঙ্কারশাস্ত্রে যথেষ্ট জ্ঞান ছিল বলেই কবিশেখর উচ্চমানের গদ্যরীতি সহজে আয়ত্ত করেছিলেন। শিক্ষক হিসাবে তাঁর অভিজ্ঞতা এ বিষয়ে তাঁকে প্রভূত সাহায্য করেছে। তাঁর 'রচনাদর্শ' সম্পর্কে শরৎচন্দ্র যে মন্তব্য করেছিলেন তা এই সূত্রে উৎকলিত করা যেতে পারে। শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন :

"শ্রীমান কালিদাস রায় আজ বাইশ বৎসর শিক্ষকতা করিতেছেন এবং ত্রিশ বৎসর ব্যাপী সাহিত্যসেবা করিয়া আসিয়াছেন। বাঙ্গলা ভাষা রচনায় ছাত্রগণকে আদর্শ রীতি শিক্ষা দেওয়ার অধিকার তাঁহার যতখানি আছে বলিয়া জানি, তাহা কম লোকেরই দেখিয়াছি। এত বড় কথাটা অকপটে বিশ্বাস করি বলিয়াই লিখিতে পারিলাম, না হইলে পারিতাম না ; বলিতে নিজেরই লজ্জা করিত। তাঁহার এই রচনার বইখানি আমি আদ্যোপান্ত মনোযোগের সহিত, শ্রদ্ধার সহিত পড়িয়াছি এবং উপকৃত হইয়াছি। যে কেহ বাঙ্গালা ভাষা বিশুদ্ধ ও সরস করিয়া লিখিতে চাহেন, তাঁহাকেই পড়িতে অনুরোধ করি। পড়া ব্যর্থ হইবে না।"

[শরৎসান্নিধ্যে গ্রন্থের পরিশিষ্ট]

কবিশেখরের মধ্যে সৎ কবি, আদর্শ শিক্ষক, নিষ্ঠাবান পণ্ডিত এবং জীবনরসরসিকের এক আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছিল। তাঁর মুখ্যগুণ কবিত্বের মধ্যে অন্যগুণগুলিও পরিস্ফুট। সামগ্রিক দৃষ্টিতে তিনি রবীন্দ্রযুগে রবীন্দ্রপ্রভাবিত হলেও একজন বিশিষ্ট কবিব্যক্তিত্ব। তিনি তাঁর 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ' (শ্রেষ্ঠ কবিতা) কবিতায় দৃঢ়কণ্ঠে সে কথা ঘোষণা করেছেন—

চাহি না সুলভ যশ, সঙ্গীতে না দিয়া রস
ভঙ্গীতে হবে কি বশ চিত্ত সবাকার ?
ঝিমন্তেরে চেতাইতে আমার রচিত গীতে
চোখে কি আঙুল দিতে হবে বারবার ?
ফুরায়ে গিয়াছে দিন, এবে জলহারা মীন
উপদেশ সমীচীন কেন মনে করো ?
যশ হোক, মান হোক, ইহলোক, পরলোক
আমার স্বধর্ম হো'ক সবচেয়ে বড় !

কবিশেখর একজন স্বধর্মনিষ্ঠ কবি রূপে বাঙলা কাব্যজগতে চিরকালই স্মরণীয়।

কবিশেখরের ছন্দচিন্তা

ডঃ প্রবোধচন্দ্র সেন

কবিশেখর কালিদাস রায় ছান্দসিক বলে তেমন প্রখ্যাত ছিলেন না। তাঁর খ্যাতি প্রধানত কবি এবং সুপণ্ডিত সাহিত্যসমালোচক ও সুদক্ষ ব্যাকরণকার হিসাবে। গদ্যভাষার ব্যাকরণ-রচনায় যাঁর স্থান সর্বোচ্চ সারিতে, পদ্য-রচনার ছন্দ বিশ্লেষণেও তাঁর কাছে অনুরূপ দক্ষতাই প্রত্যাশিত ছিল। দুঃখের বিষয়, যে আগ্রহ ও নিষ্ঠা নিয়ে তিনি গদ্যভাষার ব্যাকরণ-রচনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন তেমন আগ্রহ ও নিষ্ঠা নিয়ে তিনি বাংলা ছন্দের বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হন নি। প্রধানত প্রাচীন ও আধুনিক কাব্য-সমালোচনার আনুষঙ্গিক বিষয় হিসাবে বিভিন্ন কবি ও কাব্যের ছন্দো-বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়েই তিনি তৃপ্ত ছিলেন। তবে এক্ষেত্রেও তাঁর কৃতিত্ব অ-সামান্য। যতদূর জানি, আর কোনো সমালোচক প্রাচীন ও আধুনিক কাব্যের ছন্দোগত স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্টতার এমন ব্যাপক পরিচয় দেন নি, শুধু সত্যেন্দ্রনাথের 'ছন্দ-সরস্বতী' প্রবন্ধে এবং মোহিতলালের 'বাংলা কবিতার ছন্দ' গ্রন্থে ও নানা প্রবন্ধে তার কিছু-কিছু প্রচেষ্টা দেখা যায়। যা হোক, কাব্যালোচনার অনুষঙ্গ হিসাবে উপস্থাপিত হলেও ছন্দের স্বরূপ-নিরূপণে কলিদাস রায়ের অধিকার সম্বন্ধে আচার্য সুনীতিকুমারের উক্তি (পরিচায়িকা, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য, প্রথম খণ্ড) স্মরণীয়।—

"লেখক স্বয়ং কবি, সমগ্র বাংলাসাহিত্যে বিশেষজ্ঞ কবি, ছন্দ বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টিকোণ কৃতবিদ্য ও কৃতকর্মা ছন্দোবিদের দৃষ্টিকোণ। সুতরাং এ বিষয়ে তাঁহার আলোচনা মূল্যবান্ হইয়াছে।"

কলিদাস রায় নিজে সুনিপুণ ছন্দশিল্পী কবি, তাই তিনি 'কৃতকর্মা ছন্দোবিদ্' আর সংস্কৃত, প্রাকৃত, হিন্দী ও ইংরেজি ছন্দশাস্ত্রে তিনি ছিলেন কৃতবিদ্য। অধিকন্তু কৃতবিদ্য ছন্দোবিদের এই দৃষ্টি ছিল একাধারে বিশ্লেষকের এবং ঐতিহাসিকের দৃষ্টি। তাই তাঁর অধিকাংশ ছন্দ আলোচনাতেই এই উভয়বিধ দৃষ্টির সমন্বিত প্রকাশ দেখা যায়। এক্ষেত্রে তাঁর সমপর্যায়ের ছন্দ-সমালোচক বোধকরি এখন পর্যন্ত আর কেউ আসেন নি আমাদের দেশে। কাব্যবিচারের অঙ্গ হিসাবে রচিত তাঁর সব ছন্দ-সমালোচনা ছড়িয়ে আছে তাঁর নানা গ্রন্থে বিভিন্ন প্রবন্ধের অংশ হিসাবে। তা ছাড়া, 'ছন্দের কথা' নামে তাঁর একটি অতি মূল্যবান্ প্রবন্ধ কয়েকটি পর্বে বিভক্ত হয়ে দীর্ঘকাল পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় (১৩৩৩ পৌষ, ১৩৩৪ বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, অগ্রহায়ণ)। এই মহামূল্যবান প্রবন্ধটি আধুনিককালে হয় বিস্মৃত বা উপেক্ষিত হয়ে আছে, আর অনেকের কাছে অজ্ঞাতই রয়ে গেছে। 'মৈত্রী' নামে মিত্র ইনস্টিটুশনের একটি অখ্যাত ক্ষুদ্রাকৃতি স্কুল ম্যাগাজিনের চতুর্থ বর্ষ প্রথম সংখ্যায় (সাল-তারিখ অজানা) পদ্যভাষার ব্যাকরণ সম্পর্কে তাঁর একটি ছোট অথচ মূল্যবান্ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধের একটি অংশের (পৃ ৫-১৪) নাম 'ছন্দোহিল্লোল'। এই চমৎকার রচনাংশটি

আজ ছন্দ-জিজ্ঞাসুদের চোখের আড়ালে চলে গেছে। তাঁর নব-প্রবেশিকা ব্যাকরণ বইটির (১৯৪৯) অতি সংক্ষিপ্ত (১৩ পৃষ্ঠা) অথচ অতি সুন্দর ছন্দঃপ্রকরণটিও ছাত্রপাঠ্য পুস্তকের অন্তর্গত বলেই অবজ্ঞাত হয়ে আছে। তা ছাড়া, সম্প্রতি কালিদাস রায়ের উৎসাহী পুত্রদ্বয় শ্রীমান্ কবিরঞ্জন ও কবিকঙ্কণের সহায়তায় আরও আটটি ছন্দ-প্রবন্ধের সন্ধান পেয়েছি। সেগুলির প্রতিও আগ্রহী গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা গেল।— মিত্রাক্ষর (বঙ্গবাণী, ১৩৩৩ জ্যৈষ্ঠ), রচনার আলংকারিকতা (সম্মেলনী, ১৯৪০ আগষ্ট) ভারতচন্দ্রের ভাষা ও ছন্দ (বঙ্গশ্রী, ১৩৫০ চৈত্র), জয়দেবী ছন্দের বৈচিত্র্য (শিক্ষাসাহিত্য, ১৩৫১, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়), চর্যাপদের ছন্দোবৈচিত্র্য (বঙ্গশ্রী, ১৩৫২ মাঘ), আবৃত্তি ও বঙ্গ কাব্যসাহিত্য (বঙ্গশ্রী, ১৩১২ ফাল্গুন), ছন্দোহিল্লোল (আনন্দবাজার, তারিখ অজানা) এবং ছন্দোবৈচিত্র্য (রসাদর্শ তৃতীয় ভাগ)। স্পষ্টই বোঝা যায়, এই আটটি প্রবন্ধের মধ্যে কতকগুলির গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত বেশি এবং বাংলা ছন্দের ব্যাকরণ তথা ইতিহাস আলোচনার পক্ষে অপরিহার্য। কিন্তু এগুলিও সংগুপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে নানা দুষ্প্রাপ্য পত্রপত্রিকার জীর্ণ মলিন পাতায়। এসব কারণে বাংলা ছন্দচর্চার ক্ষেত্রে কবি-ছান্দসিক কালিদাস রায়ের কৃতিত্ব কতখানি তার সামগ্রিক উপলব্ধি সহজসাধ্য নয়। তাঁর এসব রচনা যদি কোনো গ্রন্থে সংকলন করে সুসমন্বিতরূপে প্রকাশ করা যায়, তা হলে বাংলার শ্রেষ্ঠ ছান্দসিক বা কবি-ছান্দসিকদের পাশেই তাঁর আসন নির্দেশ করতে হবে। যতদিন এ-রকম গ্রন্থ প্রকাশিত না হবে ততদিন বাংলা ছন্দসাহিত্য একটা মূল্যবান্ সম্পদ্ থেকে বঞ্চিত থাকবে এবং ছন্দোবেত্তা কালিদাস রায়ের একটি মহৎ কৃতিত্বের কথাও অজ্ঞাত থেকে যাবে।

এখানে ছন্দোবিদ্ কালিদাস রায়ের ছন্দোদৃষ্টির বা তার বিচারবৈশিষ্ট্যের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয়, সে-রকম পরিচয় দেবার ক্ষেত্রও এটা নয়। এবিষয়ে বাংলা ছন্দ-সমীক্ষা' এবং 'বাংলার ছন্দচিন্তার ক্রমবিকাশ' গ্রন্থে * বিভিন্ন প্রসঙ্গে কিছু কিছু আলোচনা করেছি। এখানে অন্য কোনো-কোনো বিষয়ে তার দৃষ্টিবৈশিষ্ট্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়াই আমাদের অভিপ্রায়। তার পূর্বে কালিদাস রায়ের ছন্দচর্চার পরিসর এবং তার আলোচিত বিষয়ের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে কিছু বলে নেওয়া দরকার। তার ছন্দচর্চাকে নিম্নলিখিত তিন শ্রেণীতে ফেলা যায় —

(১) কবিকৃত রচনার ছন্দবিচার। এই শ্রেণীতে পড়ে বড়ায়ি, কৃত্তিবাস, বড়ু চণ্ডীদাস, বিজয় গুপ্ত, নারায়ণ দেব, ক্ষমানন্দ, লোচনদাস, গোবিন্দদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, নরহরি চক্রবর্তী, জগদানন্দ, শচীনন্দন, রায়শেখর, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, দাশু রায়, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ কবিদের ছন্দোবৈশিষ্ট্যের স্বল্পাধিক পরিচয়। এই কাজ সর্বত্র সমভাবে বা কবিদের ছন্দপ্রতিভার সমানুপাতে করা হয় নি, সংহতভাবেও করা হয় নি। কারও (যেমন মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্র) ছন্দের আলোচনা করা হয়েছে অপেক্ষাকৃত বিশদভাবে, আবার কারও ছন্দ সম্পর্কে দু-একটি প্রাসঙ্গিক মন্তব্য-মাত্রই করা হয়েছে কিংবা দু-একটি পদ্যাংশ উদ্ধৃত করে রচয়িতার ছন্দকুশলতা বা ব্যর্থতার আভাসমাত্র দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া, কারও কারও ছন্দের কথা নানা প্রসঙ্গে বিচ্ছিন্নভাবে আলোচিত

* 'বাংলা ছন্দ-সমীক্ষা', জিজ্ঞাসা (১৯৭৭। ১৩৮৪ বৈশাখ), 'বাংলা ছন্দ-চিন্তার ক্রমবিকাশ,' অণিমা প্রকাশনী (১৯৭৮।১৩৮৫ বৈশাখ)।

বা উল্লিখিত হয়েছে। এ-রকম হবার কারণ, এসব আলোচনা করা হয়েছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষে। পরে গ্রন্থাকারে একত্র সংকলিত হয়েছে, অসম্পাদিত ও অসমন্বিত রূপে। ফলে পরিভাষা-ব্যবহারেও সমতা রক্ষিত হয় নি।

(২) ছন্দ-বিবর্তনের ইতিহাস। এই ইতিহাস পাওয়া যায়—ছন্দের কথা, চর্যাপদ, বিদ্যাপতি, বড়ু চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, গৌর-পদাবলী, পদাবলীর ছন্দ, কবিকঙ্কণের ভাষা ও ছন্দ, ভারতচন্দ্রের ছন্দ ও অমিত্রাক্ষর ছন্দের পরিণতি, প্রধানত এই কয়টি প্রবন্ধে। এগুলির মধ্যে সর্বাধিক মূল্যবান্ 'ছন্দের কথা' ও 'পদাবলীর ছন্দ,' এই দুটি প্রবন্ধ। বাংলা ছন্দচর্চার ইতিহাসে এ-দুটি প্রবন্ধ স্থায়ী আসনের অধিকারী হয়ে থাকবে। এই দুই প্রবন্ধে কবি কালিদাস রায়ের ছন্দোদৃষ্টির ব্যাপকতা, গভীরতা ও সূক্ষ্মতা সমভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। 'ছন্দের কথা' প্রবন্ধের প্রধান লক্ষ্য 'ললিত লবঙ্গলতা-পরিশীলন' ইত্যাদি ২৮ মাত্রার 'জয়দেবী ছন্দে'র উদ্ভব ও বিকাশ, এবং তার পরিণতি ও বৈচিত্র্যের সবিশেষ পরিচয় দেওয়া। এই উপলক্ষে তিনি একদিকে সংস্কৃত, প্রাকৃত, হিন্দী, গুজরাতী প্রভৃতি উত্তর-ভারতীয় বিভিন্ন ভাষার বিভিন্ন কবির রচনা এবং অপর দিকে চর্যাগীতি ও বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস প্রমুখ বৈষ্ণব কবি থেকে শুরু করে বহু প্রাচীন ও আধুনিক বাঙালী কবির অজস্র রচনাংশ দৃষ্টান্তস্বরূপ উদ্ধৃত করে আপন বক্তব্য সপ্রমাণ করেছেন। শুধু এই একটি ব্যাপারে তাঁর বিস্ময়কর পাণ্ডিত্যের যে পরিচয় পাওয়া যায়, বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা নেই। আর 'পদাবলীর ছন্দ' প্রবন্ধটিকে উক্ত 'ছন্দের কথা' প্রবন্ধেরই অনুবর্তন ও পরিপূরণ বলে মনে করা যেতে পারে। এই প্রবন্ধটির মূল্যবত্তাও কম নয়। বরং 'ছন্দের কথা'র তুলনায় স্বল্পতর পরিসরে ও সংহতরূপে বিবৃত হবার ফলে এটির বক্তব্য বিষয় অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। তা ছাড়া, এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়ও ব্যাপকতর। মুখ্যতঃ এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য বৈষ্ণব ব্রজবুলি ছন্দের উদ্ভব, বিকাশ ও বৈচিত্র্যের পরিচয় দেওয়া। এই উপলক্ষে লেখক বিভিন্ন প্রাকৃত মাত্রাবৃত্ত ছন্দের সঙ্গে ব্রজবুলি মাত্রাবৃত্তের জন্মগত সম্পর্ক নিরূপণ করেছেন অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে। তা ছাড়া ব্রজবুলি মাত্রাবৃত্ত থেকে উদ্ভূত উত্তরকালীন বাংলা মাত্রাবৃত্তের জন্মলব্ধ সাদৃশ্যের পরিচয়ও তিনি দিয়েছেন অনুরূপ নৈপুণ্যের সঙ্গেই। কিন্তু এখানেই তিনি ক্ষান্ত হন নি। প্রাচীন মাত্রাবৃত্ত থেকে বাংলা অক্ষরমাত্রিক (মিশ্রবৃত্ত) ও পাদকমাত্রিক (দলবৃত্ত) পয়ার ও দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দোবন্ধ কিভাবে উৎপন্ন হয়েছে, প্রবন্ধশেষে তিনি সংক্ষেপে তা-ও দেখাতে চেষ্টিত হয়েছেন। এই শেষ প্রতিপাদ্য বিষয়ে তাঁর সঙ্গে সকলে একমত হয় তো হবেন না, কিন্তু মূল প্রতিপাদ্য বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্তের গুরুত্বও কেউ অস্বীকার করবেন না বলেই আমার বিশ্বাস।

(৩) ছন্দ-ব্যাকরণ। ইস্কুলের সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য লেখা কালিদাস রায়ের 'ব্যাকরণ দীপিকা' (১৯[illegible]) পুস্তকের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের সুচিন্তিত ও সুসংবদ্ধ ছন্দপ্রকরণটি গ্রন্থপ্রকাশের সময়েই আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। পরবর্তীকালে এই ছন্দপ্রকরণটি কিছু পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত রূপে উচ্চতর শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য লেখা তাঁর 'নব প্রবেশিকা ব্যাকরণ' গ্রন্থে গৃহীত হয়। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ (আনুমানিক ১৯৪৯) আমি দেখেছি। পরবর্তী কোনো সংস্করণ দেখার সুযোগ আমার চোখে পড়ে নি। তা ছাড়া, তাঁর লেখা ছন্দের বিশ্লেষণাত্মক অন্য কোনো ও লেখা

আমার চোখে পড়ে নি। তবে এই ছন্দপ্রকরণটি আয়তনে ছোট হলেও এটিতে কবি কালিদাস রায়ের বিশ্লেষণাত্মক ছন্দচিন্তার সামগ্রিক রূপের পরিচয় পাওয়া যায় বলেই মনে করি। কারণ তাঁর অন্যান্য ছন্দ-প্রবন্ধে তিনি প্রসঙ্গক্রমে যেসব পরিভাষা ব্যবহার করেছেন এবং যেভাবে বাংলা ছন্দের আংশিক বিশ্লেষণ করেছেন, এই ছন্দঃপ্রকরণটির সঙ্গে সেসবের কোনো বিরোধ প্রায় দেখা যায় না। বরং এটিতে সেসবের সংহত ও সুবিন্যস্ত প্রকাশই দেখা যায়। তাই বলা যায়, কালিদাস রায়ের ব্যাকরণাত্মক ছন্দচিন্তার পরিচয় দেবার পক্ষে এই ছন্দঃপ্রকরণটি একমাত্র না হলেও প্রধানতম ও নির্ভরযোগ্য অবলম্বন। এখানে তাঁর ওই ছন্দচিন্তার একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল।

প্রথমেই বলা উচিত যে, কালিদাস রায় ছন্দোগত ধ্বনির যথাযথ বিশ্লেষণ এবং পারিভাষিক শব্দের যথাযথ প্রয়োগের গুরুত্ব ও আবশ্যকতার প্রতি বেশি মনোনিবেশ করেন নি। তাঁর মনোযোগ ছিল প্রধানতঃ ছন্দের রূপ অর্থাৎ বহিরাকৃতি ও তার ব্যবহারিক বিশিষ্টতার প্রতি। এটাই তাঁর সমস্ত ছন্দ-আলোচনার, বিশেষতঃ উক্ত ছন্দঃপ্রকরণটির মৌলিক বা প্রধান দুর্বলতা। তাঁর লেখা পড়ে বাংলা ছন্দ সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান লাভের প্রধান অন্তরায়ও এটাই। অথচ তাঁর এসব লেখা বাংলা ছন্দের সৌন্দর্য উপলব্ধির পরম সহায়ক। আর কারও আলোচনাতেই ছন্দ-সৌন্দর্য উপলব্ধির এতখানি সহায়তা হয় বলে মনে হচ্ছে না। রবীন্দ্রনাথের আলোচনায় ছন্দ-রসবোধ উদ্রিক্ত হয় বটে, কিন্তু সে রসবোধ হয় ছাড়া-ছাড়া ভাবে, প্রণালীবদ্ধ রূপে মোটেই নয়।

প্রথমেই তাঁর পরিভাষা-ব্যবহারের বিষয়টা দেখা যাক। ছন্দের তিন রীতির প্রসঙ্গে তাঁর একটি উক্তি এই—"বাঙ্গলায় ছন্দ প্রধানতঃ তিন শ্রেণীর—অক্ষর-বৃত্ত, স্বর-বৃত্ত ও মাত্রা-বৃত্ত। এই নামগুলি ব্যবহার না করিয়া ছাত্রগণের সুবিধার জন্য অক্ষর-মাত্রিক, স্বর-মাত্রিক ও পাদক-মাত্রিক এই তিনটি কথা ব্যবহার করিব।" বলা প্রয়োজন যে, তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধেও এই শেষোক্ত তিন নামই দেখা যায়। লক্ষ্য করার বিষয়, প্রচলিত স্বরবৃত্ত ও মাত্রাবৃত্ত নাম-দুটিকে তিনি যথাক্রমে স্বরমাত্রিক (moric) এবং পাদকমাত্রিক (syllabic) ছন্দের নাম বলেই ধরেছেন। অর্থাৎ তাঁর মতে 'স্বরবৃত্ত' নামের স্বর মানে vowel এবং 'মাত্রাবৃত্ত' নামের মাত্রা মানে syllable বলেই প্রতীত হয়েছিল।

কালিদাস রায়ের মতে 'অক্ষর' চার রকম। 'অকস্মাৎ' শব্দে এই চার রকমের চারটি অক্ষর আছে। অক্ষর-মাত্রিক ছন্দে এই চার রকম অক্ষরই এক মাত্রা বলে গণ্য হয়। বলা বাহুল্য, এ-রকম মাত্রানিরূপণ দৃষ্টিনির্ভর, শ্রুতিনির্ভর নয়। সুতরাং অগ্রহণীয়। ৎ-কে তিনি বলেছেন 'হসন্ত ব্যঞ্জন'। বলা উচিত অস্বরান্ত ব্যঞ্জন বা খণ্ড-ব্যঞ্জন। ৎ, ন্ প্রভৃতি খণ্ড-ব্যঞ্জন স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারিত হয় না। সুতরাং এগুলির মাত্রাও থাকতে পারে না। এ বিষয়ে তাঁর অভিমতও অবশ্য একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। বস্তুত, এ একটি স্বতন্ত্র ধারার, অন্য দৃষ্টিকোণের বিচার।

স্বরমাত্রিক ছন্দে এক-একটি লঘুস্বরে এক-এক মাত্রা গণনীয়। কেবল ঐ, ঔ এবং যুক্তাক্ষরের পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ বা গুরু, সুতরাং দ্বিমাত্রক বলে গণ্য। "হসন্ত বর্ণের জন্যও একটি মাত্রা ধরা হয়।" তাঁর এই মত মানলে অনুস্বার-বিসর্গেও এক মাত্রা ধরতে হবে। নতুবা এই রীতির ছন্দে বংশী বা দুঃখী শব্দে তিন-মাত্রা ধরা যাবে না। ং ঃ ৎ ন্ প্রভৃতি খণ্ডবর্ণের মাত্রা থাকতে পারে না।

তাঁর মতে 'জলসিঞ্চিত। ক্ষিতিসৌরভ। রভসে'—এটি হচ্ছে 'স্বরবৃত্ত বা স্বর-মাত্রিক' ছন্দ। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, কালিদাস রায় সুপরিচিত 'স্বরবৃত্ত' নামের 'স্বর'-কে স্বরবর্ণ অর্থেই গ্রহণ করেছেন, সিলেব্‌ল্‌ অর্থে নয়। ফলে তিনি 'স্বরবৃত্ত'কে পূর্বতন 'মাত্রাবৃত্ত' নামের স্থলবর্তী বলেই মনে করতেন। তাঁর মতে অধুনাতন 'মাত্রাবৃত্ত' মানে পাদক-মাত্রিক (syllabic)

তৃতীয় শ্রেণীর ছন্দের ধ্বনিবিশ্লেষণে ও নিরূপণে এ-রকম কোনো ত্রুটি ঘটে নি। এই তৃতীয় শ্রেণীর ছন্দকে তিনি বলেছেন পাদকমাত্রিক বা দলমাত্রিক (syllabic)। এই ছন্দের ধ্বনিবিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—"একটি শব্দকে বিশ্লেষণ করিলে যতটুকু অংশ এক সঙ্গে উচ্চারিত হয়, ততটুকুর নাম পাদক বা দল (syllable)।" সিলেব্‌ল্‌ ও সিলেবিক অর্থে যথাক্রমে কালিদাস-স্বীকৃত দল ও দলমাত্রিক শব্দ-দুটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই ছন্দোরীতির প্রসঙ্গে তাঁর আর-একটি উক্তি উদ্ধৃতিযোগ্য। —"ইহাকে লাচাড়ি বা ছড়ার ছন্দও বলে।·· এই শ্রেণীর বহু চরণ কাশীরাম-কৃত্তিবাসের অক্ষরমাত্রিক পয়ারের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়।·· বোধহয় বৈষ্ণব কবি লোচনদাস সর্বপ্রথম এই ছন্দে পদ রচনা করেন। লোচনদাসের এই শ্রেণীর পদকে ধামালি বলে।"

এর থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, লোচনদাসের 'ধামালি' পদগুলি 'লাচাড়ি' ছন্দে রচিত— এ কথা বলাই কালিদাস রায়ের অভিপ্রায়। অর্থাৎ ধামালি এক শ্রেণীর পদাবলীর নাম, কোনো ছন্দো-রীতির নাম নয়। ধামালি-পদাবলী যে ছন্দে রচিত হয়েছিল তারই নাম 'লাচাড়ি'। এ বিষয়টি যথাস্থানে আবার উত্থাপন করা যাবে।

এই তো গেল ছন্দোরীতির (verse styles) কথা। ছন্দোবন্ধ বা ছন্দোরূপের (verse forms) প্রসঙ্গে সবচেয়ে বড় কথা এই যে—পয়ার ত্রিপদী চৌপদী প্রভৃতি প্রায় সব ছন্দোবন্ধই যে তিন রীতিতেই রচিত হতে পারে, এ কথা কালিদাস রায় যথেষ্ট দৃষ্টান্তযোগে বেশ ভাল করে দেখিয়েছেন তাঁর এই ছোট ছন্দ-প্রকরণটিতে। অথচ এই গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক তথ্যটুকু কেন জানি না অনেকেরই দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। কিন্তু পারিভাষিক শব্দের যথাযথ ব্যবহারে অসতর্কতা বা ঔদাসীন্যের ফলে ছন্দের রূপবৈচিত্র্যের প্রসঙ্গটা অনেকাংশে যেন অস্পষ্ট ও বিভ্রান্তিকর হয়ে গেছে। কবির দ্বারা ছন্দ আলোচনায় এ ধরনের বিচ্যুতি ঘটা এজন্যেই সম্ভব যে, তিনি অনেক সময়ে হয়তো ভুলেই যান যে, পাঠকদের অনেকের প্রাথমিক ছন্দোবোধ না-ও থাকতে পারে।

ছন্দোরূপের আলোচনায় প্রথম প্রয়োজন যতির তারতম্যভেদ এবং তদনুসারে বিভিন্ন ছন্দো-বিভাগের পারিভাষিক নামগুলির যথাযথ পরিচয় দেওয়া। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি এই গ্রন্থের ছন্দ-প্রকরণে একেবারেই উপেক্ষিত হয়েছে। দু-বার যতি ও একবার অর্ধযতি শব্দের উল্লেখ আছে, কিন্তু ব্যাখ্যা নেই। তাতে কি বিভ্রান্তি হয় দেখাচ্ছি। পয়ারের প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—"৮ম ও ১৪শ মাত্রার পরে (অর্থাৎ চরণের শেষে) যতি পড়িবে।" এই দু-রকম যতির মধ্যে তারতম্যগত কোনো পার্থক্য আছে কিনা তা বলা হয়নি। তার পরে আছে 'অক্ষর-মাত্রিক পয়ার' [৮+৬]* ছন্দের দৃষ্টান্ত—

মহাভারতের কথা । অমৃত সমান ।
কাশীরাম দাস কহে । শুনে পুণ্যবান্ ॥—কাশীরাম

এ প্রসঙ্গে আবার বলেছেন—"প্রত্যেক চারি অক্ষরের পব অর্ধযতি দিযাও পয়ার লেখা যায় ।" যেমন –

বস-তাদি । অধিকার । ছাড়ে ছয় । ঋতু ।
নিত্য ভয । পায় সব । রাবণের । হেতু ॥—কৃত্তিবাস

এখানে কি পঙক্তির প্রথম তিন যতিকেই 'অর্ধযতি' বলা হবে ? তা বোঝা গেল না। এর কিছু পরেই আছে 'পাদক-মাত্রিক পয়ার' [৪+৪+৪+২] ছন্দের দৃষ্টান্ত—

দিনের আলো । নিভে এলো । সূর্যি ডোবে । ডোবে ।
আকাশ জুড়ে । মেঘ করেছে । চাঁদের লোভে । লোভে ।।

এর প্রতি পূর্ণপর্বে আছে চার পাদক (syllable) মাত্রা। এ সম্বন্ধে বলা হযেছে –"প্রত্যেক পর্বের পরে যতি।" এই তিন দৃষ্টান্তের বিশ্লেষণে ও পরিভাষা ব্যবহারে অনেক অস্পষ্টতা ও অসংগতি দেখা যায়। যেমন, অক্ষরমাত্রিক পয়ার মানে ৮+৬ মাত্রার ছন্দ। এই আট ও ছয মাত্রার বিভাগ-দুটিকে কি বলা হবে—পদ না পর্ব ? ৪+৪+৪+২ পাদকমাত্রার পয়ারের বিভাগগুলিকে বলা হয়েছে পর্ব। এই আদর্শ অনুসারে ৪+৪+৪+২ অক্ষর-মাত্রিক পয়ারের অনুরূপ বিভাগগুলিকেও কি পর্ব বলা যায় না ? প্রকৃতপক্ষে কবিশেখর ছন্দ বিশ্লেষক ছিলেন না, তিনি ছিলেন ছন্দ রচয়িতা। আসলে তিন রীতির পয়ারেই চার মাত্রার বিভাগগুলিকে বলা উচিত 'পর্ব' এবং শেষের দুই মাত্রার বিভাগটিকে বলা যায় অপূর্ণপর্ব বা 'খণ্ডপর্ব'। এই শেষ খণ্ডপর্বের পরেই আবৃত্তির পূর্ণ বিরতি ঘটে। তাই এই বিরতিকে বলা যায় 'পূর্ণযতি'। তারই অনুসরণে প্রথম দুই পর্বের পরবর্তী অপেক্ষাকৃত কম গুরু বিরতিকে বলা যায় 'অর্ধযতি'। প্রথম ও তৃতীয় পর্বের পরবর্তী যতি-দুটির গুরুত্ব আরও কম। তাই এ-দুটিকে বলা যায় 'লঘুযতি'। পূর্ণযতি, অর্ধযতি ও লঘুযতি-সূচিত বিভাগগুলিকে যথাক্রমে পঙক্তি, পদ ও পর্ব নামে অভিহিত করলেই সহজবোধ্যরূপে দ্বিপদী ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দোরূপের পরিচয় দেওয়া সম্ভব হয়।

ভূতের মতন । চেহারা যেমন । নির্বোধ অতি । ঘোর ।

কালিদাস রায়ের মতে এই চরণে আছে তিনটি ছয় মাত্রার পুরো পর্ব এবং একটি দুই মাত্রার ভাঙা পর্ব, মোট চার পর্ব ; তাই তার নাম 'লঘু ত্রিপদী'। অর্থাৎ এই এক চরণে আছে তিন পদ। চরণ ও পদ, এই দুটি অভিন্নার্থক শব্দ এখানে প্রযুক্ত হয়েছে ভিন্নার্থে। এই পারিভাষিক ত্রুটি নিরসনের জন্য আমি ছন্দের বৃহত্তম অর্থাৎ [পূর্ণযতি-সূচিত] বিভাগকে বলি পঙক্তি। কালিদাস রায়েরও অন্য নানা রচনায় এই অর্থেই 'পঙক্তি' শব্দের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। আর এক সমস্যা—এই পঙক্তির চার পর্বে তিন 'পদ' হল কেমন করে ? আর পদ বলতে কি বোঝায় ? এই পঙক্তির যতিগুলির প্রতি একটু মন দিয়ে তুলনা করলে বোঝা যাবে, দ্বিতীয় যতিটির গুরুত্ব শেষ অর্থাৎ চতুর্থ যতির তুলনায় কিছু কম এবং প্রথম ও তৃতীয় যতির গুরুত্ব আরও কম। অতএব

চতুর্থটিকে পূর্ণযতি, দ্বিতীয়টিকে অর্ধযতি এবং প্রথম ও তৃতীয়টিকে লঘুযতি বললেই এদের গুরুত্বগত তারতম্য স্পষ্ট বোঝা যায়। অর্ধযতির বিভাগকেই বলা হয় পদ। কাজেই উদ্ধৃত পঙক্তিটিকে ত্রিপদী না বলে 'দ্বিপদী' বলাই সমীচীন।

উদ্ধৃত 'লঘু ত্রিপদী' দৃষ্টান্তটির শেষ খণ্ডপর্বে আছে দুই মাত্রা। কালিদাস রায়ের মতে এ-রকম "ত্রিপদীর চতুর্থ পর্বে ৪ মাত্রার বেশী থাকিলে চৌপদী বলা হয়।" তাই

১। সকলের তরে। সকলে আমরা। প্রত্যেকে আমরা। পরের তরে॥
২। যেদিন সুনীল। জলধি হইতে। উঠিলে জননি। ভারতবর্ষ।।

এই জাতীয় ছন্দকে তিনি বলেছেন 'লঘু চৌপদী'। 'লঘু ত্রিপদী' পঙক্তির শেষ অপূর্ণ পর্বটি পূর্ণ বা প্রায়-পূর্ণ হলেই তাকে চৌপদী বলে গণ্য করার কোনো কারণ নেই। আসলে এদুটি পঙক্তিও ('ভূতের মতন' ইত্যাদি পঙক্তির মতোই) দ্বিপদী-চৌপদী তো নয়ই, ত্রিপদীও নয়। এই শেষ দুই দৃষ্টান্তের মধ্যে প্রথমটি প্রায়-পূর্ণ দ্বিপদী, দ্বিতীয়টি পূর্ণ দ্বিপদী।

এই ছন্দ-প্রকরণে রীতি অর্থে 'বৃত্ত' শব্দের ব্যবহারও দেখা যায়। যেমন—অক্ষর-মাত্রিক বৃত্ত, পাদক-মাত্রিক বৃত্ত। অমিত্রাক্ষরের প্রসঙ্গে 'ছেদ' ও 'যতি'র পার্থক্য স্বীকৃত হয়েছে, কিন্তু কবি বিশ্লেষণ করে আর দেখান নি। শুধু ব্যকরণের ছন্দপ্রকরণে নয়, কালিদাস রায়ের অন্যান্য রচনাতেও প্রায়শঃ তাঁর ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দের সঙ্গে আমাদের গৃহীত শব্দের বৈষম্য আছে। অতিপর্ব, স্বরোদ্ঘাত (accent), যৌগিক স্বর (diphthong) প্রভৃতি কয়েকটি স্বল্পব্যবহৃত পরিভাষায় অর্থগত অনির্দিষ্টতা দেখা যায় না। কিন্তু শুধু সিলেব্‌ল্ অর্থেই বিভিন্ন সময়ে ব্যবহৃত হয়েছে পদাংশ, পদক ও পাদক শব্দ এবং ছন্দপ্রকরণে দেখা যায় দল শব্দের ব্যবহার। আবার অন্যত্র ছন্দ পঙক্তির (যেমন, দীর্ঘ ত্রিপদী পঙক্তির) বিভাগ বোঝাতে একই অনুচ্ছেদে পদক, শব্দের প্রয়োগও আমার চোখে পড়েছে। অর্থাৎ পদাংশ, পদক ও পাদক শব্দের দ্বারা তিনি কখনও বুঝিয়েছেন ছন্দ পঙক্তির যতিবিভাগ, কখনও বুঝিয়েছেন শব্দের উচ্চারণ-বিভাগ (সিলেব্‌ল্)। পঙক্তির যতি বিভাগ আসলে (অর্ধযতি বিভাগ) অর্থে 'পদ' এবং শব্দের উচ্চারণ বিভাগ অর্থে 'দল' শব্দকে নির্দিষ্ট করে রাখলে গোলযোগের কোনো সম্ভাবনা থাকে না। ছন্দের বৃহত্তম বিভাগ বোঝাতে কোথাও ('ছন্দের কথা') ব্যবহৃত হয়েছে 'পঙক্তি' শব্দ, আবার অন্যত্র ছন্দপ্রকরণ' ব্যবহৃত হয়েছে 'চরণ'। 'ছন্দের কথা' প্রবন্ধে 'স্বরবৃত্ত' (বিকল্পে 'ছড়ার ছন্দ') মানে syllabic. আর ছন্দ-প্রকরণে (বিকল্পে 'স্বরমাত্রিক') মানে moric। কালিদাস রায়ের ব্যবহারে স্বরমাত্রা মানে more (অর্থাৎ কলা)। বস্তুত ছন্দরসিক কবি আর ছান্দসিক পণ্ডিতে সমন্বয় তাঁর ছন্দ আলোচনায় ঘটে নি। সর্বত্রই কবিরই যেন জয় ঘটেছে।

• 'দল' শব্দের মৌলিক অর্থ খণ্ড। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত কালিদাস রায় যে এবিষয়ে যথেষ্ট অবহিত ছিলেন তার প্রমাণ তাঁর 'ভাগবত সাহিত্য' প্রবন্ধে 'দ্বিদল বীজ' কথার প্রয়োগ (প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য, তৃতীয়াংশ পৃঃ ২১৭)। ছন্দের প্রসঙ্গে প্রযুক্ত হলে 'দল' শব্দের মানে হবে 'ধ্বনিখণ্ড' বা সিলেব্‌ল্। এ কথা মেনে নিতে তাঁর মনে কোনো সংশয় দেখা দেয়নি।

কালিদাস রায় নানা স্থানেই (syllabic) ছড়ার ছন্দকে বলেছেন 'ধামালি ছন্দ'। আমাদের পূর্ববঙ্গের সাহিত্যে সেকালে কোনো বিশেষ ছন্দোরীতি 'ধামালি' নামে পরিচিত ছিল, আমরা জানতাম না। বস্তুতঃ কালিদাস রায়ের লেখা থেকেও বোঝা যায়, কোনো বিশেষ শ্রেণীর গান বা সাহিত্যিক রচনা সেকালে ওই নামে পরিচিত ছিল। প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে প্রচলিত নানা শ্রেণীর অপরিচিত ছন্দোরীতির পরিচয় তিনি আমাদের দিয়েছেন। ছন্দচিন্তার ক্ষেত্রে এটি তাঁর একটি বিশিষ্ট কৃতিত্ব। 'ভাগবত সাহিত্য' প্রবন্ধ থেকে তাঁর একটি উক্তি উদ্ধৃত করছি

"এদেশে ধামালি সংগীত নামে এক শ্রেণীর গান গাওয়া হইত—ধামালি বা ঢামালির অর্থ বঙ্গরসিকতা। ঢামালির কবিরা কৃষ্ণলীলায় ঢামালি বা বঙ্গরসিকতার জন্য দানলীলা, নৌকাবিলাস, ভারখণ্ড ইত্যাদি উপাখ্যানের প্রবর্তন করেন অর্বাচীন পুরাণাদি হইতে। এইগুলি ঢামালি গানের পক্ষে বেশ উপযোগী হইয়াছিল। এই দানলীলাদির ঢামালি এদেশে যেরূপ জনবল্লভতা লাভ করিয়াছিল, এমন আর কোনো গান নয়। এই ঢামালি-সংগীত বাংলা কাব্যসাহিত্যের বিবিধ ধারার মধ্যে আত্মবিলয় করিয়াছে। রাধাকৃষ্ণের ঢামালি শিবদুর্গার ঢামালিতে পরিণত হইয়াছে, শুকসারীর ছন্দে নবরূপ লাভ করিয়াছে, মঙ্গলকাব্যের সপত্নীকলহে এবং অন্যান্য রসকলহে রূপান্তরিত হইয়াছে। পদাবলী-সাহিত্যেও খণ্ডিতা রাধা ও সখীদের কৃষ্ণ-বিদূষণে নবরূপ লাভ করিয়াছে।"

তিনি অন্যত্র ('দাশু রায়ের পাঁচালি' প্রবন্ধ) বলেছেন—"এদেশে ধামালি বা রসকলহের মধ্য দিয়া রঙ্গরস পরিবেশন করা হইত। দাশুও তাহা করিয়াছেন। কৃষ্ণ-রাধার, হর গৌরীর, বৃন্দা-কৃষ্ণের, গঙ্গা-গৌরীর, হনুমান-গরুড়ের রসকলহগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।"

এখন প্রশ্ন—এসব ধামালি (বা ঢামালি) গান কোন্ ছন্দে রচিত হয়? 'লোচনদাস' প্রবন্ধে কালিদাস রায় বলেছেন—'চলতি ভাষার ছন্দ প্রবাদ-প্রবচনে, রসকলহে, ধামালি গানে, ছড়ায় এবং মঙ্গলকাব্যের ফাঁকে ফাঁকে পূর্ব হইতে প্রচলিত ছিল। ইহা লঘু তরল বিষয়বস্তুর বাহন ছিল।" অন্যত্র ('গৌরনাগর' প্রবন্ধ) বলেছেন—"গৌরসাহিত্যের classical আবেষ্টনীতে তিনিই [লোচনদাস] একমাত্র Romantic। তাঁহার নগরী-পদের জন্য গ্রন্থে-প্রচলিত ছন্দও গ্রহণ করেন নাই—তিনি লোকমুখে প্রচলিত ছন্দে পদ রচনা করিয়াছেন। সেকালে ধামালি (ঢামালি) গান এই ছন্দেই রচিত হইত।"

এর থেকে বোঝা যাচ্ছে, শুধু ছড়ায় বা ধামালি গানে নয়, লোকসাহিত্যের সব বিভাগেই এই 'চলতি ভাষার ছন্দ' প্রচলিত ছিল। তাই এ ছন্দকে ছড়ার ছন্দ বা 'ধামালি ছন্দ' না বলে লোকছন্দ বা লৌকিক ছন্দ বলাও বোধ হয় চলে।

এবার দেখা যাক, এই লৌকিক ছন্দ সেকালে কি নামে পরিচিত ছিল। 'মনসা-মঙ্গল' প্রবন্ধের (দ্বিতীয় পর্যায়) এক স্থানে কবি বিজয় গুপ্তের সম্পর্কে কালিদাস রায় মন্তব্য করেছেন—"ইহার কাব্যে ছন্দোবৈচিত্র্য আছে। ইঁহার রচিত দীর্ঘ-ত্রিপদী ছন্দ কৃষ্ণদাস কবিরাজের দীর্ঘ-ত্রিপদী ছন্দের মত পাদকমাত্রিক (syllabic)। ইনি লোচনদাসের মত ধামালি ছন্দেও কোনো কোনো কবিতা রচনা করিয়াছেন। অতএব এই দুই ছন্দের প্রবর্তনার গৌরব বিজয় গুপ্তকে

দেওয়া যাইতে পারে।" এ সম্পর্কে তিনি অন্যত্র ('বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল' প্রবন্ধ) বলেছেন—"গুপ্ত কবির মনসামঙ্গল প্রধানতঃ পয়ারেই রচিত। এই পয়ারের মাঝে মাঝে আক্ষরিক মাত্রার স্থলে পাদক-মাত্রা (syllable) আছে। ইহার ফলে গুপ্ত কবির পয়ার—ধামালি ও আসল পয়ারের মাঝামাঝি। সেজন্য স্থলে স্থলে পুরা ধামালির চরণই দাঁড়াইয়াছে। যেখানে এই শ্রেণীর পয়ার-পংক্তিতে ঘন ঘন হসন্ত অক্ষরের প্রয়োগ আছে, সেখানে ছন্দ ধামালিরই রূপ ধরিয়াছে। পয়ার একঘেয়ে হইবে বলিয়া গায়েনকে সম্বোধন করিয়া কবি বলিয়াছেন—'পয়ার এড়িয়া ভাই বলহ লাচাড়ি। 'লাচাড়ি বলিতে কবি ত্রিপদী ছন্দ বুঝিয়াছেন।"

এর থেকে নিঃসন্দেহে বোঝা যায়, কবি বিজয় গুপ্তের সময়েও অক্ষর-মাত্রিক ('আসল') পয়ার ও ত্রিপদী বন্ধের পাশাপাশি পাদক-মাত্রিক (syllabic) পয়ার-ত্রিপদী বন্ধও প্রচলিত ছিল। বস্তুতঃ লিখিত সাহিত্যে প্রচলিত পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি সাধু রীতির সব ছন্দবন্ধই সেকালে পরিচিত ছিল 'পয়ার' নামে, আর অলিখিত মৌখিক সাহিত্যে প্রচলিত লোকরীতির অনুরূপ সব ছন্দোবন্ধ পরিচিত ছিল 'লাচাড়ি' নামে। 'লাচাড়ি' নামধেয় লৌকিক ছন্দোবন্ধের মুখ্য অবলম্বন ছিল দলমাত্রা ('পাদকমাত্রা'), আর 'পয়ার' নামধেয় সাহিত্যিক সাধু ছন্দোবন্ধের পূর্বতন কলামাত্রক (moric) প্রকৃতি দলমাত্রক (syllabic) লোকছন্দের প্রভাবে রূপান্তরিত হয়ে ক্রমে অগ্রসর হচ্ছিল অক্ষরমাত্রকতার দিকে। বিজয় গুপ্তের ছন্দ ছিল এই বিবর্তমান অবস্থায়।

এইজন্যই ছন্দোবিৎ কালিদাস রায় বলেছেন— গুপ্ত কবির পয়ার ধামালি [আসলে লাচাড়ি] ও আসল পয়ারের মাঝামাঝি।' মোট কথা, 'লাচাড়ি বলিতে কবি [বিজয় গুপ্ত] ত্রিপদী ছন্দ বুঝিয়াছেন' বিজয় গুপ্ত লৌকিক ছন্দোরীতিকেই বলেছেন 'লাচাড়ি'। পূর্বে দেখেছি তিনিও তাঁর ব্যাকরণের ছন্দ-প্রকরণে বলেছেন—"ইহাকে [পাদকমাত্রিক বা দলমাত্রিক ছন্দকে] লাচাড়ি বা ছড়ার ছন্দও বলে।' তাঁর শেষোক্ত উক্তিটাই স্বীকার্য বলে মনে করি।

পরিশেষে এই লৌকিক লাচাড়ি ছন্দোরীতির আবির্ভাব সম্পর্কে ছন্দোভাষ্যকার কালিদাস রায়ের একটি উক্তি বিশেষভাবে স্মরণীয় —"পয়ারের এই ধামালি-রূপের [বলা উচিত লাচাড়ি-রূপের] সূত্রপাত বড়ু চণ্ডীদাস হইতেই হইয়াছে। সেই যখন প্রথম শোনা গিয়াছিল—

কে না বাঁশী। বাএ বড়ায়ি। কালিনী নই। -কূলে।
কে না বাঁশী। বাএ বড়ায়ি। এ গোঠ গো। -কুলে॥"

"সকলের মাঝে ব্রহ্ম বিরাজে"

—ডক্টর রমা চৌধুরী

মানবসভ্যতার প্রথম স্বর্ণ উষাগমে, পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের ঋষিপাদরজোপূত মন্ত্রমন্ত্রিত স্তবঝঙ্কৃত হোমধূমসুরভিত তপোবনে উত্থিত হয়েছিল জগতের সেই শ্রেষ্ঠ সাম্য-ঐক্য গীতি—

"সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ॥" (ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৩/১৪/১)
"ব্রহ্মেদং সর্বং।" (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ ২/৫/১)
"বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই ব্রহ্ম।"
"ব্রহ্মই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।"

তাহলে মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে, ধর্মে ধর্মে আর ভেদ কোথায়? কারণ, সর্বদলের মধ্যেই তো বিরাজ করছেন সেই একই পরব্রহ্ম নির্বিশেষে, তাঁর অনন্ত সৌন্দর্যে মাধুর্যে ঐশ্বর্যে, তাঁর অসীম আনন্দে আলোকে অমৃতে, তাঁর অপরিসীম প্রেমে স্নেহে করুণায়। তিনি তো পরম লীলাময়, তিনি তো পরম আনন্দ রসঘন—সেই অনুপম ব্রহ্মানন্দ দিব্যানন্দ আত্মানন্দ ভূমানন্দ পূর্ণানন্দ শাশ্বতকাল তাঁর স্বরূপের স্বরূপ। সেজন্য তাঁর মধ্যে রয়েছে 'আনন্দের' নিত্যোৎসারিত নির্ঝরিণী যা থাকে না কেবল নিজের মধ্যেই আবদ্ধ, কিন্তু শীতল করে, স্নিগ্ধ করে দিকে দিকে সকলকে তার অমৃতধারায় তাঁদের সিঞ্চিত করে। সেজন্যই তিনি তাঁর আনন্দের প্রকাশ করেছেন এই তথাকথিত জড় মর পৃথিবীতে—তার প্রতি তৃণগুচ্ছে, তার প্রতি বারিবিন্দুতে, তার প্রতি রেণুতে রেণুতে। কি পরম সৌভাগ্য আমাদের।

কিন্তু, হায়, আমরা কজনই বা এই মহাসত্যটি, এই পরমতত্ত্বটি, এই শাশ্বততথ্যটি উপলব্ধি করি বিন্দুমাত্রও? বিশেষ করে, আমাদের আশেপাশে যে এইসব অসংখ্য পশুপক্ষী কীট পতঙ্গাদি রয়েছে, তাদের মধ্যেও যে ঠিক সেইভাবে, সেই একই ব্রহ্ম নিত্যবিরাজিত—সে কথা কেই-বা আমরা ভাবি মুহূর্তের জন্যও? উপরন্তু তাতো যেন এক বিশেষ কৌতুকের ব্যাপারই আমাদের নিকট। কেবলমাত্র হাসির খোরাকই যেন তা যোগায় আমাদের মধ্যে প্রায়।

কিন্তু যাঁরা প্রকৃত জ্ঞানীগুণী, তাঁদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। তাঁরা তাঁদের আর্যদৃষ্টিতে পৃথিবীর প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই সেই একই পরব্রহ্মকে দর্শন করেন; পশুপক্ষীদেরও নিশ্চয়ই স্বয়ং শ্রীভগবানের প্রতীক বা প্রতিমূর্তি বলে গ্রহণ করতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করেন না।

আমাদের পরমাদরের কবিশেখর কালিদাস রায় সত্যই ছিলেন এই অর্থেই জ্ঞানীগুণী অথবা প্রকৃত "কবি"—যিনি সংসারের মূলীভূত সত্যকে সাক্ষাৎভাবেই উপলব্ধি করেন অহরহ। এই প্রবন্ধের নামটি

দেওয়া হয়েছে যে অনুপম নিগূঢ় বেদান্তমূলক পংক্তিটি উদ্ধৃত করে—তাইতো এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শুনে নিশ্চয়ই অনেকের আশ্চর্য লাগবে যে, এই পংক্তিটি আছে তাঁর অত্যাশ্চর্য কবিতা "উষ্ট্রসূক্তে"। "সূক্তের" প্রকৃত অর্থ পৃথিবীর প্রাচীনতম এবং সর্বজনবন্দ্য গ্রন্থ ঋগ্বেদের কবিতাবলী বা মন্ত্রাবলী—এক একটি সূক্তে এক একজন ঋষি এক একজন দেবতার বন্দনা করেছেন সশ্রদ্ধায়। সেই সূত্র ধরেই, আমাদের অসমসাহসী কবিশেখর কালিদাস রায় বন্দনা করেছেন কার? অতি কুৎসিতদর্শন, অতি সাধারণ, অতি নির্বোধ জীব "উষ্ট্রের"। আশ্চর্যের কথা নয়কি? নিশ্চয়ই। কিন্তু আমরা সাধারণ জনেরা যা পারি না, কবিশেখর অনায়াসে তাই পেরেছেন—পেরেছেন সেই উষ্ট্রেরই স্তুতিগান করতে, সেই উষ্ট্রের পূজা করতে; সেই উষ্ট্রেরই মধ্যে স্বয়ং ব্রহ্মকে দর্শন করতে। শুনুন তাঁর অপূর্ব বাণী :—

বৈদিক ঋষি দেবতাগণেরে দেখে নাই ধরাধামে,
তবুও তাহারা সূক্তমন্ত্র রচিলা তাঁদের নামে।
ইতিহাস বলে, ঋষিদের তুমি আদি সহচর ছিলে,
বরাবরই ঐ যাযাবরদের মরু পার করে দিলে।
তুমি পশু তবু দেবতার চেয়ে বড়
সূক্ত শ্রবণে দীর্ঘ তোমার শ্রবণই যোগ্যতর।
সূক্ত রচিব, হে পশু-তাপস দুর্গম পথগামী
তব উদ্দেশে, যদিও শ্যামলা বঙ্গের কবি আমি॥

.. ..

নমামি তোমায় মরুমাতৃক দেশের পরিত্রাতা।
একাধারে তুমি মিত্র, সেবক, ভ্রাতা।
গুণ পরিচয় দিই যদি যথাযথ,
সূক্ত আমার উষ্ট্রপুরাণে হয়ে যাবে পরিণত॥

... ...

জঙ্গমরূপে সেবা কর তুমি মান না পাত্র-ভেদ,
স্থাবররূপেও সেবাধর্মের হয়নাক বিচ্ছেদ।
সেবাধর্মের এই যে নিদর্শন,
নহে কি বিশ্বে অনুপম অতুলন?
গিরি অরণ্য, চন্দ্র, তপন, নদী
সূক্তই লভে যদি,
ব্রহ্ম যাহাতে জলজিয়ন্ত সে কেন পড়িবে বাদ?
জীবের মধ্যে শিবের বসতি ভুলে যাওয়া অপরাধ।
সকলের মাঝে ব্রহ্ম বিরাজে, তোমার মাঝারে বুঝি
সেবকাদর্শ রূপে সেবমান, তাহারেই আমি পূজি।
সেবাধর্মের তুমি আদর্শ, তোমারে নমস্কার।
মরু না থাকিলে এই আদর্শ কোথায় মিলিত আর?

যত দোষ থাক, তোমার খাতিরে তাহারেও আমি ক্ষমি।
হে পঙ্গু-তাপস, তোমার সঙ্গে মরুরেও আমি নমি॥
(উষ্ট্রসূক্ত—কবিশেখর কালিদাস রায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা)

এই সুদীর্ঘ রোমাঞ্চকর সূক্তটি এত সুন্দর যে, সবটা উদ্ধৃত করার লোভ দুর্দমনীয়।

সেই একই ব্রহ্মাত্মভাবান্বিত কবিশেখর একজন সামান্য, দীনদরিদ্র, দুর্গত অনাদৃত চাষীকে আর সন্ন্যাসীঠাকুরকে সমান আদরে গ্রহণ করেছেন, সমান শ্রদ্ধায় তাঁকে পূজা নিবেদন করেছেন, সমান উদাত্ত উদার কণ্ঠে তাঁর বন্দনা গান করেছেন।

ভদ্রপাড়ায় ভিখ দিলে না আবার ফিরে এলে?
বেশ করেছ, ত্রিশূলখানা কোথায় এলে ফেলে?
আপদ গেছে। হেথায় থাক ঘুরতে কেন যাবে?
আমরা যদি দুমুঠো পাই তুমিও তা' পাবে।
... .
কাজের কথা আর তুলো না। যতই কাঙাল হই,
তোমায় দুটো অন্ন দিতে আমরা কাতর নই।
....
আমরা তোমায় ভালবাসি, কি আছে অই মুখে।
ইচ্ছা করে তোমায় ঠাকুর আঁকড়ে ধরি বুকে॥ (চাষীর ঠাকুর)

কবিশেখরের এই মহিমময় জীবনদর্শন ব্যক্ত হয়েছে সুস্পষ্ট ভাবে, সুমধুর ভাবে, সুললিত ভাবে তাঁর আরেকটি আকারে ক্ষুদ্র অথচ প্রকারে বৃহৎ কবিতায়:—

সাহিত্যরচনা শুধু সখ নয়, কর্ম জানি তাও।
তোমরা এ কর্মফল হাতে হাতে পাও।
সবে মিলে কর্মফল নিজে কর ভোগ
তোমাদের এই কর্মযোগ।
আমার এ কর্মফল করি শুধু ব্রহ্মে সমর্পণ
স্মরণ করিয়া সেই গীতার বচন।
তোমরা বলিবে, ইহা উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ,
জান না-ত বেদান্তের তত্ত্ব গুহ্যতম।
অনলে, অনিলে, কীটে, মূষিকে, মানবে,
ব্রহ্ম কোথা নাই এই ব্রহ্মময় ভবে? (ব্রহ্মে সমর্পণ)

এরূপ ব্রহ্মদৃষ্টিসম্পন্ন কবিশেখর সেজন্য সমগ্র প্রাণমনজীবন দিয়ে ভালবেসেছিলেন এই ধরণীর ধূলিকে, এই মর্ত্যের মাটিকে, সেই ধূলিতেই বিলুণ্ঠিত, সেই মাটিতেই লিপ্ত তথাকথিত দীনহীন, ক্ষুদ্রক্ষীণ, সংসার পঙ্কলীন জনগণকে। সেজন্যই তিনি হতে পেরেছিলেন প্রকৃত অর্থেই, প্রকৃষ্ট অর্থেই, পরিপূর্ণ অর্থেই জনগণের কবি, পল্লীজননীর কবি, বিশ্বমানবের কবি।

প্রাক্‌জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে, তাঁকে শতসহস্রকোটী প্রণাম।

"ওঁ শান্তি:"

কবিশেখরের কাব্য

। শুদ্ধসত্ত্ব বসু ।

কবিশেখর কালিদাস রায় রবীন্দ্রযুগের একজন বিশিষ্ট কবি। তাঁকে সম্পূর্ণ রবীন্দ্রানুসারী বলে অনেকে অভিহিত করলেও তিনি কি প্রকরণে এবং কি বক্তব্যে রবীন্দ্রনাথের পথ থেকে বহুসময়ে সরে এসেছেন। সময়ের দিক থেকে তো বটেই, প্রভাবের পরিমণ্ডলেও তিনি রবীন্দ্রালোকিত গ্রহবলয়ের মধ্যে বিরাজমান—এ সত্য অস্বীকার করা যায় না। তবু কবিশেখরের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের এমন অনেক উজ্জ্বল দিক আছে—যা তাঁর কাব্যপাঠকমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। বিশেষ করে পল্লীপ্রকৃতির রূপ বন্দনায়—রবীন্দ্রনাথের মননে যে তাত্ত্বিকতা এবং আধ্যাত্মিক তন্ময়তা ছিল, কালিদাস রায়ের কবিতায় সেই তাত্ত্বিকতা ও আধ্যাত্মিকতা নেই, কিন্তু তন্ময়তার প্রভূত আবেশ আছে। পল্লীপ্রকৃতি ও পল্লীপরিবেশের সরল ও প্রত্যক্ষ একটি ছবি তাঁর কবিতায় ধরা আছে।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে কখনো-কখনো এমন এক একজনের আবির্ভাব ঘটে, যিনি সাহিত্যলক্ষ্মীর সমস্ত ভাণ্ডার একাই পূর্ণ করে দেন। তাঁর রচনার স্বাদ গ্রহণে বিদগ্ধ সমাজ পরিতৃপ্ত হন, জাতীয় জীবন-পরিচয়ে তিনি বড় একটা ভূমিকা গ্রহণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ আমাদের সাহিত্যাকাশে সেইরকম জ্যোতিষ্কবিশেষ। কিন্তু এঁদের অবদানে আপামর সর্বসাধারণের ক্ষুন্নিবৃত্তি ঘটে না। যুগের সার্বিক আশা-আকাঙ্ক্ষা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, বেদনা বিহ্বলতার পরিচয় ঘটে না। অরণ্য যেমন শুধু গুটিকয় বিরাট মহীরুহের সমষ্টি নয়, অজস্র অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট চারাগাছের সমাবেশের দ্বারা সমাবিষ্ট না হলে আরণ্যপ্রকৃতির শোভা খোলে না; এবং সত্যি কথা বলতে কি, অরণ্যের চরিত্রধর্মই ফুটে ওঠে না। শুধু কয়েকটি মহীরুহের খাপছাড়া উপস্থিতিতে বন ন্যাড়া ন্যাড়া ঠেকে, ঘনজঙ্গলের মেজাজ, অরণ্যের শ্যামল শোভা, এগুলির জন্যে বেশ কিছু গাছগাছালির দরকার। সূর্যবলয়ের চারপাশের গ্রহ-নক্ষত্রের দ্যুতি ও দীপ্তিকে বাদ দিয়ে সৌর আকাশ নয়। বিরাট রবীন্দ্রনাথের চারপাশে আর যে সব বিশিষ্ট কবিবৃন্দ তাঁদেরকে মুছে দিয়ে বাংলা কাব্যের সার্বিক পরিচয় কখনোই হতে পারে না। কালিদাস রায় নিঃসন্দেহে এই কবিমণ্ডলের এক প্রধান পুরুষ।

কবি হিসাবে কালিদাস রায়ের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল যে, তিনি ঐতিহ্যের অনুসারী কবি। রবীন্দ্রনাথের কিছু আগে থেকেই এদেশে ইংরেজী সাহিত্যের আমদানী হয়, এবং অনেকেই ইংরেজী সাহিত্যের মাধ্যমে বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে কিছু পরিচয়ের সুযোগ গ্রহণ করেন। ভারতীয় আদর্শ এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞান থেকেও অনেক শিক্ষিত ব্যক্তির দ্বারা ইংরেজী সাহিত্যের গুণ-কীর্তন চলে; তার ফলে একদল তরুণ লেখক ইংরেজী সাহিত্যের প্রকরণে বাংলা সাহিত্যের নতুন

বিন্যাস এবং নবরূপায়ণ ঘটালেন। রবীন্দ্রনাথ ভারতের শাশ্বত চিন্তা এবং ঐতিহ্যের প্রতি আস্থা স্থাপন করলেন। বলা বাহুল্য, প্রাচীন ও নবীন ভারতের মধ্যে সমন্বয়সাধন করে তিনি মূর্ত ভারতাত্মা-রূপে প্রতিভাত হলেন। আর একদল সাহিত্যিক কবিগুরুর শেষ জীবনের দিকে একেবারে ইয়োরোপীয় আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে নবধর্মের অনুসন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এই সময়ে অনেক কবিই যুগধর্মের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে বিদেশাগত নতুন নতুন আন্দোলনের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে কাব্য রচনা করেছিলেন। দেশের, জাতির ঐতিহ্যের ধার ধারেন নি তাঁরা। নতুন কিছু করার মোহ-ই তাঁদের রচনায় প্রাধান্য লাভ করেছিল। যুগের তাগিদই তাঁদের কাছে বড় কথা। কালিদাস রায় কিন্তু যুগধর্মী কবি নন; যুগ এবং হুজুগকে তিনি অন্তর্দৃষ্টিতে দেখেছেন, যুগের বেদনার প্রতি তাঁর মমত্ব ছিল, কিন্তু হুজুগে মেতে উঠতে পারেন নি। ফলে দেশীয় ঐতিহ্য থেকে সরে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। চিরন্তন ঐতিহ্য সাহিত্যের অস্থিসংস্থা বলেই তিনি বিশ্বাস করতেন, তাই তিনি বাঙালীর প্রাণের কথাটি কাব্যে তুলে ধরতে পেরেছেন। ভারতীয় সংস্কারের ধারাটি কবিশেখর প্রাণপণে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছেন। এইখানেই তাঁর প্রধান বৈশিষ্ট্য। রবীন্দ্রনাথ কবিশেখরের কাব্য প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছেন তাতে এই কথাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ কবিশেখরের কাব্য সম্পর্কে একসময়ে বলেছিলেন—"তোমার কবিতা বাংলাদেশের মাটির মতই স্নিগ্ধ ও শ্যামল। বাংলা দেশের প্রতি গভীর ভালবাসায় তোমার মনটি কানায় কানায় ভরা—সেই ভালবাসার উচ্ছলিত ধারায় তোমার কাব্যকানন সরস হইয়া কোথাও-বা মেদুর, কোথাও-বা প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। তোমার এই কাব্যগুলি পড়িলে বাংলার ছায়াশীতল নিভৃত আঙিনার তুলসীমঞ্চ ও মাধবীকুঞ্জ মনে পড়ে।"

বাস্তবিকই কবিশেখরের সমগ্র কাব্যসৃজনে বাঙলা দেশের সেই ছায়াশীতল নিভৃত আঙিনার তুলসীমঞ্চ ও মাধবীকুঞ্জ চিরকালই শ্যামল সজল ও পূতপবিত্র হয়ে বিরাজ করেছে।

কালিদাস রায়ের কবিতার বৈচিত্র্যের কথাও স্মরণযোগ্য। ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে তাঁর কাব্যসাধনার জয়যাত্রা শুরু। তাঁর 'চিত্ত ও বিত্ত' কবিতায় কবিশেখর অসঙ্কোচেই দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন—

বিত্ত হ'তে চিত্ত বড় এই ভারতের মর্মবাণী।
নিত্য ধ্রুব সত্য যেথা, বিত্ত সেথা যুক্তপাণি ॥
যক্ষপতি মানিক মতি ঢাললে পায়ে, বিমুখ সতী,
বক্ষে তুলেন নদী যদি যোগায় জবা মাল্য আনি' ॥

শ্মশানবাসী পাগ্‌লা ভোলা চরণতলে সে কোন্ ভূমা,
যাহার লাগি তপস্বিনী রাজাধিরাজ কন্যা উমা?
অমৃতলাভ হয় না কথায় চায় না সে বর, নারী হেথায়
রাজদুলালী স্কন্ধে বহে তাপস পতির কুঠারখানি।
নিত্য ধ্রুব সত্য যেথা বিত্ত তথা যুক্তপাণি ॥

কবি প্রাচীন ভারতবর্ষের উজ্জ্বল আদর্শের কথা তুলে ধরেছেন, রামায়ণ মহাভারতের শিক্ষার প্রতিই তাঁর অনুভূতি। মহাভারতের চরিত্রাবলী সম্পর্কে তাঁর কি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, তা তাঁর 'ভীষ্মদেব,' 'একলব্য' প্রভৃতি কবিতা পড়লেই বোঝা যায়।

সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষাবিন্যাসে দেশীয় ঐতিহাসিক ধারার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে নিয়ে তিনি সারস্বতচর্চায় ব্রতী ছিলেন, তাই দুর্বোধ্যতাব বা জটিল বিন্যাসের কোন ভাবনাজড়িত কৃতিত্ব তাঁর কাব্যকে স্পর্শ করতে পারেনি।

প্রমথনাথ বিশী কবিশেখর কালিদাস রায় প্রমুখ কবি চতুষ্টয়ের কাব্যালোচনা প্রসঙ্গে একটি ভোজসভার আয়োজনের উপমা অলঙ্কার ব্যবহার করেছেন। তিনি লিখছেন—"উচ্চাঙ্গ কাব্যরস বোদ্ধার সংখ্যা স্বভাবতই অল্প। অন্যপর্যায়ভুক্ত বৃহত্তর পাঠকসমাজের রসজীবন যাপনের মোটা অন্নবস্ত্র যোগাইবার ভার ইঁহাদের মত কবির উপরে, এদেশে, বিদেশে, সর্বদেশে ও সর্বকালে। কাব্যলক্ষ্মীর মহোৎসবে খাসমহলের নিমন্ত্রিতগণ ভূরিভোজন করুন আপত্তি নাই; কিন্তু রবাহূত, অনাহূতগণ অভুক্ত ফিরিয়া যাইবে এমনতো হওয়া উচিত নয়। ইঁহাদের উপরেই মোটা অন্ন পরিবেশনের ভার।"

অর্থাৎ জনসাধারণের কাব্যপিপাসা মেটাবার দায়িত্ব রবীন্দ্রসমসাময়িক কবিদের উপরেই বর্তেছে। বিশেষ করে, রবীন্দ্রাদর্শে বিশ্বাসী কবিকুলের ওপরেই কাব্যরস পাঠকের মধ্যে পরিবেশন করার ভার পড়েছিল। কালিদাস রায়, বলা বাহুল্য, সেই সুকঠিন দায়িত্ব পালনে অগ্রণীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি সহজ ভাষায়, সহজ তথা মহৎ বিষয় নিয়ে সাধারণ-ভাবে এবং অলঙ্কৃত সৌষ্ঠবে, সাধারণ প্রচলিত ছন্দে আবার বিবিধ রকমের ধ্বনিপ্রধান ছন্দে বিচিত্র ধরনের কবিতা লিখেছেন। ভাষার সারল্যে বিষয়বস্তুও উপলব্ধিগম্য বলে সহজ হৃদয়ের কাছে তাঁর কাব্যের আবেদন অনেক বেশী। প্রজ্ঞার মাধ্যমে কিংবা কাব্যোপলব্ধির কৌশল আয়ত্ত করে তাঁর কবিতা অনুশীলনের প্রয়োজন হয় না, সহজে তাঁর কবিতা পাঠকের প্রাণে বাজে, উপলব্ধিলোকে ব্যঞ্জনা জাগায়, তাই সাধারণ পাঠকের কাব্যপাঠের ক্ষুধা তাঁর কবিতা পড়লে অনায়াসেই মেটে; এই জন্যেই শ্রীযুক্ত বিশী অতি সুন্দর উপমা দিয়ে এই কথাটি উপস্থিত করেছেন।

কবিশেখরের কাব্যে ত্রিবেণীধারা প্রবাহিত। একটি ধারা হচ্ছে তাঁর কাব্যে পল্লীজীবনের তাবৎ বিষয় ও উপলব্ধির পরিচয় ধরা পড়েছে। পল্লীগ্রামের গাছ-পালা, নদী-মাঠ, পল্লী-প্রান্তর, প্রকৃতির উদারক্ষেত্র, আকাশ-আঙিনা, চন্দ্রসূর্য, পল্লীর মানুষ, গ্রামের জীবনযাত্রা, সেখানকার সমাজ-সংসার, পল্লীবাসীর যাবতীয় বোধ ও বেদনার বাঙ্ময় রূপায়ণ—তাঁর কাব্যের একটি বড় ভগ্নাংশ গড়ে তুলেছে। পল্লীজীবনের হেন ব্যাপার নেই—যা নিয়ে তিনি কবিতা লেখেন নি। প্রকৃতির বিবিধ রূপ-সৌন্দর্য, লতাগুল্ম ও পুষ্পকুঞ্জের সমাহিত শান্তি ও মাধুর্য, গার্হস্থ্য জীবনের স্নিগ্ধতা, বাৎসল্য, প্রেম, পাতিব্রত্য, দাক্ষিণ্য, বীরত্ব, সতীর মাহাত্ম্য, গৃহলক্ষ্মীর স্বর্গীয় দীপ্তি—গৃহজীবনের দুঃখবেদনা, আনন্দ-উন্মাদনা—কোন্ বিষয়ে না তিনি কলম ধরেছেন? সকল বিষয়ের কবিতার কিছু উদাহরণ দিতে গেলে এই প্রবন্ধ দীর্ঘকায় হয়ে যাবে—তাই কয়েকটি বিখ্যাত কবিতার নামোল্লেখ করেই ক্ষান্ত হচ্ছি। 'পল্লীবালার ব্যথা,' 'কৃষাণীর ব্যথা,' 'বাংলার দীঘি,' 'বাপপিতামোর ভিটে', 'রাঙাচুড়ি,' 'জননীর ব্যথা,' 'স্নেহস্মৃতি' 'বৌদিদি,' 'অরক্ষণীয়া', 'কন্যাদায়,' প্রভৃতি কবিতার কথা বাঙালী পাঠক কখনই ভুলতে পারবে না।

দ্বিতীয় ধারায় রয়েছে তাঁর বৈষ্ণবতা। কবিশেখর কালিদাস রায় সাধক বৈষ্ণব কবি লোচনদাস ঠাকুরের বংশধর। বৈষ্ণবতার অধিকার তিনি পেয়েছেন জন্মসূত্রে। তাঁর পদাবলী কবিতাটির শেষাংশ

উদ্ধৃত করছি, এখানে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি তাঁর মানসিকতার স্বরূপ প্রকাশিত হয়েছে।—

পড়িতে পড়িতে জীর্ণ পদাবলী সংগ্রহের পুঁথি
মাঝে মাঝে দ্বিধা জাগে, বারবার হয় স্বরচ্যুতি,
কভু ছন্দোভঙ্গ ঘটে, কোথাও বা হেরি দুরান্বয় ;
অবাঞ্ছিত শব্দ এসে কোথা দেখি জুড়ে ব'সে রয়
ঘটাইয়া অর্থচ্ছেদ। রবীন্দ্রযুগের আমি কবি
পারিপাট্য-পক্ষপাতী, রসাস্বাদ অধিকার লভি'
ভাবিতেছি, যত মূর্খ লিপিকার কীর্তনীয়া দল,
কবির অনিন্দ্য পদে শ্রীমাধুরী সচ্ছন্দ কৌশল
কলঙ্কে করেছে ক্ষুণ্ন। ক্রমভঙ্গ হয় ক্ষণে ক্ষণে,
অঙ্গহানি দুষ্ট মিল অস্বস্তির সৃষ্টি করে মনে।
তবু রসাবিষ্ট হই, ভেবে দেখি আঁখি যায় খুলে,
ক্ষণে ক্ষণে ক্রমভঙ্গ হ'য়ে যায় যাহাদের ভুলে,
তাহারা হৃদয়পুটে যত্নভরে পদরত্নগুলি
যদি না করিত রক্ষা যক্ষ সম, মুছাইয়া ধূলি
কোথা পাইতাম এই দেবজন-দুর্লভ বৈভব,
নিঃসম্বল এ জাতির দুঃসময়ে যা নিয়ে গৌরব ?

ও-সব কলঙ্ক নয়,—অশ্রুচিহ্ন, ভক্ত ছিল তারা,
ঢালিয়াছে যুগে যুগে এর পরে প্রেম অশ্রুধারা।
মুকুতা ছিদ্রিত বটে, স্তব-সূত্র পরাইয়া তায়
তাহারা গেঁথেছে হার, তাই রাধাশ্যামের গলায়
দুলিতেছে ঝুলিতেছে। অভক্তই ছিদ্র তায় খুঁজে,
কৃতজ্ঞতা ভরে মোর এ চিন্তায় আঁখি আসে বুজে।।

বৈষ্ণবতার প্রতি কবির যে মানসিক সংস্কার তারই সহজ দলিল হল ওপরের কবিতাটি। তাঁর কাব্যে বৈষ্ণবতার প্রকাশ ঘটেছে এই কারণে, কবির ভীরু সঙ্কোচময় একটি দীনতার ভাব যে তাঁর কবিতায় বিরাজ করে থাকে তা তাঁর বৈষ্ণবতার জন্যে। পর্ণপুট, ব্রজবেণু, ব্রজবাঁশরী, বৈকালী প্রভৃতি গ্রন্থের কবিতাবলীই তাঁর বৈষ্ণবতার প্রমাণ বহন করে। তাঁর বৈষ্ণব রসের কয়েকটি কবিতা বাঙালীর মুখে মুখে ফেরে। 'বৃন্দাবন অন্ধকার' কবিতাটির কথা এখানে উল্লেখ করা দরকার। "নন্দপুর চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার, চলে না চল মলয়ানিল বহিয়া ফুল গন্ধভার"—কোন্ বাঙালী না পড়েছেন। একালে মানুষের এমন হৃদয়গ্রাহী কবিতা আর কি লেখা হয়েছে ?

তাঁর কাব্যের তৃতীয় ধারাটি হচ্ছে বিচিত্র বিষয়ের ওপর তাঁর মনোনিবেশ। সেখানে যেমন সমসাময়িক ঘটনার সংবেদনে তিনি কাতর হয়েছেন, তেমনি প্রাচীন ইতিহাসের ও সংস্কৃতি চিন্তার প্রতিও তাঁর অনুরাগ লক্ষিত হয়েছে। পল্লীর স্মৃতি তাঁকে ব্যথিত করেছে তাও লিখছেন অনায়াসে, তেমনি শহর জীবনের বিড়ম্বনায় তিনি বিপর্যস্ত সে চিন্তাতেও তাঁর কাতরতা

প্রকাশিত হয়েছে।

তাঁর বিষয়বৈচিত্র্য নিয়ে অনেক কথাই বলা উচিত। তিনি বৃত্তিতে শিক্ষক, তাঁর শিক্ষক জীবনের নির্যাস রয়েছে 'ছাত্রধারা' কবিতায়। এটি এক অনবদ্য সৃষ্টি। কবিতাটি সকলেরই প্রায় মুখস্থ, তাই উদ্ধৃতির প্রয়োজন নেই। ছোট ছোট নবনব ছাত্র এসে শিক্ষাজীবন শুরু করেছে, বছরে বছরে তারা আসে, যৌবনের শ্যামল গৌরবে সেই কিশলয় পর্ণে পরিণত হয়ে বৃহত্তর শিক্ষার ক্ষেত্রে জীবনের অন্য এক প্রান্তরে চলে যায়, প্রতি ছাত্রের প্রতি শিক্ষকের অমেয় দরদ, অসীম ভালবাসা কবিতাটির পংক্তিতে পংক্তিতে ঝরে পড়েছে। প্রতি বছরই দলে দলে ছাত্র আসে যায়। তাদের কথা কবির মর্মে গাঁথা থাকে, বহুদিন পরে পথে ঘাটে দেখা হলে মুখটা আবছা আবছা মনে জাগে, স্মৃতি সুতোয় টান পড়ে কোন্ ব্যাচে সে পাশ করেছে মনে পড়ে, কিন্তু নাম মনে পড়ে না, 'মালিকা পরিলে গলে প্রতি ফুলে কেবা মনে রাখে?' এই পংক্তিটি প্রবচন হয়ে গেছে।

সেই কবিই জাতীয়জীবনে গৃহীত হন যার বাণী স্বাভাবিকভাবেই জনসাধারণের ঠোঁটে ঠোঁটে ফেরে, প্রবাদ প্রবচনের সংস্কৃতিলোকে চিরস্থায়ী হয়। কালিদাস আজ সেই পর্যায়ের জাতীয় কবি।

বঙ্গবিভাগ নিয়ে তিনি 'খণ্ডকপালা' নামে যে কবিতাটি লেখেন তাও বাঙালী জাতির বিষাদ খিন্ন এক সংবেদনের দলিল বিশেষ। তাঁর বিচিত্র ধরণের কবিতার খোঁজ পাওয়া যাবে 'আহরণী'তে। এই গ্রন্থে কবি বিবিধ বিষয়ের ওপর লেখা কবিতা নিয়ে সঙ্কলন করেছেন। তাঁকে লোকে পল্লীকবি ও বৈষ্ণব কবি বলায় তিনি বোঝাতে চান যে ঐসব বিষয় ছাড়াও তিনি যে অজস্র কবিতা লিখেছেন তারই দলিল হিসাবে 'আহরণের' সগোত্র না করে পরিপূরক গ্রন্থ হিসাবে 'আহরণী' প্রকাশ করেন।

কালিদাস রায়ের কিছু প্রেমের কবিতাও আছে, তবে সে গার্হস্থ্যজীবন-কেন্দ্রিক, মর্ত্যলোকের মানবীর প্রতি সে প্রেম নিবেদিত। প্রেমের মাধুর্য ও বেদনা নিয়েই তিনি লিখেছেন। এছাড়া গার্হস্থ্য জীবনের অন্যান্য অনুভূতির কবিতা যেমন, 'কন্যাদায়,' 'পুত্রশোক', 'গৃহবিবাদ'. 'স্নেহস্মৃতি,' 'বন্ধ্যার খেদ,' 'শিশুর দুরন্তপনা,' 'অভিমান,' 'পিতার স্নেহ' প্রভৃতি বিষয় নিয়েও তিনি অনেক কবিতা লিখেছেন।

আর লিখেছেন কিছু রঙ্গব্যঙ্গের কবিতা, তাঁর 'রসকদম্ব' ও 'দন্তরুচি কৌমুদী' গ্রন্থের কবিতা এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। 'শুদ্ধকথা', 'অন্যমনস্ক' প্রভৃতি কবিতাও সকলের অনেকবার করে পড়া। তাঁর ব্যঙ্গ কবিতার মধ্যে জ্বালা নেই, আক্রমণ নেই—মানুষের চারিত্রিক অসঙ্গতি নিয়ে রসিকতা আছে। তিনি সুন্দর প্যারডি কবিতাও কিছু লিখেছেন, যেমন 'বঞ্চিত' (কেন বঞ্চিত হবে ভোজনে) তোমরা ও আমরা (তোমরা মোটর হাঁকায়ে চলিয়া যাও), তোমার মুরদ (তুমি নির্মম করে চুরমার কর নারীর মর্ম খোঁচায়ে) প্রভৃতি।

বাঙালী জীবনের বিবিধ অনুভব মূর্ত হয়েছে বলে কবিশেখরের লেখা কোনদিনই বাঙালীর অন্তর থেকে প্রস্থান করবে না। তিনি জনসাধারণের মধ্যে সমান শ্রদ্ধায় অম্লান ঔজ্জ্বল্যে বিরাজ করবেন, কারণ মনস্বিতার দ্যুতি তাঁকে উচ্চকোটির বেদীতে বসায় নি, তিনি সাধারণের মনোভূমিতেই সাম্রাজ্যবিস্তার করেছেন। তাই কবিশেখর যথার্থই বাঙালী কবি, বাঙালীর কবি।

সমালোচক ও বোদ্ধা

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

কবিশেখর কালিদাস রায় প্রধানত কবি বলেই পরিচিত। রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায়—জীবদ্দশায় বললেও যথেষ্ট বলা হয় না, রবিপ্রতিভা যখন মধ্যগগনে, ট্র্যাডিশনাল কবিতা লিখে খ্যাতি অর্জন করা নিশ্চয়ই অনেকখানি শক্তিসাপেক্ষ ছিল। কালিদাস রায় সেই দুরূহ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই কবি হিসাবে পরিচিতি এবং মহাকবির স্নেহ ও আশীর্বাদ লাভ করেছিলেন। বিশেষত, প্রথম বয়সেই তাঁর 'নন্দপুর চন্দ্রবিনা বৃন্দাবন অন্ধকার। চলে না চল মলয়ানিল বহিয়া ফুলগন্ধভার' কবিতাটি যে অসামান্য আলোড়ন ও আলোচনার সৃষ্টি করেছিল তা যে কোন তরুণবয়স্ক কবির পক্ষেই ভাগ্যের কথা। পরবর্তী কালে প্রবেশিকা পাঠ্যপুস্তকে তাঁর 'ছাত্রধারা' কবিতাও কম প্রশংসা অর্জন করেনি। সুতরাং কবি তো তিনি বটেই। কবিতা তিনি লিখেওছেন অজস্র এবং কোনটাই অপাঠ্য নয়। বর্তমান যুগের মানদণ্ডে অবশ্য তাঁর কিছু ঘাটতি আছে—তার কবিতায় মিল আছে, ছন্দ আছে, অনুপ্রাস আছে এবং সর্বাপেক্ষা যা অমার্জনীয়, তার কবিতা বোঝা যায়। তবে সে সব কথা এখন থাক সমালোচক ও বোদ্ধা কবিশেখরের কথাই এখানে বলি।

কালিদাস রায়, আমরা কালিদা বলতুম,—লেখায় ক্ষমতাও রাখতেন। পরিশ্রম করতে পারতেন প্রচুর। পাঠ্যপুস্তকের জগতে তাঁর দানও কম নয়। নিজ নামে, কিছু বেনামেও অজস্র স্কুল পাঠ্য বই লিখেছেন এবং তা শুধু সাহিত্য বিভাগেই সীমাবদ্ধ নয়। এছাড়া মোটা মোটা ব্যাকরণের বই এবং রচনাদর্শ প্রভৃতি রচনার বইও বিস্তর প্রশংসা এবং বেশ কিছু অর্থ এনে দিয়েছিল। তাঁর 'গাথাঞ্জলি' বহুকাল ধরে বহু স্কুলে পাঠ্য ছিল। এছাড়া শেষ বয়সে তিনি এক নতুন ধরনের প্রবন্ধ লিখছিলেন। এর অধিকাংশই আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও আরও বহু পত্রপত্রিকায় বেরিয়ে ছিল। 'কথাসাহিত্য' মাসিকপত্র তাদের অন্যতম। ঐ যে বলছি লেখায় শক্তি ছিল অপরিসীম, যখন যা ধরতেন তাই অবিরাম এবং অনেক লিখে যেতেন। এগুলি হ'ল গল্প বা কথোপকথনের ঢঙে আমাদের সামাজিক জীবনযাত্রায় দোষ ত্রুটির আলোচনা, সেগুলি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া। এ লেখাগুলি খুব জনপ্রিয় হয়েছিল, তার কারণ ওর মূলে খুব তিক্ত সত্য থাকত।

'আমি কিন্তু অন্যভাবে নিরখি তোমায়' আর এক কবির ভাষায় কালিদা সম্বন্ধে আমার ধারণাই এবার বলতে চাই। কালিদার এসব শক্তি যথেষ্ট বা অপর্যাপ্ত থাকলেও কালিদা সবচেয়ে বড় ছিলেন সাহিত্য আলোচক বা সমালোচক হিসাবেই। এগুলি সাধারণত কলেজের ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যরূপে পরিগণিত। কবির এই গদ্য আলোচনাকে অনেকে অনধিকার চর্চা বলে মনে করেছে, হয়ত

তিনি কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন না সেজন্য কিংবা ডক্টরেট ডিগ্রি পাওয়া নন বলে (জীবনের শেষ প্রান্তে অবশ্য তিনি একসঙ্গে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট হয়েছিলেন) ছাত্ররা অত গ্রাহ্য করেনি, তাদের অধ্যাপকদের লেখা বা সুপারিশ করা বই তাদের আখেরে কাজে লাগে বলে সেই সব আলোচনার বইই পড়ে—তাঁর অসাধারণ মেধাপ্রসূত বইগুলির যতটা জনপ্রিয়তা পাওয়া উচিত ছিল, ততটা পায়নি। সবচেয়ে বড় কথা, এই সব অধ্যাপকের দল, তথাকথিত সমালোচকের দলও তাঁর বই পড়ে অনেক কিছু শিখতে পারতেন, তাঁরাও এই সুযোগ অবহেলা করেছেন। যাঁরা করেন নি, তাঁরা উপকৃত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত অধ্যাপক ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, বিশ্বপতি চৌধুরী অন্যতম। আমি তাঁদের নিজে দেখেছি গভীর শ্রদ্ধা ও মনোযোগের সঙ্গে কবিশেখরের মতামত আলোচনা করতে।

বিশেষত শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে তিনি যে আলোচনা করেছেন তা আর কেউ করেননি। হয়ত কেউ আর করবেও না। তিনি যে গভীরে প্রবেশ করেছিলেন, যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তথ্য নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন অত করার বা অত গভীরে যাবার মতো ধৈর্য, রসবোধ, অনুভূতি ও বিস্তারিত সাহিত্য পাঠের অভিজ্ঞতা বা শিক্ষা এখন কজনের আছে! শরৎচন্দ্রেরই দুর্ভাগ্য এটা, জনসাধারণের প্রীতি ও অনুরাগ যতটা পেয়েছেন পণ্ডিত সমালোচকদের স্বীকৃতি সে অনুপাতে কিছুই পাননি। কোন কোন থিসিস ইদানীং লেখা হচ্ছে বটে তবে তা আধুনিক কালের গবেষিত, তাতে খুব বেশী রসবোধ, বিচারবোধ বা বিশ্লেষণ শক্তি আশা করাও হযত অন্যায়।

কালিদা যা লিখেছেন তা হয়ত সুদূর ভবিষ্যতে একদিন লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। আমার দুঃখ তিনি ইদানীং আমাদের আড্ডায় বা অন্যত্র অনুজ ও বন্ধুসমাবেশে যেসব আলোচনা করতেন, সাহিত্য সম্বন্ধে যা বলতেন সেগুলি হারিয়ে গেল। অথচ সেগুলি অমূল্য। এই সব সময়ে এক-একদিন আলোচনা প্রসঙ্গে যে বিচিত্র মণিমুক্তা তিনি ছড়িয়ে যেতেন তার গভীরতা ও যৌক্তিকতায় অবাক হয়ে গিয়েছি। এখন আপসোস্ হয় তা লিখে রাখার কথা বা লিখে নেবার কথা মনে পড়েনি বলে। দুধ মরে যেমন ক্ষীর হয় তেমনই তাঁর সাহিত্যবোধ দিনে দিনে গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়েছে। এদেশেরই দুর্ভাগ্য যে কতকগুলি বাজে চাপরাস না থাকায় সেদিন কেউ তাঁকে উপযুক্ত মর্যাদা বা তাঁর কথার দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দেয়নি। তবে পরবর্তী কালে কোন বোদ্ধা তাঁকে নতুন করে আবিষ্কার করবে এই আশাই পোষণ করব।

পল্লী কবি কালিদাস

ডঃ অমিয়কৃষ্ণ রায়চৌধুরী

কবিশেখর কালিদাস রায় বর্ধমান জেলার বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীখণ্ডের নিকটবর্তী কড়ুই নামক গ্রামে এক মধ্যবিত্ত বৈষ্ণব পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কবিশেখরের বাল্যজীবন গ্রামেই কাটে। কৈশোরজীবন নগরের উপকণ্ঠে এবং ২৪ বৎসর হইতে ৩১ বৎসর বয়সের যৌবনকাল উত্তরবঙ্গের একটি গ্রামে যাপিত হয়। জীবনের বাকি অংশ যাপিত হয় নগরে। তাঁহার বাল্যশিক্ষা গ্রামে, স্কুলের শিক্ষা বহরমপুর শহরের মিশনারী স্কুলে এবং কলেজের শিক্ষা বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে, সংস্কৃত শিক্ষা কাশিমবাজারের আশুতোষ চতুষ্পাঠীতে ও বৈষ্ণব অধ্যাপক রাসবিহারী সাংখ্য তীর্থের টোলে। আচার্য্য ই. এম. হুইলারের চরণতলে কবির ইংরেজী সাহিত্যপাঠের সৌভাগ্য ঘটিয়াছিল। কবি ১৯১৩ সাল হইতে ১৯৫৩ সাল চল্লিশ বৎসর শিক্ষকতাকার্যে ব্রতী ছিলেন।

কবির এই সংক্ষিপ্ত জীবনীর সঙ্গে কবির কাব্যসাধনার গভীর পরিচয় আছে। সেজন্য এই পরিচয়টুকু দেওয়া হইল।

কবিশেখরকে রবীন্দ্রানুগামী কবিদের অন্যতম বলা হয়। কিন্তু কবিশেখরের রচনায় রবীন্দ্র-নাথের প্রভাব খুব বেশী নয়। রচনার ছন্দোবৈচিত্র্য, ভাষার পারিপাট্য, পরিচ্ছন্নতা, পদলালিত্য ও কবিতার গঠনভঙ্গী ইত্যাদিতে রবীন্দ্রনাথের অনুস্মৃতি দেখা যায়, কিন্তু বিষয়বস্তু নির্বাচন, দৃষ্টিভঙ্গী, কল্পনার গতিপ্রকৃতি, আন্তরিকতা এবং অনুভূতির গভীরতা ইত্যাদির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক নাই। কবিশেখরের রচনায় সংস্কৃত কবি, বৈষ্ণব কবি, ইংরেজী রোমান্টিক কবি, বাংলার লোকসাহিত্যের কবিদের প্রভাবের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবের একটি মিশ্রিত সঞ্চার দেখা যায়।

কবি স্বভাবতই বাংলার পল্লীজীবন লইয়াই কাব্যরচনার সূত্রপাত করেন। এ যুগে কবি-শেখরকে পল্লীকবি, তরুণদের ভাষায় ঐতিহ্যানুগামী গ্রামকেন্দ্রিক কবি বলিয়া অবজ্ঞার সহিত ঠেলিয়া রাখা হয়। পল্লী যেমন অবজ্ঞার বস্তু, পল্লীকবিও তেমনি অবজ্ঞার পাত্র। পল্লীকবি বলিয়া স্বীকার করায় যে আসল বাঙালী কবি বলিয়াই স্বীকার করা হইল, একথা নব্যতন্ত্রী সমালোচকগণ খেয়াল রাখেন না। বাংলা দেশ তাহার পল্লীতে না কলিকাতা শহরে?

পল্লীকবিতা যেন কতই সস্তা! এদেশে আসল পল্লীকবিতা তো ছিলই না। মঙ্গলকাব্য পল্লী অঞ্চলে গীত হইলেও পল্লীকবিতা নয়, বৈষ্ণব কবিতাও বাংলার পল্লীকবিতা নয়, রামায়ণ-মহাভারত ভাগবতের অনুবাদও পল্লীকবিতা নয়। গুপ্তকবি, মাইকেল, রঙ্গলাল, হেম, নবীন এমনকি রবীন্দ্রনাথও পল্লীকবি নহেন। লোকসঙ্গীতের মধ্যে কিছু কিছু পল্লীজীবন প্রতিবিম্বিত হইয়াছে;

কিন্তু আসল কবিতা সে সবের মধ্যেও নাই। পল্লীকবিতার সূত্রপাত ভাওয়ালের গোবিন্দদাসের কয়েকটি রচনা হইতে এবং রবীন্দ্রনাথের বধূ কবিতা হইতে।

দ্বিজেন্দ্রলাল, অক্ষয়কুমার, রজনীকান্ত, দেবেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ইত্যাদি রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবিরাও পল্লীকবিতা রচনা করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের বধূও পল্লীর আসল প্রতিনিধি নয়। পল্লীর মানুষ দরিদ্র, দুঃস্থ, অজ্ঞ, অশিক্ষিত এবং অধিকাংশ নিম্নজাতীয়, তাঁহাদের সুখদুঃখ, আশা আকাঙ্খা, রীতিনীতি, ভয় ভরসার কথা লইয়া লেখাই আসল পল্লীকবিতা। কুমুদ রঞ্জন, কালিদাস ও জসিমউদ্দীন এই তিনজনই আসল পল্লীকবি। কিন্তু ইঁহারা তিনজনে বিশাল পল্লীবাংলার কতটুকুর পরিচয়ই বা দিতে পারিয়াছেন? তবে ইহার মধ্যেই রব উঠিয়াছে পল্লীজীবনের কবিতা, নব্যতন্ত্রীয়দের ভাষায় গ্রামবাংলা লইয়া লিখিত কবিতা আর চলিবে না। দুইদিন বাদেই হয়ত শুনিব গ্রামবাংলা লইয়া রচিত উপন্যাসও আর চলিবে না।

যেজন্য তারাশঙ্কর ও বিভূতিভূষণের কথাসাহিত্য শ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া গণ্য হইয়াছে সেইজন্যই কুমুদরঞ্জন ও কালিদাসের পল্লীকবিতাগুলি শ্রেষ্ঠ কবিতা। সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে দেখিলেই তাহা ধরা পড়িবে।

কবিশেখরের পল্লীকবিতার ধারার সূত্রপাত হইয়াছে প্রথম যৌবনে, আজিও সে ধারা অন্যান্য বিবিধ ধারার পাশাপাশি সমান্তরাল ভাবেই চলিতেছে। কবিশেখরের অজস্র পল্লীকবিতার একটি অন্যটির পুনরাবৃত্তি মাত্র নয়। কুমুদরঞ্জন পল্লীতে বসিয়াই পল্লীজীবনের কবিতা লেখেন—তিনি নব নব বাস্তবরূপে পল্লীকে দেখিতে পান—তাঁহার সম্মুখে অফুরন্ত উপাদান সম্ভার। কিন্তু ব্যবধানেরও একটা মূল্য আছে। কবিশেখর নগরে বসিয়া পল্লীকে দেখেন মনশ্চক্ষে—তাহার ফলে পল্লী তাঁহার চোখে রোমান্টিক হইয়া উঠে—কবি নিজের মনের মাধুরী দিয়া বাল্য কৈশোরের অবিকৃত পল্লীভূমিকে নব নব রূপে গড়িয়া তোলেন। কবিতার পক্ষে ইহাতে লাভ বই লোকসান নাই। শরৎচন্দ্রের রচনায় তাঁহার বাল্য কৈশোরের পল্লীজীবন পরবর্তী কালে রোমান্টিক রূপ ধরিয়াছিল। আমার মনে হয়, সাহিত্যের পক্ষে এইরূপ পরিচয়ও চাই, ব্যবধানও চাই।

পল্লীবাসীদের প্রতি অর্থাৎ নিম্নস্তরের লাঞ্ছিত বঞ্চিত মানুষের প্রতি গভীর দরদই কবিশেখরের পল্লী কবিতাগুলিকে সার্থক কবিতা করিয়া তুলিয়াছে।

কবিশেখরের পল্লীকবিতার বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁহার বহু পল্লী কবিতায় পল্লীবাসী পল্লীবাসিনীদের ভাষায়, তাহাদেরই জবানী তাহাদের অন্তরের গভীর আবেদন ব্যক্ত হইয়াছে। এইভাবে কবি কুড়ানী মেছুনী, কৃষাণী, কৃষকবালা, পল্লীর বিরহিণী, পল্লীর জননী, ভগিনী, সখা, রাখাল ইত্যাদির অন্তরের কথা তাহাদের নিজেদের ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। দুই-একটি নিদর্শন দিই—

বর্ষা ফুরায় লাউ কুমড়ার গোটা চাল যায় ভ'রে,
পুকুর ডোবায় কলমী শুশুনী তুলে আনি ঝুড়ি ক'রে।

নালাটি শুকায়-কাঁকড়া [illegible] মাছ ঢুঁড়ে মরা মিছে,
কুড়াই ঝিনুক গুগুলি শামুক জেলেদের পিছে পিছে।
এমনি করেই তিলটি কুড়িয়ে তালটি করেই জড়ো
কুড়ানো ভাতে এ পেটটি ভরায়ে হয়েছিতো এত বড়।
পড়সীরা কয়—গতর দেখ না, হাতমুখ গোলগাল,
এত যে খাওয়াই মোদের মেয়ের শুকনীর মত হাল।।

কাঁচা আলে কারো দিই না পা আমি, পাকা ধানে কারো মই,
বাসনো মাজি না, ভিখারী সাজি না, এমনি করেই রই।
চলি এইবার আজ হাটবার ডেকো না কেউ পিছু,
যাই হাটতলা, সেথা শেষবেলা কুড়ালে মিলবে কিছু॥

আর একটি নিদর্শন—

দাঁড়াও দাঁড়াও ওগো দখিন পাড়ার রূপসী।
নেক নজরে চাও এঘরে হও গো প্রেয়সী॥
দেব শাড়ী শান্তিপুরে গামছা দেব রঙিন ডুরে
আনতে পানি দেব তোমায় পিতল কলসী।।
ফিতে কাঁকুই দেব তোমায় খোঁপা বাঁধিতে।
তালের নতুন তাতারসি পায়স রাঁধিতে।
পৈছা শাঁখা দেব হাতে রাখব তোমায় দুধে ভাতে
না হয় নিজে বাদলা রাতে রয়ে উপোসী॥
হাঁটতে পাছে কাদা লাগে আলতা পরা পায়,
আষাঢ় মাসে ঝামা পেতে রাখব আঙিনায়।
নতুন ছাওয়া আমার ঘরে নতুন বোনা মাদুর 'পরে
এসো তোমায় পুজব দিয়ে দুব্বোতুলসী।।

পল্লীজীবনের আবেষ্টনীরূপে পল্লী প্রকৃতির বর্ণনা আসিয়া পড়িয়াছে। প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে যে মাখামাখি সম্বন্ধের মাধুর্য কবিতাগুলিতে রাজযোটকতা লাভ করিয়াছে তাহা কি নাগরিক কবিতায় সম্ভব?

কবি বাস্তব পল্লীর দিকে যেমন একচোখ রাখিয়া আগাইয়াছেন, তেমনি কাল্পনিক সদানন্দময় পল্লীর দিকে আর-এক চোখ ফিরাইয়াছেন—এই পল্লী হচ্ছে বৃন্দাবন। বাঙালী কবিরা যুগ যুগ ধরিয়া এই পল্লীটিকে কল্পনায় গড়িয়াছেন। এই স্বপ্নঘন পল্লীর নরনারীর সঙ্গে বৈষ্ণব পরিমণ্ডলের কবির পরিচয় বাল্য হইতেই ছিল। অত্যন্ত স্বাভাবিক-ভাবেই কবিশেখর ব্রজের কবি হইয়া উঠিয়াছেন। ছাত্রজীবনে কবি একটি গান লেখেন তাহার নাম 'অন্ধকার বৃন্দাবন'। গানটি

বড় বলিয়া ইহাকে কবিতা বলা হয়। ছাত্রজীবনের শেষের দিকে এই গানটি 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হয়। এই গানটি হইতেই কবি 'ব্রজের কবি' বলিয়া বিখ্যাত হন। চারিদিক হইতে যুগপৎ চেষ্টা হয় (আজিও সে চেষ্টা চলিতেছে) গানটির খ্যাতি ধ্বংস করার জন্য। কিন্তু ইহার খ্যাতি আজিও নষ্ট হয় নাই, বরং বাড়িয়া গিয়াছে। সারা উড়িষ্যায় এ গান গ্রামে গ্রামে গাওয়া হয়। চিল্কা হ্রদের তীরবর্তী গ্রামগুলির ভাগবতঘরে পর্যন্ত আজ এই গান গীত হয়।

যাহা হউক 'অন্ধকার বৃন্দাবন' কবিশেখরের সর্বস্ব নয়। তিনি আলোকিত বৃন্দাবনেরও গান বহু লিখিয়াছেন। কবিশেখরের ব্রজসঙ্গীতগুলি পাঁচ শ্রেণীর, যথা—

১। ব্রজপথের মাধুকরী রচনা অর্থাৎ পদকর্তাদের পদাবলীতে প্রতিফলিত বৃন্দাবনে বিন্দু বিন্দু মধু আহরণ করিয়া মধুচক্র রচনা। এইগুলিতে ব্রজভাবকে নবকলেবর দান করা হইয়াছে। 'অন্ধকার বৃন্দাবন' এই পর্যায়ে পড়ে।

২। বাংলার মাঠ গোঠ ঘাটবাট ধেনু রাখালকে ব্রজের মধ্যে পরিকল্পনার ফলে আর এক শ্রেণীর কবিতার সৃষ্টি হইয়াছে। আবার প্রাকৃত পরকীয়া স্বাধীন প্রেমকেই রাধাকৃষ্ণের লীলার মধ্য দিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে কতকগুলি কবিতায়।

৩। সখ্য ও বাৎসল্য রসের উৎকৃষ্ট কবিতা পদাবলীতে নাই, বৈষ্ণব সাধককবিদের চোখে এই দুইটি ছিল নিম্নস্তরের রস। কবিশেখর এই দুইটি রসকে প্রাধান্য দিয়া ব্রজভাবে আবিষ্ট হইয়া কতকগুলি উৎকৃষ্ট কবিতা রচনা করিয়াছেন—লুকোচুরি, আড়ি, রাখালরাজ, সাফল্য ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

৪। কতকগুলি গতানুগতিকভাবে রচিত ভক্তিরসের কবিতা। এইগুলিতে ভক্তির গাঢ়তা কাব্যরস সৃষ্টির উপজীব্য হইয়াছে।

৫। কতকগুলিতে কবিশেখর বিশ্বজনীন দৃষ্টিতে ব্রজভাবের symbolical ও spiritual interpretation দিয়াছেন। অভিসার, দোল, ঝুলন, মাথুর ইত্যাদির অভিনব বিশ্বজনীন ব্যাখ্যা উল্লেখযোগ্য।

একটি নিদর্শন—

তুমি শ্যাম তাই বিশ্বপ্রকৃতি এত শ্যামে শ্যামে ভরা,
তুমি শ্রীমোহন তাই এ নয়ন জুড়ায় তোমার ধরা।
বাজালে বাঁশরী সে সুর পশিয়া
মরমে তাহার তুলিল রসিয়া
কূজনে গুঞ্জে কল-ঝঙ্কারে আজো সে মানস হরা॥
ফাগে ফাগে কবে খেলেছিলে দোল
ফাগুনের বনে আজো হিল্লোল,
রাগে ও পরাগে বাগে ও তড়াগে দোলমালঞ্চ গড়া॥

গোকুলের হৃদি করিলে হরণ
তাই ঘরে ঘরে চুরি যায় মন,
তাই পায় পায় চোরের মাজায় পৌরিতি-শিকলি পরা ।।

কবিশেখরের 'ব্রজবেণুর' কবিতায় ব্রজবেণু, বঙ্গবেণু, বিশ্ববেণু—তিনই বাজিয়াছে। ব্রজবেণুর কবিতাগুলি পড়িয়া সেকালের লোকে খুবই আনন্দ পাইয়াছিলেন। দেশবন্ধু ইহার রাজসংস্করণ করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। অশ্বিনীকুমার দত্ত, বিপিনচন্দ্র পাল, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, দীনেশচন্দ্র সেন শশাঙ্কমোহন সেন কবিকে প্রাণ ভরিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। এই বই পড়িয়াই রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—"এই কবিতাগুলি পড়িলে বাংলার ছায়াশীতল নিভৃত আঙিনায় তুলসীমঞ্চ ও মাধবীকুঞ্জ মনে পড়ে।"

সে বাংলা দেশ আর নাই—সে সব পাঠকও আর নাই, মহাপুরুষদের আশীর্বাদ ও সাধুবাদের মূল্যও আর নাই। কবিশেখর নিজেও ব্রজবেণুর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের প্রয়োজন বোধ করেন নাই। ব্রজবেণুর অধিকাংশ কবিতা এখন কবির কবিতা সংকলন আহরণ, আহরণী ও সন্ধ্যামণিতে ছড়াইয়া আছে।

পল্লীকবিতাগুলি পর্ণপুট ও ক্ষুদকুঁড়ায় ছিল, এখন সেগুলি সংকলন পুস্তকগুলিতে আশ্রয় পাইয়াছে।

ব্রজের পালা শেষ করিয়া কবি পুরাণের আসরে প্রবেশ করেন। 'প্রবাসী'তে যখন কবির 'দুর্বাসা' কবিতাটি প্রকাশিত হয়—তখন তাহাতে পৌরাণিক চরিত্রের symbolical Interpretation লক্ষ্য করিয়া সেকালের রসজ্ঞেরা খুব প্রশংসা করেন। কবি সত্যেন্দ্রনাথ ঐ শ্রেণীর কবিতা আরও লিখিবার জন্য কবিকে অনুরোধ জানান। কবি একলব্য, ভীষ্ম, দধীচি, ধ্রুব, প্রহ্লাদ, বিশ্বামিত্র, রাজর্ষি ভরত, কার্ত্তিক ইত্যাদি কবিতায় অভিনব ব্যাখ্যা দান করেন। কবির বন্ধু শিক্ষকসম্পাদক অধ্যাপক মহীতোষ রায়চৌধুরী ঐ শ্রেণীর কবিতাগুলি অবলম্বনে একটি প্রবন্ধ রচনা করিয়া তাহাদের রস বিশ্লেষণ করেন। কবি পরেও এ শ্রেণীর কবিতা অনেক লিখিয়াছেন। উক্ত কবিতাগুলি কবির 'পর্ণপুটে' আছে।

কবি পৌরাণিক নরনারীর কাছে বিদায় লইয়া পরে মহত্তর ব্রতের দিকে অগ্রসর হইলেন। তিনি এইবার এক-একটি বৈদিক দেবতাকে অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের বিশ্বাত্মক রূপ পরিকল্পনা করিয়া কতকগুলি অদ্ভুত রসের উদাত্ত গম্ভীর কবিতা রচনা করেন। এইগুলি যখন মাসিকপত্রে প্রকাশিত হইত—তখন কোন-কোন পত্রিকায় অপ্রচলিত ভাষা ও পাণ্ডিত্যের জন্য নিন্দাও প্রকাশিত হইত। এইগুলি লিরিক নয়, ওড শ্রেণীর কবিতা। এইগুলির স্থায়ীভাব বিস্ময়। এইগুলিতে পাণ্ডিত্যের সহিত কবিত্বের মিলন ঘটিয়াছে। কবির 'বৈকালী' গ্রন্থে অনেকগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল—পরে সংকলন তিনখানিতে স্থান পাইয়াছে।

এইগুলির মধ্যে বেদ, আদিত্য, প্রভঞ্জন, ইন্দ্র, বরুণ, সোম, বৈশ্বানর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় সাংস্কৃতির বিবিধ ধারার প্রতীক হিসাবে অশ্বত্থ, গঙ্গা, হিমাদ্রি, তুলসী, জবা, অশোক ইত্যাদি

আর একশ্রেণীর কবিতা রচনা করেন। এইগুলি প্রথমে বৈকালীতে প্রকাশিত হয়, পরে সংকলনে স্থান পাইয়াছে।

বৈদিকযুগ হইতে কবি পরে বৌদ্ধযুগে অবতরণ করেন। বৌদ্ধযুগের থেরীদের জীবন-কাহিনী অবলম্বনে কতকগুলি গাথা রচনা করেন। সেইসঙ্গে বুদ্ধদেবের উদ্দেশে স্তবমূলক কবিতা রচনা করেন।

বাংলার পল্লীর প্রতি গভীর মমতার ফলে যেমন পল্লীর নরনারী কবির হৃদয় জয় করিয়াছে—পল্লীর প্রকৃতিও তেমনি কবিকে মুগ্ধ করিয়াছে। আবার সংস্কৃত কাব্যনাট্যে বর্ণিত প্রকৃতিকে কবির মনে হইয়াছে যেন প্রাক্তন জন্মে সুপরিচিত, সে প্রকৃতি যেন কবিকে জাতিস্মর করিয়া তুলিয়াছে। ইহার ফলে সৃষ্ট কবির 'ঋতুমঙ্গল' কাব্যগ্রন্থ। ঋতুচক্রকে অবলম্বন করিয়া কবি একদিকে বর্তমান বাংলার প্রকৃতি, অন্যদিকে ভারতের প্রাচীন স্বপ্নময়ী প্রকৃতির মাধুর্য উপভোগ করিয়াছেন। মানবহৃদয়ের সঙ্গে প্রকৃতির সংযোগ ঋতুমঙ্গলের রচনাগুলিকে রসোত্তীর্ণ কবিতা করিয়া তুলিয়াছে। ঋতুমঙ্গলেরও আর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় নাই; অধিকাংশ কবিতা সংকলনগুলিতে স্থান পাইয়াছে।

কেবল বৌদ্ধযুগের নয়, ভারতের সকল যুগের নানা কাহিনী লইয়া কবি অনেকগুলি গাথা কবিতা রচনা করিয়াছেন। এইগুলি তাঁহার 'গাথাঞ্জলি' গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট। রবীন্দ্রনাথের কথা ও কাহিনীর পর গাথার পুস্তক ইহা ছাড়া আর প্রকাশিত হয় নাই। কবিশেখরের লালাবাবুর দীক্ষা, ত্রিরত্ন, অম্বপালী, কৃষ্ণার প্রতিহিংসা, রাঙাচুড়ি ইত্যাদি গাথা পাঠকগণের অপরিচিত নয়।

প্রশস্তিমূলক কবিতা এত বেশী অন্য কোন কবির নাই। এইগুলি বরাতী কবিতা নয়। কবির হৃদয়ের শ্রদ্ধাভক্তি হৃদয়ের বাধাবাঁধন অতিক্রম করিয়া উচ্ছলিত হইয়াছে। এইগুলি-কালিদাস, হর্ষবর্ধন ঈষপ, হাফেজ, উভয় ভারতী, মীরাবাঈ, কৃত্তিবাস, চাঁদ সদাগর, চণ্ডীদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রামপ্রসাদ, তুলসীদাস, শ্রীগৌরাঙ্গ, বিষ্ণুপ্রিয়া, বৃন্দাবনদাস, খৃষ্ট, পরমহংস, রামমোহন, মাইকেল, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিম, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ প্রফুল্লচন্দ্র, আশুতোষ, শ্যামাপ্রসাদ, শরৎচন্দ্র, সুভাষচন্দ্র, শেক্সপীয়ার, ব্রাউনিং, টেনিসন শেলী, কীটস ইত্যাদির প্রশস্তি।

বাংলা ভাষায় Epigrammatic কবিতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা'। ইহার পর রজনীকান্তের 'অমৃত' ঠিক epigrammatic নয়—didactic। কবিশেখর এই শ্রেণীর কবিতা রচনায় সিদ্ধহস্ত। তাঁহার 'বল্লরী' epigrammatic কবিতার সংকলন। এই শ্রেণীর অজস্র কবিতা এখন চৌপদী, ষট্‌পদী, অষ্টপদী নামে মাসিকে প্রকাশিত হইতেছে।

কালিদাস রায় এ যুগে রঙ্গ-ব্যঙ্গ কবিতা রচনায় বোধহয় অগ্রগণ্য। তাঁহার রঙ্গব্যঙ্গের কবিতা বেতালভট্টের ছদ্ম নামে প্রকাশিত হয়। 'রসকদম্ব' ও 'দন্তরুচি কৌমুদী' নামক কবিতাগ্রন্থ এই শ্রেণীর রচনার সংকলন। এই শ্রেণীর কবিতা জগৎ সংসার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা না জন্মিলে, সমাজের অনাচার, কদাচার, কাপট্য, শঠতা কৃত্রিমতা, ভণ্ডামি ইত্যাদির সঙ্গে পরিচয় না ঘটিলে কবির লেখনীতে স্বভাবত আসে না। কবিশেখর যখন স্থায়ীভাবে নগরে বাস করিতে লাগিলেন—তখন তাঁহার প্রতিভায় রঙ্গ-ব্যঙ্গের উৎসমুখ খুলিয়া গেল। তখন হইতেই তিনি রঙ্গ-ব্যঙ্গের কবিতা লিখিতেছেন।

নব্যতন্ত্রীর কবিরা খুবই সিরিয়াস প্রকৃতির মানুষ। তাঁহারা তাঁহাদের রচনায় হাসেন না ও কাঁদেনও না। তাঁহারা ভাবেন—দুইই বাঙ্গালী চরিত্রের দুর্বলতা। তাঁহারা বাঙ্গালী চরিত্রের এই চিরন্তন দুর্বলতা বুঝি জয় করিয়াছেন। আমরা না কাঁদিয়া থাকিতে পারি, কিন্তু না হাসিয়া থাকিতে পারি না। যে সব কবি হাসির খোরাক যোগান, তাঁহাদের আমরা ছোট কবি মনে করিতে পারি না—ইহাই বোধহয় আমাদের দুর্বলতা।

তাঁহার অনেক ব্যঙ্গকবিতা 'আহরণী'তে সংকলিত আছে। তাঁহার একটি হাসির কবিতা 'গুরু চাই'। কংগ্রেস মণ্ডপে কবিশেখরের সংবর্ধনা সভার সভাপতি (নব্যতন্ত্রীয় কবি) ঐ কবিতাটি পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলেন—কিন্তু হাসির কবিতা বলিয়া নয়, ইহাতে প্রগতির আদর্শ আছে বলিয়া।

কালিদাস বাবুর রচনায় প্রগতিমূলক আদর্শ আছে কিনা জানিতে হইলে তাঁহার রঙ্গব্যঙ্গের কবিতাগুলি পাঠ করিয়া দেখা উচিত।

আমি এই নিবন্ধে কবিতার যে সকল ধারার উল্লেখ করিলাম—কোন ধারাই জীবনের মরুপথে হারায় নাই সবগুলিই কবির বার্ধক্যের ঊষর কঙ্করময় ক্ষেত্রেও সমভাবে বহমান আছে। তবে বৃহত্তর জগতের দিকে কবির দৃষ্টি এখন বিচরণ করিতেছে—অতীতের প্রতি কবির অন্ধ মমতা থাকিলেও চারিপাশের বর্তমান জগতের কোথাও রসের প্রেরণা পাইলে তিনি উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যান না। বর্তমান নাগরিক জীবনেও তিনি কবিতার উপজীব্য পাইয়া থাকেন এবং তাহাকে বাণীরূপ দেন। ক্ষণিকের সংসার, সাড়ে চার আনা, পৌর প্রভাত, ট্রামে, ঘড়ি, সংসারচিত্র, শোকসভা ইত্যাদি কবিতার উল্লেখ করা যাইতে পারে। এমন সব বিষয় লইয়া তিনি ইদানীং কবিতা লিখিয়াছেন যেসব বিষয় লইয়া কেহ পূর্বে কোন কবিতা লেখেন নাই। যেমন—সাপুড়িয়া, মুদ্দফরাস, ডাক্তার (প্রাণাচার্য), দপ্তরী, ঘড়ি, শকুনি, জোনাকি ইত্যাদি।

আর একটা মনোভাব খুব স্পষ্ট হইয়া তাঁহার লেখায় দেখা যাইতেছে—তাহাতে আছে—বৈরাগ্য, নির্বেদ, নৈরাশ্য, স্মৃতির পীড়ন, বিগতজীবনের ভুলভ্রান্তির জন্য আক্ষেপ। অনেক কবিতাই দিন ফুরানোর গান—তাহাতে বিদায়ের সুর ধ্বনিত হইতেছে। বৃদ্ধ বয়সে ইহাই তো স্বাভাবিক।

নবযুগের কবি কালিদাস

ডঃ সুশীল রায়

কালিদাস রায়ের লেখা দুটি ছত্র আজও প্রায়ই মনে পড়ে। তখন আমাদের বয়স কম। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার আগে হাজারিবাগের ঝুমরি-তিলাইয়ায় গিয়েছিলাম, যেখানে এখন হয়েছে তিলাইয়া বাঁধ। বাংলার বাইরে এই অঞ্চল। অভ্রখনির দপ্তরে কাজ করেন কয়েকজন মাত্র বাঙালী। তাঁরাই তখন সেখানকার বাঙালী বাসিন্দা। এক বাড়ি থেকে এক কপি পুরনো পত্রিকা পেলাম, বোধহয় 'মানসী ও মর্মবাণী'। তাতে কালিদাস রায়ের একটা কবিতা দেখি, তার দুটি ছত্র এই রকম যতদূর মনে পড়ে—

গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজি
মোর নাই আঁখিজল ছাড়া ॥

কেন-যেন ঐ ছত্র মনে খুব ধরে গেল। এবং সেইদিন থেকেই কালিদাস রায় নামটাও।

এর বহু পরে সেই কবির সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ের সুযোগ ঘটে। এটাকে সুবর্ণ সুযোগই বলব। কেন না, তাঁকে দেখলাম অতি সহজ সরল স্বাভাবিক একজন মানুষ রূপে, তাঁকে দেখলাম সহৃদয় এক আন্তরিকতাপূর্ণ মানুষ তখন মনে হল তাঁর লেখা ঐ ছত্রের কথা। ইচ্ছে হল গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করবার। ইচ্ছে হল তাঁকে বলি তাঁর 'পর্ণপুট' গ্রন্থ থেকে তাঁরই লেখা দুই ছত্র—

তোমার সনে নয় কো আমার নূতন পরিচয়,
অনন্তকাল বাসছি ভালো এমনি মনে হয় ॥

কিন্তু সেকথা শব্দ করে বলা না-হলেও মনে-মনে যেন উচ্চারণ করেছি অনেক দিন ধরেই।

কালিদাস রায় কবি। কবিত্বশক্তি নিয়েই জন্মগ্রহণ তিনি করেছেন। কিন্তু দৈবের হাতে জীবন সমর্পণ করে তিনি কবিতাচর্চা করেন নি। যে কবি-শক্তি তাঁর মধ্যে নিহিত ছিল তিনি তা চর্চায়-চেষ্টায়-অধ্যয়নে সঞ্জীবিত করে তুলেছেন। কবিতা তাঁর কাছে একটা সহজ সামগ্রী ছিল না, ছিল একটা পরম রতন, সেই ঐশ্বর্য তিনি ধারণ করেই নিজেকে ধন্য জ্ঞান করেন নি, তিনি তাকে লালন করেছেন। উত্তরাধিকারসূত্রে পড়ে পাওয়া-চোদ্দআনা বলে তিনি মনে করেননি ঐ ঐশ্বর্যকে, তিনি তা অর্জন করেছেনই বলা যায়।

সপ্তকাণ্ড রামায়ণের মতই তাঁর জীবন কয়েকটি কাণ্ড দ্বারা গঠিত। যেমন নাকি নানা কাণ্ড বিস্তৃত করে গড়ে ওঠে এক মহীরুহ।

বস্তুতপক্ষে কবির জীবন মোটামুটিভাবে সাতটি পর্বে ভাগ করা যায়, যেমন—

পর্ব ॥ ১ ॥ কালিদাস রায়ের জীবনের প্রথম ১৭ বৎসর বয়স পর্যন্ত কাটে কাশিমবাজারে। এই সময়ে তিনি নির্বাচিত সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ করতে থাকেন। টডের রাজস্থান অবলম্বন করে কিছু কিছু কাহিনী পদ্যছন্দে রচনা করেন। সংস্কৃত শ্লোকের মত ছোট ছোট কবিতা রচনা করেন, 'কিশলয়' নামক একটি ছোট বইয়ে এগুলি সংকলিত হয়ে প্রকাশিত হয় ১৯১১ সালে। তাঁর জীবনের এই প্রথম পর্বকে 'অনুশীলন' পর্ব বলে আখ্যাত করা যায়।

পর্ব ॥ ২ ॥ ১৭ বছর বয়স থেকে বহরমপুরের কলেজের ছাত্র। এই সময়ে, তাঁর পূর্বে-রচিত কিছু অপরিচিত রচনা একত্রে করে প্রকাশিত হয় 'কুন্দ' নামে একটি বই। বইটি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন। কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন 'কিশলয়' ও 'কুন্দ' পাঠ করে কালিদাসের উদ্দেশে এই কবিতাটি রচনা করেন। এতে তরুণ-কালিদাস বিশেষ উৎসাহ লাভ করেন। কবিতার কিয়দংশ এইরূপ—

নগরের কোলাহলে বুঝি মোর বাহিরায় আয়ু
হয়েছিনু এত ঝালাপালা
তোমার সবুজ কুঞ্জে গ্রামে আসি' সেবি মুক্তবায়ু
হে কবি, জুড়াইল জ্বালা।
দোয়েলের কোয়েলের কলরব অফুরন্ত মরি,
অফুরন্ত ময়ূর নাচন,
যাদুকর, এ গো কোন্ মায়াপুরী! দিবা বিভাবরী
অফুরন্ত আনন্দ স্বপন।
বন্ধ্যার অখ্যাতি লভি এ যেন রে প্রৌঢ়া রমণীর
চাঁদপারা সন্তান প্রসব।
এ যেন যুগান্তে আহা বৃন্দাবনে মুরলীধারীর
পদার্পণ। সেই বংশীরব ॥

কাশিমবাজারে অনুষ্ঠিত প্রথম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয়। সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ১০০টি ইংরেজি কবিতার অনুবাদ করে, তার পরে মৌলিক কবিতা-রচনায় ব্যাপৃত হবার পরামর্শ দেন। এই অনুবাদ কাজের পরে কালিদাস পল্লীজীবন নিয়ে ও ব্রজলীলা নিয়ে মৌলিক কবিতা রচনা করেন। এই সময়ে দেশভক্তিমূলক কবিতাও তিনি লেখেন। অধ্যাপক ই. এম. হুইলারের অধ্যাপনায় তিনি বহু ইংরেজী কবিতার সংস্পর্শে আসেন, এবং চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত-পাঠের ফলে তাঁর কবিমন গঠিত হয়।

এই পর্বকে 'প্রস্তুতিপর্ব' আখ্যা দেওয়া যায়।

পর্ব ॥ ৩ ॥ কলিকাতায় ছাত্রজীবন আরম্ভ হল তাঁর। এই সময়ে তাঁর কল্পনা ধাবিত হল নানাদিকে। তিনি এ সময়ে মুখ্যত যৌবন স্বপ্ন নিয়ে বিভোর হলেন স্বাভাবিক নিয়মেই এবং প্রেমের কবিতা রচনায় প্রবৃত্ত হলেন। তাঁর এই সময়কার লেখা প্রবাসী, ভারতী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

এই সময়েই প্রকৃতিপ্রেমের কবিতাও তিনি রচনা করেন, তাঁর রচনায় রবীন্দ্রপ্রভাব তখন স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করা যায়।

কবির বিবাহ হয় এই সময়েই। রসজ্ঞ বন্ধুবান্ধবদের ও বিবিধ সাহিত্যপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর সংযোগ ঘটে।

পর্ব ॥ ৪ ॥ উত্তরবঙ্গের পল্লীতে শিক্ষকরূপে তাঁর নির্বাসিত জীবন-যাপন (১৯১৩-১৯২০)। তাঁর জীবনের অন্য কোনো পর্বে রচনায় এত প্রাচুর্য দেখা যায় না। অনেকগুলি গ্রন্থও প্রকাশিত হয়। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে (১লা বৈশাখ ১৩৩১) প্রকাশিত হয় 'পর্ণপুট' প্রথম ভাগ। পল্লীকবিতা, ব্রজকবিতা ও প্রেমের কবিতা এতে সংকলিত হয়। তার পরে 'বল্লরী'—এতে থাকে 'কিশলয়ে'র কবিতাগুলি ও 'কুন্দ' পুস্তকের কয়েকটি কবিতা—ক্যালকাটা ইউনিভারসিটি ইন্‌সটিটিউটের বন্ধুদের উদ্দেশে উৎসর্গ করেন এই বই। অতঃপর প্রকাশিত হল 'ব্রজবেণু' (১৯১৫)—এটি ব্রজলীলাত্মক কবিতার সংগ্রহ। পরের বছর, ১৯১৬ সালে প্রকাশিত হয় 'ঋতুমঙ্গল'—সংস্কৃত কবিদের প্রভাব এতে যথেষ্ট। প্রাচীনভারত ও বর্তমান স্বদেশ—দুইয়েরই প্রকৃতি এতে প্রবাহিত আছে বলা যায়। 'ব্রজবেণু'তে যে মধুর রসের কবিতাবলী আছে সেগুলি আসলে প্রেমের কবিতাই, কিন্তু রাধা ও কৃষ্ণের নামাঙ্কিত মাত্র, অথচ পদাবলীর অনুস্মৃতি নয়।

পর্ব ॥ ৫ ॥ এই পর্বে কবিজীবন কলকাতাতেই কেটেছে, এর আরম্ভ ১৯২০ সালে। পূর্ববর্তী পর্ব থেকে হাসির গান ও হাসির কবিতা রচনায় সূত্রপাত হয়েছে, এই পর্বে সেগুলি গ্রথিত হল 'রসকদম্ব' গ্রন্থে। এই সময়ে তিনি অনেক গান রচনা করেন ও সনেট লেখেন। 'পর্ণপুট' দ্বিতীয় ভাগ, 'ক্ষুদকুঁড়া' 'লাজাঞ্জলি' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় এই সময়ে। এ পর্বে কালিদাস যেসব কবিতা রচনা করেন তার বেশির ভাগই গার্হস্থ্য জীবনের সুখদুঃখ-সংক্রান্ত ও শিক্ষকজীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে। ভারতীয় সংস্কৃতি অবলম্বনে দীর্ঘ কবিতা রচনায় সূত্রপাতও এই পর্বে।

পর্ব ॥ ৬ ॥ কালিদাস এই সময়ে সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ করতে আরম্ভ করেন। ১৯৩০ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত এই পর্ব ধরা যায়। বৈদিক দেবতাগণকে অবলম্বন করে তাঁদের নূতন ব্যাখ্যা দিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির বাণীরূপ দেন নানাভাবে। তাছাড়া, গঙ্গা, হিমালয়, তুলসী ইত্যাদি কেন্দ্র ক'রে ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বাঙ্গীণ পরিচয় দেবার প্রয়াস করেন ছন্দে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যেরও নূতন ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এই সময়ের কবিতায়। কবি এই সময়ে পুনরায় বাংলার পল্লীজীবনের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। নাগরিক জীবনের কথাও কবির রচনায় উপেক্ষিত হয় নি, তারও প্রমাণ আছে এই সময়ের লেখায়। ফুল সম্বন্ধেও তিনি এই সময়ে অনেক কবিতা রচনা করেন। 'হৈমন্তী' 'বৈকালী' 'আহরণী' প্রভৃতি তাঁর প্রধান-প্রধান কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় এই পর্বে।

পর্ব ॥ ৭ ॥ এই পর্ব আরম্ভ হয়েছে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের তিরোধানের পর। এই সময়ে কবিতা রচনার পরিবর্তে গদ্যরচনার দিকেই অধিকতর মনোনিবেশ করেন কালিদাস। এই পর্বের অনেকটা সময়ই কেটেছে সমালোচনা-প্রবন্ধ-রচনায়। কিন্তু কবিতা রচনা ও একেবারে ছেড়ে দেন নি। কিন্তু এসব রচনায় ছন্দোবন্ধে তাঁর সেই নৈপুণ্য তেমন পাওয়া যায় না। এই কালের বহু সমস্যায় কবিচিত্ত

তখন চঞ্চল, কবিতায় একটা অস্থিরতাব ভাব দেখা যায়। এ সময়ে কালিদাসের অধিকাংশ রচনাই যেন কারুণ্যঘন। বৌদ্ধসাহিত্য ও বুদ্ধের জীবন অবলম্বন করে এ সময়ে অনেক কবিতা তিনি লিখেছেন।

এর পরবর্তী পর্বকে কী আখ্যা দেওয়া হবে সেটা চিন্তার কথা। সুতরাং অন্য কিছু বলার চেষ্টা না করে বলা যাক—শেষ পর্ব। এই পর্ব আরম্ভ হয়েছে ১৯৫০ থেকে। এ সময়ের রচনার উপজীব্য স্বপ্ন নয়, আশা নয়, উল্লাস নয়—এখন উপজীব্য দীর্ঘজীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ স্মৃতি; নৈরাশ্য ঔদাস্য, এ সময়ের চিন্তা কেবল পরপারের চিন্তা। এ সময়ে কিছু লিখতে গেলে নিজের জীবনের কথাই এসে পড়ে। তা অনেকটা আত্মকথার মত। যে দিন গত হয়েছে সে দিন আর ফিরবে না—এই আক্ষেপই স্পষ্ট হয়ে ওঠে রচনায়। এই সময়ে প্রকাশিত সংকলনগ্রন্থের নামকরণের মধ্যেও ধ্বনিত হয়েছে সেই করুণ সুর—'সন্ধ্যামণি'। এখনকার রচনায় দুটি মাত্র রস, তার নাম করুণ ও শান্তি।

জীবনের যে-কোনো কাজ ভালোভাবে করতে হলে তার জন্যে অনুশীলন চাই, চর্চা চাই। কালিদাস রায়ের জীবন তার প্রমাণ।

প্রত্যেক মানুষই এক-একটা প্রবণতা নিয়ে জন্মায়। কেউ গানে, কেউ চিত্রাঙ্কনে, কেউ খেলাধুলায়, কেউ বা সাহিত্যে। কিন্তু এই প্রবণতাটাই শেষ কথা নয়—চেষ্টা ও চর্চা দিয়ে তাকে সজীব ও সতেজ করে তুলতে হয়। এবং সফল করে তুলতেও হয়। সাফল্য জিনিষটা খুব সহজ পদার্থ নয়। জীবনে সফলতা যার কাম্য তাকে তার জন্যে মূল্য দিতে হয়—অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, অনেক মনন করতে হয় এবং অধ্যয়ন করতে হয়।

জীবনে নানাভাবে নানা অভিজ্ঞতা আহরণ করতে না পারলে বিতরণের দায়িত্ব গ্রহণ করা দুরূহ। মানুষ তো অতি সামান্য জীব, সে যদি বিশেষ কোনো শক্তির আধার হয়ে ওঠে তাহলে সে শক্তিও এমন কিছু অসামান্য নয়। সূর্যের মত যে প্রদীপ্ত প্রতিভা, সেই সূর্যও প্রতিটি মুহূর্তে নূতন সঞ্চয় করে চলেছে, তা না হলে তার দীপ্তি সে বিতরণ করতে করতে ফতুর হয়ে যেত বহু আগে। কিন্তু সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আজও পর্যন্ত সূর্য আমাদের আলোক-তাপ ইত্যাদি দিয়ে যেতে পারছে তার কারণ নিয়তই সে নিজেকে সজীবিত রাখবার জন্যে আহরণ করে চলেছে তেজ ও তাপ—

প্রত্যেক মুহূর্তে সূর্য আপনার রশ্মিপাতে
আপনার করিতেছে ক্ষয়
প্রত্যেক মুহূর্তে তার তারই সাথে নতুন সঞ্চয়।

সুতরাং কিছু সঞ্চয় করা দরকারই। এই সঞ্চয় আসে মননের মধ্য দিয়ে, অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে, প্রকৃতির সঙ্গে প্রসন্ন সম্পর্ক স্থাপন ক'রে।

কালিদাস রায়ের জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তিনি নিজেকে মানসিকভাবে সমৃদ্ধ করার জন্যে বাল্যকাল থেকে প্রয়াস করে চলেছেন তাঁর শেষ জীবন পর্যন্ত।

তিনি একজন বঙ্গজ কবি। এই দেশের মাটি তাঁকে সজীবিত করেছে। এ দেশের আচার আচরণ ভাবনা-বেদনা তাঁকে প্রভাবিত করেছে, এ দেশের সমাজ সংস্কার তাঁকে বেষ্টিত করে

রেখেছে। এই পরিবেশে তিনি বর্ধিত হয়েছেন, তাঁর মন নির্মিত হয়েছে এই পরিমণ্ডলে। তাই তিনি পরিপূর্ণ একজন বাঙালী কবি। তিনিও বুঝেছিলেন যে, এই বঙ্গের ভাণ্ডারে বিবিধ রতন আছে, ঝুটা মুক্তা কুড়োবার জন্যে তাই তাঁকে বিদেশী বন্দরে গিয়ে হাজির হতে হয়নি।

কালিদাস রায় একজন সহজ কবি। অতি সরল স্বাভাবিক শব্দ দিয়ে তিনি তৈরী করে তুলতেন অনবদ্য কাব্যসম্ভার। তাঁর সেই বিখ্যাত কবিতাটির সুর এখনো কানে বাজে—

নন্দপুর চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার,
চলে না চল মলয়ানিল বহিয়া ফুলগন্ধভার।।

ছন্দের প্রতি তিনি খুব সজাগ ছিলেন বলা ভুল হবে, তাঁর কানেই ছিল ছন্দ, সেইজন্যে অনায়াস ভঙ্গিতে তাঁর ছন্দ তাঁকে ধরা দিত। এবং মিলও এসে যেত অতি সহজেই—

হরিণী আজি লেহন করে চরণ সুধাস্যন্দ কার?
বৃন্দাবন অন্ধকার।

আজকাল এক ধরনের কবির কথা শোনা যায়—সমাজসচেতন কবি। কোন্ কবি সমাজ সম্বন্ধে সচেতন নন্? সমাজে বাস করে সে সম্বন্ধে উদাসীন থাকাই একটা দুরূহ কাজ। দুঃখীর দুঃখ বোধ করে না কোন্ কবি? কিন্তু এই বোধটাকে যারা বিজ্ঞাপন হিসাবে ব্যবহার করে তারাই একটা অমুক ধরণের কবি হয়ে যায়! কিন্তু কবি যে, সে কবিই। তার হৃদয় সহৃদয় হতেই হয়। সুখের প্রতি তার মমতা যতটা, দুঃখের প্রতি তার সহানুভূতি ততটাই থাকবে।

কালিদাস রায় অনেক ধরনের কবিতা লিখেছেন, তাঁর জীবনের বিভিন্ন পর্বে নবীন-নবীন ভাবনা দেখা দিয়েছে তাঁর মনে। সেই ভাবনার প্রতিধ্বনি বেজে উঠেছে তাঁর কবিতায়। তাঁর প্রথম আমলের বইএর (পর্ণপুট ১ম ভাগ) 'মজুরের গোহারি' কবিতা অনেকেই নিশ্চয় পড়েছেন, কেন না এই বইটার পাঁচটি সংস্করণ হয়ে গেছে; যাঁরা পড়ার সুযোগ পাননি তাঁদের জন্যে কয়েকটি ছত্র উদ্ধার করে দিই—

বিচার করো একটু সদয় হয়ে
ঘরের খবর ভাবলে এ বুক ফাটে—
পিঠে ছেলে পেটেও ছেলে ব'য়ে,
মেয়েগুলোও খাটছে মাঠে মাঠে।
পেটের জ্বালায় রোগের জ্বালাও ভুলি'
আট বছরের ছেলের হাতে তুলি'
দিইছি পাঁচন, কাঁখে ঝুড়ি গোবর কুড়ায় বুড়িমা মোর মাঠে,
তবু সবার পেট ভরে না, আধ পেটাতে অনেক রাতই কাটে।।

এইসব বলে মজুরের একটাই আবেদন—'মজুরীটার একটা রফা কর। আক্রা সবই, রইবে শুধু বুকের রক্ত সস্তা এমনতর?'

প্রশ্নটা বড় কঠিন। মানুষের প্রতি মমতা প্রকাশের অধিকার সকলের সমান। কিন্তু প্রত্যেক মানুষ তো সমান নয়। হৃদয়হীন মানুষও অবশ্যই আছে সংসারে। কিন্তু কবি যে তার হৃদয় না-থাকলে চলে না। অথচ আজকালই যেন বেশি করে হৃদয়ের বিজ্ঞাপন দেবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন এক ধরনের কবি। কিন্তু তাঁদের লেখা সেসব কবিতা প্রকৃতই কবিতা হয়ে উঠতে পেরেছে কিনা—এ প্রশ্ন অনেকে করেন।

আজ যে নবযুগের কাব্যতন্ত্রের অবিরাম রাজত্ব, কবিশেখর কালিদাস রায় সেই নবযুগের দ্বারটি প্রথম উন্মোচন করে দিয়েছিলেন। কৃষক, শ্রমিক, খেটে খাওয়া মানুষদের মর্যাদা দানের কথা যখন কেউ ভাবতেও পারেনি, সেই সুদূর অতীতে তাদের মাঙ্গলিকগীতি গেয়েছিলেন এই কবি—

হা-ঘরে ঐ ঘুরে বেড়ায় সঙ্গে ক'রে গৃহস্থালী,
জীবনজোড়া পুঁজি তাহার বাঁকঝুলানো দুটী ডালি,—
কোলের ছেলে, সাপের ঝাঁপি, ভাতের হাঁড়ি, মাটির থালা,
ডুগডুগি আর তেলের চোঙা, সবুজ কাচের কণ্ঠমালা।
আশমানই তার ঘরের চালা রবিশশীর আলোক জ্বলা,
মাঠ-মরু তার বাড়ীর উঠান, প্রমোদ-ভবন গাছের তলা।
ঝোপের ভিতর জন্ম তাহার পান করে জল ঘাট আ-ঘাটে,
সেইখানে তার রাতের ডেরা যেথায় রবি বসেন পাটে।
কোনো রাজার নয়কো প্রজা দীন দুনিয়ার মালিক বিনে
মুখ চেয়ে সে রয় না কা'রো থাকে না সে কারো ঋণে।
সকল বাঁধনহারা সে যে জানেনাক সমাজরীতি,
জীবনপথে লক্ষ্যহারা,—মানে নাক স্বাস্থ্যনীতি।
আজকেরই তার মাত্র পুঁজি ভাবে না তা'ও কাল কি খাবে।
অশ্বমেধের অশ্বসম বিশ্বে আপন বশ্য ভাবে।
যায় না কোনো সদাব্রতে যায়না ধনীর দেউড়ি ঘরে,
তরু তলের অতিথ গাঁয়ে, তাও শুধু এক তিথির তরে।

(হা-ঘরে)

কিন্তু সমগ্রভাবে তাঁর কবিতার কথা ভাবলে বোঝা যায় তিনি একজন প্রকৃত কবি। তাঁর কবিতার বিরুদ্ধে কথা বলার লোক অবশ্যই আছে, আমাদের জানা-শোনার মধ্যেই আছে। যাঁরা বিরুদ্ধে বলছিলেন তাঁদের একদিন অনুরোধ করি অন্ততঃ দুটি লাইন বলতে, তাঁরা বলতে পারলেন না। সুতরাং তাঁদের বলতে হল তাঁরা যেন অন্তত একটু প'ড়ে তাঁদের অভিমত জানান ; কেননা, না-প'ড়ে মন্তব্য করাটা একপ্রকার আত্মপ্রবঞ্চনা।

নিমজ্জিত বঙ্গোপসাগরে

অসিত গুপ্ত

কালিদাস রায়ের কাব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য "তোমার এই কাব্যগুলি পড়িলে বাংলার ছায়াশীতল নিভৃত আঙিনায় তুলসীমঞ্চ ও মাধবীকুঞ্জ মনে পড়ে।" তিনভাবে এই মন্তব্যের বিচার করা যেতে পারে। প্রথমত, এটি নেহাৎই প্রশংসাপত্র, যা বিতরণে রবীন্দ্রনাথ অকৃপণ। দ্বিতীয়ত, 'তুলসীমঞ্চ ও মাধবীকুঞ্জ' ইত্যাদি উপমান আসলে পাশ-কাটানো বাগ্‌বিন্যাস, হয়তো রবীন্দ্রনাথ কবিশেখরের কাব্যকে সেকেলে মনে করতেন। সূক্ষ্ম, সহনীয়ভাবে, ছায়াশীতল শব্দের দ্বারা তিনি হয়তো আসলে এগুলি খারিজ করতেই চেয়েছিলেন, অথবা হতে পারে তিনি যথার্থই কবিশেখরের কাব্যে বাংলার মুখ দেখেছিলেন; রূপসী বাংলা নয় 'স্নিগ্ধ ও শ্যামল' বাংলা। তার স্বতোবৃত্ত জাতিরূপ। আজ আর কোন সন্দেহই নেই, কবিশেখর সেই ছায়াশীতল আঙিনায় চিরকালই তুলসীমঞ্চ ও মাধবীকুঞ্জের পাশে সমাসীন হয়ে থাকবেন।

প্রত্যেক কালেরই অহংকার থাকে; কাব্যশৈলী কালে কালে বদলায়। তার আধুনিকতার অভ্যাসিকতাও সেই অহংকারেরই রকমফের। যা বিশ বছর আগে ছিল না এবং হয়তো বিশ বছর পরে থাকবে না, আধুনিকতা প্রধানত তারই মধ্যবর্তী বিরামস্থান। তবু প্রত্যেক আধুনিকতার নিজস্ব কিছু স্ফুটরূপ আছে, মানুষের প্রয়োজনকে সিদ্ধ করা এবং সেইসঙ্গে একরকমের উদ্‌গতি দেওয়া সব আবিষ্কার ও সৃষ্টি প্রকরণেরই ধর্ম। তাই, বিজ্ঞানের বাষ্পীয় এঞ্জিনের অবশ্যম্ভাবী ফলিতরূপ ইনটারনেল কমবাসন এঞ্জিন, ওয়ারলেস টেলিগ্রাফীর পরে ইলেকট্রোভ বা তড়িদ্দ্বার। এই আবিষ্কারের একই সঙ্গে কালের গভীর ধর্ম রক্ষা হচ্ছে। তার প্রয়োজনকে সিদ্ধ করে উদ্‌গতি দিচ্ছে। কাব্য বা শিল্প যদিও বিবর্তনপন্থী নয়, তবু তাকেও কালের কিছু বিশিষ্টধর্ম আয়ত্ত করতে হয় এমন কতকগুলি সুচিন্তিত চিহ্ন ও ইঙ্গিত, যার সাহায্যে তাকে চেনা যায়, চেনানো যায়। সংস্কৃতে অলংকার বাগ্বিধির সাহায্যে কিংবা ছন্দোবদ্ধ ধ্বনিময় উৎপ্রেক্ষায় কবি তাঁর মৌল সংরাগ প্রকাশ করতেন, রবীন্দ্রনাথে তা-ই হয়তো এসে দাঁড়াল উক্তি ও উপমার গীতিকাব্যের মূর্ছনায়। এবং আরও পরে, যাকে আমরা আধুনিক কাব্য বলি তার উদ্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা হয়ে ওঠে শব্দ ও চিত্র। কেবল ভাব ও আবেগকে ব্যক্ত করে অথবা জানিয়েই কবি আর নিস্তার পান না, তাকে উপস্থিত করতে হয় বিদ্যমানতা দিতে হয়। কাব্য বা শিল্প যেহেতু ইঞ্জিন বা ট্রানজিস্টর নয়, যেহেতু তার প্রয়োজনিক সিদ্ধি বা উদ্‌গতি স্পর্শগোচর, দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়—অনুভাবেদ্য ইন্দ্রিয়গোচর।

কিন্তু মানুষের স্বভাবের মতো কাব্যের একটি বিশিষ্ট সত্তা আছে, যা যন্ত্রে নেই, বিজ্ঞানে নেই, আছে শুধু আদি প্রকৃতিতে—এটিকে কাব্যের প্রকৃতিসত্তা বলাই শ্রেয়ঃ। প্রকৃতি যেমন যাবতীয় বস্তুপুঞ্জের সারভূত সত্তা, তেমনি কাব্য—মানুষ, ইতিহাস, লোক-লৌকিকতা, হারানো প্রতীক প্রত্ন-প্রতিমার সারভূত সত্তা। হয়তো বা লেনিনী কায়দায় কাব্য দু' পা এগিয়ে, এক-পা পিছিয়ে চলে।

এই দিক থেকে কালিদাস রায়ের কাব্যগ্রন্থগুলির আধুনিক বিচার হওয়া উচিত অর্থাৎ তাঁর কবিতা কতখানি অগ্রবর্তী ঘাঁটি দখল করেছে শুধু এই আলোচনায় তাঁকে পেতে গেলে তাঁকে অবহেলাই করা হবে; তাঁর 'আহরণ,' 'আহরণী' বা 'পর্ণপুট' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি কতখানি পশ্চাদ্ভূমি রচনা করেছে, সেই বিচারও বাঞ্ছনীয়। গভীর জীবন নিছক কলাকৌশল নয়, নিদর্শের মধ্যে তার আদর্শরূপও আছে, যেদিন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আমরা হামেশাই প্রয়োগ করে থাকি, আজ আছে, কাল নেই; তবু জীবনের আজও আছে, কালও আছে, ইতিহাস তার সঙ্গেই চংক্রমিত হয়ে ফেরে। কাব্য বা শিল্পের উদ্দিষ্ট লক্ষ্যও তাই শুধু অন্ত নয়, অন্ত ও প্রবাহ। ভারতচন্দ্র নেই, ভারতচন্দ্রের 'মালিনী' নেই। তবু দূরে ও নিকটে, প্রবাহের পটে তার সুদূর স্মৃতি ও ভবিষ্যৎ সত্তা এক সারভূত রূপ পেয়েছে। কবিশেখর প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি 'তুলসীমঞ্চ' ও মাধবীকুঞ্জ' হয়তো সেই দূর ও নিকটের সমন্বয়বদ্ধ ব্যঞ্জনা।

কালিদাস রায় এবং অন্যান্যরা কাব্য রচনা করেছেন সৌরজগতের কলায়, অতএব প্রায় সকলেই পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছেন। যে যতীন্দ্রমোহন বাগচীকে সেদিন মনে হয়েছিল প্রখর সূর্যতাপ সইতে পারবেন, তিনিও সময়ের দ্বারা দগ্ধ। রবীন্দ্রশিষ্যদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত; তাঁর প্রতি রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত উৎসাহ ছিল, কিন্তু তাঁর কবিসত্তাও কালস্রোতে প্রায় নির্মজ্জিত। ছড়া ও ছন্দের কৌতূহলী গবেষকের কাছে তিনি শুধু এখন দৃষ্টান্তস্বরূপ আলোচ্যবস্তু। এই নিয়তি অনিবার্য, প্রথমত পরিবেশ পরিবর্তনশীল এবং জনরুচি সম্প্রসারণবাদী তবু কাব্য বা শিল্প কাগজের নৌকা নয়, কালস্রোতে ভেসে যাওয়া শুধু নর্দমাতেই যায়, পুরনো হলেই তা পরিত্যাজ্য হয় না। তার কতকগুলি নিয়তগুণ থাকে, এগুলি তার মৌল কণা। অনেক সময় সকালের অর্থ সন্ধ্যায় ধরা পড়ে, স্তব্ধ নীল যবনিকার তলায় এ জীবনের বহু হারানো কণিকাকে খুঁজে নিতে হয়। এ-ও এক রকমের আবিষ্কার। কাব্যে, সাহিত্যে সেই আবিষ্কারকের ভূমিকা নেন সমালোচক, শুধু সমকালীনতা নয়, কালাকালের ঊর্ধ্বে এক ব্যাপ্ত চরাচর তাঁর অন্বিষ্ট। সেক্ষেত্রে সমালোচক হয়ে ওঠে বিজ্ঞানী।

কিন্তু আমাদের মৌল মুস্কিল আছে, নির্বিকল্প সময়ানুবর্তী হতে আমরা বাধ্য। কারণ আমাদের শিক্ষা ও সমাজব্যবস্থা আমাদের কেবল সময়ের সেবা করতেই শিখিয়েছে। দোষ জনরুচির নয় বা সেই কবিরও নয় যিনি সময়ের সঙ্গে কাব্যরূপ নির্মাণে অকৃতার্থ। কালিদাস রায়ের সমগ্র কাব্যপ্রচেষ্টায় তথাকথিত ভঙ্গী বা রীতি নেই, তবে ঝোঁক সংবাদপ্রবণতার দিকে; শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও তিনি সর্বদা আধুনিকভাবে সচেতন নন। রবীন্দ্রনাথ যে একান্ত অনুপ্রাণিত দৃষ্টিবলে কাব্যে এক তদ্‌গত তথ্যাত্র সৃষ্টি করেন, নিত্য নৈমিত্তিকতাকে এড়িয়ে কাব্যের অপরাগতি খোঁজে কালিদাস রায়ের কাব্য সেই নিত্য নৈমিত্তিকতা দ্বারাই প্রবলভাবে আচ্ছন্ন, তিনি ঘাঁটি আঁকড়ে থাকতে চান এবং অনেকাংশে ঈশ্বর গুপ্তের মতো খবরদারের জরুরী ভূমিকা পালনেই তাঁর আগ্রহ অধিক। তাই তিনি একই নিশ্বাসে (হয়ত বা একই বিশ্বাসে) 'সিরাজ' ও 'মিহির সেন,' নেহেরু ও মশা' সম্বন্ধে কাব্য রচনায় উদ্বুদ্ধ হন। অবশ্য এ রেওয়াজও রবীন্দ্রনাথেরই দান, তিনিও 'শিবাজী' ও 'অরবিন্দ' সম্পর্কে কবিতা লিখেছেন আর 'মশা'র পরম্পরা চলে আসছে ঈশ্বর গুপ্তের উই আর ইঁদুরের আমল থেকে।

কালিদাস রায় অনিবার্যভাবেই সেই বাঙ্গালী পরম্পরা কবি। তাঁকে ভুল বোঝা স্বাভাবিক, কিন্তু তাঁর কাব্যের মন্দদশাও আকস্মিক নয়। কারণ জীবনে ও রুচির ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ বাঙ্গালীয়ানা নয়, বিমিশ্র আন্তর্জাতিকতাই এখন আমাদের লক্ষ্য। ফলতঃ, রবীন্দ্রনাথের তুলনাও বাইরে খুঁজতে হয় এবং না দান্তে, না এলিঅট পুরোপুরি কোথাও তাঁকে ভরসা করে স্থাপনা করা যায় না, এমন কি শেলী ওয়ার্ডসওয়ার্থের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লেও তাঁকে বিশদ ঠেকে, আমাদের বিশ্বগ্রাসী কাব্যরুচি তাঁর এই 'প্রহেলিকায়' প্রতিভা নিয়ে মাতামাতি করে। সুতরাং পূর্বভাগের এই মহৎ কবি যথার্থ পশ্চিমে যেতে না পারার জন্যই অসময়ে অস্ত যান, ভাগ্যিস ঠিক সময়ে বিশ্বের নানাবিভাগে জবাবদিহি করতে পেরেছিলেন, তাই তাঁর রবীন্দ্র-পরিচয় আজও টিঁকে রয়েছে।

অতএব কালিদাস রায় প্রমুখ কবিদের লোকচক্ষুর অন্তরালে যাওয়া বেদনাদায়ক হলেও সময়ানুযায়ী হয়েছে। আমরা মানুষ চিনতে ভুল করি, ইতিহাস বিস্মৃত হই এবং আমাদের ধারণাজাত একটি নিখুঁত নকশাকে প্রাণপণে আঁকড়ে থাকি আমাদের যাবতীয় কাব্য ও শিল্পরুচি সেই নকসায়, সেই আদলের মধ্যে ফেলে নিশ্চিত হই। কালিদাস রায়ের কাব্যকর্ম আজও পঠিত ও আলোচিত হলে আমাদের সেই নির্দিষ্ট নকশায় রকমফের গোলমাল হয়ে যেত এবং আমরাও হকচকিয়ে যেতাম। 'বাংলাদেশের প্রতি ভালবাসার উচ্ছলিত ধারা। তোমার কাব্যকানন সরস হইয়া কোথাও মেদুর কোথাও প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে,' এ-কথাও রবীন্দ্রনাথ কবিশেখর সম্পর্কে বলেছিলেন। এর অর্থ তাঁর কাব্যের ভাল মন্দ, সম্পূর্ণতা, অসম্পূর্ণতা শুধু বাংলাদেশের নিরিখেই বিচার্য, কিন্তু মূল প্রশ্ন এই যে, বাংলাদেশ আজ কোন্ নিরিখে বিচার্য? পরিবর্তনশীলতাই সমাজের ধর্ম, আর্থনীতিক উন্নয়ন অগ্রগতির লক্ষণ কিন্তু যেমন একটি মানুষের নিজস্ব পরিচয় তার চেহারায় ও সর্বরূপ ব্যক্তিত্বে, তেমনি একটি দেশেরও সর্বাঙ্গীন পরিচয় তার লোকাচারে ব্রতয়, পালায়, কীর্তনে এমন কি বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত ঘরানায় এবং বর্ধমানের সীতাভোগ মিহিদানায়। এগুলি একই সঙ্গে পরিচয় ও পরম্পরা। কিন্তু বর্তমানে এইসব উপকরণে 'কাব্যকানন' কেন, কোন কাননকেই 'সরস' বা 'মেদুর' ও 'প্রফুল্ল' রাখলে চলে না, তার মেদুরতা ও প্রফুল্লতা সম্পূর্ণ আলাদা এক যোড়ো যুগের 'পালিশ করা জীর্ণতা'য় গভীরভাবে নির্ভরশীল। আশ্চর্য এই সময়ের নতুন নিরিখে রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতার অর্থও কি পরিমাণ দুর্বোধ্য ঠেকে, কি অনতিক্রম্য দূরত্ব রচনা করে! উদাহরণ স্বরূপ 'জন্মদিন'-এর ১৭নং কবিতাটার কথাই ধরুন, তার ভাব ও ভাষা আমাদের কাছে ধাঁধার মতো অর্থহীন ঠেকা অসম্ভব নয় এবং মজা হচ্ছে এই যে, ১৬নং কবিতার ছটি লাইনে তিনি স্বয়ং এই ধাঁধার জবাব দিয়েছেন....পুরাণো সব পুনরুক্তি যত। অর্থহারা হয় সে বোবার মতো।

সুতরাং, কালিদাস রায় একে পূর্ণাঙ্গ বাঙালী পরম্পরার কবি, যে পরম্পরা শিবায়নের রামকৃষ্ণ কবিরত্ন বা ভারতচন্দ্র থেকে ঈশ্বর গুপ্ত পর্যন্ত বিশুদ্ধ বাঙালী চেতনায় চিহ্নিত; পরে হেমচন্দ্র, বিহারীলাল, রঙ্গলাল বা দেবেন্দ্রনাথ সেন, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কুমুদরঞ্জন ও কালিদাস রায় প্রমুখ কবিদের মধ্যে যা কালক্রমে সঞ্চারিত। রবীন্দ্রনাথের দুর্জয় প্রভাব সত্ত্বেও সেই চেতনা সংক্রান্ত থাকতে পেরেছে; পেরেছে তার হেতু সমস্ত পরিশীলিত মন্ময়তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সেই ঐতিহ্যে মূলত প্রতিপালিত। তাই,

দিগন্তে মেখলা তব টুটে আচম্বিতে
অয়ি অসম্বৃতে—

ইত্যাদি পংক্তিতে তাঁর সকল বৌদ্ধিকতা সত্ত্বেও ভাবে, শব্দচয়নে, গঠনে এবং 'অয়ি' ইত্যাদি বিশিষ্ট সম্বোধনের ভঙ্গীতে বাংলা বা সংস্কৃত কব শৈলীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কালিদাস রায় কিংবা তাঁর পূর্বাপর কোন কবিই রবীন্দ্রনাথ নন, কিন্তু ভুল ভ্রান্তি, অসম্পূর্ণতা সহ সেই এককেন্দ্রিক চিবাচরিত বাঙালীয়ানা তাঁর যাবতীয় কাব্যকর্মের মূলাধার। উপরন্তু তাঁর কাব্যোক্তি ও বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণভাবেই সাবেক কালের সাঁকো ধরে আনাগোনা করে।

হাঁটু ঢাকি বস্ত্র দিও পেট ভরি ভাত
নব জামাতার কাছে জুড়ি দুই হাত
জননী একথা বলি সঁপিত কন্যায়।
প্রসাদী কুসুমসম অশ্রুর বন্যায়।

(বাংলার পরা পিতামহী)

বাংলাদেশের নিগত কালের ছবি। প্রবহমান জীবনের প্রাক্তন কাব্যধারার অনুবর্তন। 'শিবায়ন' এবং ভারতচন্দ্রের কাব্যকলা থেকে উৎক্ষিপ্ত নিবিড় ছায়া। পরন্তু, একই সঙ্গে বাঙালীর চিরন্তন হিমালয় মেনকা-দুর্গার প্রত্নপ্রতিমার আভাসটিও প্রতিফলিত। একই কাব্যকাহিনীতে ইতিহাসও পুরাবৃত্ত সংক্রমিত হয়ে ফিরছে। অবশ্যই এই বস্তুমাত্রিক ও ইতিহাসভিত্তিক কাব্যপ্রচেষ্টা দায়িত্ববান কবিরই লক্ষণ। কিন্তু মূল সমস্যা হচ্ছে এই যে, আমাদের ইতিহাস বর্তমানে আমেরিকার কমিকসরূপে অপ্রচলিত এবং বহু-ব্যবহারে পঠিত সেই সংস্কৃতি সময়মতো জরুরী জিন্ ও টনিক হয়ে উঠতে পেরেছে। অতএব 'বাংলার পরা পিতামহীর' প্রতি কালিদাস রায়ের আকুতি স্বভাবতই অর্থহারা, কালের বিচারে এক অতি-মৃত ভাবানুবাদ। অথচ কবি শেখর যে আন্তস্ত বাংলার ইতিহাস ও বঙ্গ-সংস্কৃতিতে উথোহিত, তার পরিচয় পরের কবিতাটিতেও আমরা পাই :

সপ্তডিঙ্গার বঙ্গদেশ,
আজো কানে বাজে কোলাহল মাঝে তব 'মঙ্গলগীতি'র রেশ।
প্রতি পল্লীরে দেব দেবী যত
কবিল তীর্থে যবে পরিণত
কত শত কবি গাহিল চণ্ডী-ধর্ম-মনসা-মহিমা গান
এখনো সে গান মাতায় প্রাণ।

(সপ্তডিঙ্গার বঙ্গদেশ)

অথবা

সপ্তডিঙ্গার বঙ্গদেশ
স্মরি সে উজানি, গৌড়, নদীয়া হোসেন, নসিরা, রাজা গণেশ
কঙ্কণতান ছিল ঘাটে ঘাটে

কনকধান্য ছিল মাঠে মাঠে
দেহে দেহে ছিল স্বাস্থ্য কান্তি গেহে গেহে ছিল মহোৎসব
নির্ব্বৃতি দূরিত শঙ্খরব।

সরল কাব্যবোধ অবশ্যই ; হয়তো বা অতীত ইতিহাসের মুগ্ধবোধ বিবরণও প্রকাশ পাচ্ছে তবু ছন্নছাড়া নয়—এক উচ্চ-বিশ্বাসপ্রসূত নিগূঢ় পুরুষার্থ কবিতাটির ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট। কবির মানসিক গঠন-প্রকৃতির সঙ্গে যাঁর কাব্যকাঠামোর নিবিড় সংযোগ থাকা স্বাভাবিক যদিও আধুনিক প্রচলন রীতি অনুসারে তা আবশ্যিক নয়। এক্ষেত্রে কবির মানসতা এবং তাঁর তৈরি কাব্যকাঠামো এক ও অভিন্ন প্রতিমা রচনা করেছে—তিনি স্মৃতি দিয়ে, আকুলতা ও উদবেগ দিয়ে বাংলার হারানো ইতিহাসে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে চান, বিভিন্ন মিলিয়্যু-এর সাহায্যে শুধু কবিতাকেই নয়, কবিতার পাঠককেও গৃহাভিমুখী করে তুলতে চান। এটা যে কোন নিষ্ঠাবান কবি শিল্পীর আপন মানসিকতার পরিচয়ই শুধু নয়, সমগ্রভাবে দেশ ও মানুষের মৌলিক পরিচয়ও বটে। শিকড় ছাড়া কাব্য অথবা শিল্প সেই পালিশ করা জীর্ণতাকেই ঘনিয়ে তোলে।

হাত পেতে আছে ছেলেরা, ভাজিছে মা তাদের তালবড়া
বালিকারা মিলি আড়াআড়ি করি গাহিছে তোমার ছড়া।
ঘরের সাঙায় কপোত ঘুমায়, বসে না চালের 'পরে
নীড়ের বাহিরে কেউ নাই আজ, ভাদুরাণী এস ঘরে।

(ভাদুরাণী এস ঘরে)

সামগ্রিক আত্মবিচ্ছেদ যখন আমাদের দৈনন্দিনতাকে সম্পূর্ণ উৎকেন্দ্রিক করে তোলে নি, এ সেই তখনকার সুস্থিত বাঙালী সংসারের কালচক্র ; আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে চিরাচরিত লৌকিকতার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণে সবিশেষ আগ্রহী ; লোকযাত্রার মাঝেই কবিতার তাৎপর্য আবিষ্কারের প্রয়াস এবং মনে রাখতে হবে লৌকিকতাই মূলতঃ কাব্য। তাছাড়া ভাদুরাণী ও তালের বড়ার মধ্য দিয়ে সেই পরম্পরা সমানে চলেছে—মঙ্গলকাব্যের সকল দেবতাই লোককান্ত দেবতা বহুলাংশে অনেকান্ত মুশ্‌কিল আসান মাত্র এবং কৃত্তিবাসে যে খাদ্য তালিকা আছে তা আদৌ রামায়ণী নয়—বাঙালীর একদা প্রিয় কলার বড়া, তালের বড়া তার অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু এ-সবই বহুজানিতও তথ্য এবং বিচার-বিবেচনার সাহায্যে কালিদাস রায় পর্যন্ত বাংলা কাব্যের একটি সুস্পষ্ট মেরুরেখা আবিষ্কার করা যায়। প্রাচীন বঙ্গ, পল্লীগ্রাম, বৈষ্ণব পদাবলীর অভিভাব, গার্হস্থ্য জীবন, আখ্যানমূলক, যুক্তিমূলক, লোকাশ্রিত, ইতিহাসাশ্রিত বিষয়সত্তা কবিশেখরের সমগ্র কাব্যালোকের ক্রমোন্নতির প্রকাশ। স্বদেশ, স্বদেশের ইতিহাস ও মানুষ এবং তাঁর কাব্যপ্রয়াস স্বতন্ত্র নয়—একই সত্তায় সমাহিত। কবিতার মাধ্যমে বাংলা ও বাঙালীর যিনি তিনি গোচর-বিচার করতে চান, নিজের উদবেগ ব্যক্ত করতে এবং কবির স্বভাবধর্ম অনুযায়ী অনুপ্রেরণা যুগিয়ে চলতে চান কিন্তু ইতোমধ্যে কাব্যরুচি বদলেছে, যেহেতু বাঙালী জীবনে এক বিশাল পট-পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে। পশ্চিমী নৈরাজ্যের নৈশভোজে আজ বাঙালী মানসিকতাও লালায়িত, ফলে রবীন্দ্রনাথ বর্ণিত

'নিভৃত আঙিনায় তুলসীমঞ্চ ও মাধবীকুঞ্জ' কিংবা 'সপ্ত ডিঙার বঙ্গদেশ' ও 'বাংলার পরাপিতামহী'র প্রতি আবেগ বাঙালীর হালফিল মানসিকতার পরিপন্থী, হয়তো বা এইসব উপকরণ আমাদের মনে এক দুর্বোধ্য প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। অর্থবান ও অনুমোদনগ্রাহ্য এই সমাজের মূল মন্ত্রই হচ্ছে ক্যাশ-নেক্সাস ও পারমিলিত-প্রেকসাস; পট স্মোক, মুক্তপ্রেম, বর্ণমুক্ত লোকাচার বর্তমানে আত্মিক স্বাধীনতা ও মুক্তি এবং একরকমের নব্য সহজিয়া বিদ্রোহের প্রতীক ও পরিপূরক হয়ে উঠেছে। বলা বাহুল্য বিদ্রোহও আজকাল মার্কিন মুলুকেই প্রস্তুত হয়। দুঃখের বিষয় এই যে, বিদ্রোহ বা বিপ্লব নেশা বা নৈশভোজ কোনটাই নয়। ফলে আধুনিক বঙ্গসংস্কৃতি গ্রামীণ ও লোকায়ত বিষয় ও বস্তু থেকে পরিত্রাণ খুঁজছে, এগুলি তার সর্ববিধ মুক্ত ধারণার পক্ষে বাধাস্বরূপ। পরিবর্তে যে-অবাধ শহর সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তাতে মানুষ কিংবা কবিতা সবই বিক্রয়পণ্য, কেনা-বেচা চালাতে গেলে সেখানে স্বভাবতই একটি স্বার্থসংশ্লিষ্ট পাপচক্র গড়ে উঠবে। দিকে দিকে মূলহীন তরু জাগিয়ে তোলাই তার সবিশেষ লক্ষ্য ও চেষ্টা। তাই মেলায় ও উৎসবে বাউল গান বা টুসু গানের ঘটা করে হাট বসানো হয়, কিন্তু কবিতায় কিংবা কাহিনীতে শব্দে ও চিত্রে, অস্তিত্বের প্রবাহপটে সেই দূর ও নিকটের প্রতিপাদ্য খুঁজলে ভণ্ডামী ও মূর্খতার দুর্নাম মেলে।

অবশ্যই কবিতাকে উপাদানের ঊর্ধ্বে উঠতে হবে, এটা অতি-পরিজ্ঞাত প্রাথমিক শর্ত। শুধু স্বভাবে আশ্লিষ্ট থাকা কোন শিল্পেরই ধর্ম নয়। কারণ, মানুষই মাটিতে পা রেখে আকাশের ছবিতে অতিক্রান্ত হবার স্বপ্ন দেখে এবং এরই মধ্যে পৃথিবীর চিরকালীন রহস্য ক্ষণে ক্ষণে ভেসে ওঠে। কিন্তু উপাদানের ঊর্ধ্বে অতিক্রান্ত হওয়ার প্রতিজ্ঞাটিও যথাবিহিত সময়সীমা দ্বারা আবদ্ধ, বহুক্ষেত্রে সমকালীন অহংকার। কাব্য, শিল্প প্রধানত পরিবেদিতা ও সংবেদনশীলতার অনুসারী ব'লে কাল ফুরলে তাকে পাকাপোক্তভাবে খারিজ করা যায় না। কাব্যে ও শিল্পে নটে গাছটি মুড়োবার পরই যথার্থ জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধান শুরু হয়। তাই আধুনিকতার পুরোধা হয়েও এলিঅটকে মিলটন, দান্তে বা মেটাফিজিক্যাল কবিদের সম্বন্ধে সুফলবর্ষী উৎসাহ জাগরূক রাখতে হয়, অতীত কাব্যাদর্শে তিনি বারংবার বর্তমান কাব্যরূপকে ঝালিয়ে নিতে চেয়েছেন। কারণ কাব্য বা শিল্প কেবলমাত্র কালের কেতাদুরস্ত ফ্যাশন নয়, সেইজন্যই তাঁকে ঐতিহ্য কী, পরম্পরা কী এ-বিষয়ে লিখতে হয়েছে ঐতিহ্য ঘট নয়, পটও নয়, তা চেতনার অনুষঙ্গ। চেতনার রূপান্তর আছে কিন্তু তার পরিপূর্ণ বিলয় নেই। তাই, চেতনা ও অবচেতনার গভীর পাতাল থেকে যদু-এর স্মৃতি সত্তা, স্বপ্ন, পুরাকল্প হয়তো একদিন অকস্মাৎ হৃদ্‌কমল হয়ে ফুটে ওঠে।

কবে কোন কস্মিনকালে রাজকন্যা ভাদু বাঢে কিংবা মানভূমে এক ভরা ভাদ্রে হারিয়ে গিয়েছিল, সূচনায় এই ঘটনা হয়তো শুধুই কাহিনী ছিল কিংবা সংস্কারমাত্র, পরে ধীরে ধীরে তা লোকপ্রতীক হয়ে উঠেছে। বাংলার হারানো গৌরব, শ্রী ও সমৃদ্ধির আধুনিক প্রতিমা হয়ে উঠতেও তার বাধা নেই। কালিদাস রায়ের সমগ্র কাব্য প্রকরণে হয়তো আধুনিক কলাকৌশল অনেকাংশে অনুপস্থিত, কিন্তু আছে 'কবিহৃদয়ের স্বাভাবিক সুগভীর আনন্দ' এবং সেই সঙ্গে ভূরি পরিমাণ ঐতিহাসিক দায়িত্ববোধ। তিনি তাঁর কাব্যকাঠামোয় বাংলার সর্বপ্রকার হারানো প্রতিমাকেই বারংবার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। আগেই বলেছি চিত্রময়তা নয় বর্ণনাবর্ণিতাই কবিশেখরের

কাব্যের মূলাধার। তাঁর শব্দ আহরণে চিত্র নেই কিন্তু বিষয়মুখী প্রয়োজনীয়তা আছে। আধুনিক বাংলা ভাষা যেমন একদিকে প্রচুর ইংরেজীভাষা শব্দ গড়ে নিয়েছে, শব্দ ও বাক্যাবলীতে পরিশীলিত ছিমছাম ছন্দোময়তা দিয়েছে, অন্যদিকে তেমনি প্রচলিত বহু প্রয়োজনীয় লোকশব্দকে হত্যা করেছে। ফলে বাংলায় এখন খুবই স্বল্প সংখ্যক শব্দের ব্যবহার হয়। যেমন, ভাদুরাণীর কবিতায় কবিশেখর 'সাঙা' কথাটি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু অধুনা এই শব্দের প্রচলন নেই। এমনকি তার আধুনিক প্রতিশব্দও নেই, অথচ বাংলায় আজও মেটে ঘর এবং সেই ঘরে 'সাঙা'র প্রয়োজনীতা থাকার কথা।

রবীন্দ্রনাথ কীট্‌স-এর কবিতায় আত্মীয়তা অনুভব করতেন, কারণ তাঁর কলানৈপুণ্যের সঙ্গে হৃদয়ের সেই নাড়ির যোগ ছিল। আধুনিককালে বিচারে রবীন্দ্রনাথই হয়তো আজ পরিত্যাজ্য। সুতরাং কাব্য-বিষয়ে তাঁর মতামত তেমন সোৎসাহ গ্রহণযোগ্য না-ও হতে পারে। তবু কীট্‌স প্রসঙ্গে তিনি যে টান অনুভব করতেন, কলানৈপুণ্যের সঙ্গে হৃদয়ের সেই নাড়ির যোগ কালিদাস রায়ের যাবতীয় কাব্যকর্মেরও অন্যতম প্রধান লক্ষণ। এরই মধ্য দিয়ে কবির বিশুদ্ধ আস্তিকতা বিষয়াসক্তি এবং ঠিক আধুনিক চিত্রকলা নয়, একপ্রকার চিত্রানুষঙ্গ রচিত হয়ে চলে।

হেমন্তের দিনশেষ
গুণিতেছি শুয়ে শুয়ে ঘরে
টহল-বৈরাগী গেল গান গেয়ে
তন্দ্রাতুর স্বরে।
দূরে মসজিদ হতে উঠিতেছে
মোল্লার আজান,
বটশাখা ধরিয়াছে ঐক্যতানে
জাগরণী গান।

(হেমন্ত-প্রভাত/আহরণ)

এই পংক্তি কটিতে একই সঙ্গে হেমন্ত প্রভাতের বিবরণ এবং তৎসংক্রান্ত আবশ্যিক স্থিরচিত্রের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। 'হেমন্তের নিশাশেষ' আরম্ভের এই বিবৃতিপ্রধান উক্তি হয়তো আধুনিক কোন কবির হাতে ছায়া ও ছবিরূপেই প্রকাশ পেত। অর্থাৎ ভাবে ও ব্যঞ্জনায় বিশিষ্ট কিছু চিহ্ন ও নকশা এঁকে তিনি হয়তো হেমন্ত নিশাশেষের আরতি ও লক্ষণকে সুপরিস্ফুট করে তুলতেন।

কিন্তু কালিদাস রায় সচেতন কবি, তাঁর কবিসত্তা ও অন্তঃসত্তায় প্রায়শঃ প্রভেদ ছিল না এবং তাঁর বস্তুনিষ্ঠ ঐতিহাসিকতা যেহেতু তাঁকে অসার মোহ ও মায়ায় অন্ধ আচ্ছন্নতা দেয়নি সেহেতু তিনি কালের সংকেত এবং নিজের সীমা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। যেমন, রবীন্দ্রনাথ জানতেন মহাকাব্য সংরচনে নেমেও তিনি অকৃতার্থ হয়েছেন। 'ছাত্রধারা', 'বিদ্যালয় পথের' কবিও জানতেন স্নেহব্যাকুল, আনন্দ-বেদনা সম্ভোগের মধ্য দিয়ে কবিতায় শুধু সংশ্লেষ সংবেদ সৃষ্টি করার দিন ফুরিয়েছে।

ওরে মূঢ় বসন্তের পাখি
আজি এ বর্ষার রাতে কেন তুই ডাকিস একাকী ?

* *

কাফিসিন্ধু জাগিবে কি ইন্দুহারা মেঘ-সিন্ধু তীরে ?
কে শুনিবে গোপী-যন্ত্র ঢাক বাজা রথযাত্রা ভীড়ে ?
মিছে ফিরাইতে চাস এ দুর্দিনে মাধবী মাধুরী
তারস্বরে ডুবাবে তা পঙ্কবাসী হাজার দাদুরী ।।

(অকালের পাখি/আহরণ)

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'বাংলাদেশের প্রতি গভীর ভালবাসায় তোমার মনটি কানায় কানায় ভরা' —কালিদাস রায় নিজেও জানতেন তাঁর প্রথম ও শেষ পরিচয় এই বাংলাদেশের ঘাটে, মাঠে, গানে, গল্পে, ইতিহাসে, পুরাকল্পে নিয়ত নিহিত রয়েছে। বাংলাদেশ থাকলে তিনি থাকবেন, নিজ বাসভূমে বাংলা পরবাসী হলে তিনিও চিরকালের মতো প্রবাসী হয়ে যাবেন।

· পশ্চিমের ঝঙ্কার মাঝারে
যাহারা বাঙালী মর্ম রাখিয়াছে অঞ্চলের আড়ে
তুলসীর দীপসম, তাহাদেরি তরে গাই গান ,
বিস্মিত আমার গানে তাহাদেরি অমার্জিত প্রাণ ।।

গৌরবের কথা নয় এ যুগে তা জানি তাহা জানি,
তবু তারা শোনে যদি তাহাতেই চরিতার্থ মানি,
শুনি তারা রহিবে না, কোনদিন তারা যদি মরে,
ডুবুক আমার গান, দুঃখ নাই বঙ্গোপসাগরে ।।

(শেষকথা/আহরণ)

কালিদাস রায়ঃ ব্যক্তি ও কবি

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালেই বালক কালিদাসের মধ্যে সাহিত্য-প্রতিভার স্ফুরণ লক্ষিত হয়। ইংরাজী, সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্য উত্তমরূপে অধ্যয়নের ফলে সহজাত এই সাহিত্যপ্রতিভা অচিরেই লক্ষণীয় বিকাশ লাভ করে। বাল্যেই তিনি সহপাঠী সুহৃৎ ও শিক্ষকসমাজে সুলেখক ও কবিরূপে পরিচিতি লাভ করেন, নানা পত্র-পত্রিকায় তাঁহার রচনাদিও প্রকাশিত হইতে থাকে। স্কুলের গণ্ডী উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই তাঁহার রচিত 'কুন্দ' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় (১৯০৬), অতঃপর তাঁহার কিশলয় (১৯১১), বল্লরী (১৯১৯), পর্ণপুট (প্রথম) (১৯১৪), পর্ণপুট (দ্বিতীয়) (১৯২১), ব্রজবেণু (১৯১৫), ঋতুমঙ্গল (১৯১৬) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থগুলি প্রকাশিত হইলে কালিদাস রবীন্দ্রোত্তর কালের একজন বিশিষ্ট কবিরূপে চিহ্নিত হন। কবিহিসাবে এই সময়ে কালিদাস কবিগুরু রবীন্দ্রনাথেরও মনোযোগ আকর্ষণ করেন ও তাঁহার স্নেহভাজন হন। কবিপ্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯২০ খ্রীঃ কালিদাস রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক 'কবিশেখর' উপাধিতে ভূষিত হন। এই উপাধিটি এতই সুপ্রযুক্ত হইয়াছিল যে উত্তরকালে ইহা কবির নামের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত হইয়া পড়ে। যদিও কবি স্বয়ং কখনও এই উপাধিটি নিজে ব্যবহার করেন নাই। পরিণতজীবনে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সম্মানসূচক 'ডক্টরেট' লাভ করিয়াও তিনি তাহা কখনও ব্যবহার করেন নাই, অপর কেহ তাহা ব্যবহার করিলে বিরক্ত হইতেন। কালিদাস নিজের সাহিত্য-সাধনার গুণেই মহিমান্বিত ছিলেন, কোন উপাধি দ্বারা নিজেকে ঘোষণা করা কালিদাসের স্বভাববিরুদ্ধ ছিল।

একজন ছাত্রবৎসল সুশিক্ষক হিসাবে কালিদাস বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, ছাত্রদের চরিত্রগঠনের ব্যাপারেও তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। উত্তরজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত বহু কৃতী ছাত্রের তিনি ছিলেন শিক্ষাগুরু।

শিক্ষকতা কালিদাসের জীবিকা ছিল, কিন্তু সাহিত্যসাধনা ছিল তাঁহার জীবনব্রত। জীবিকার

অবসরে কালিদাসের সাহিত্যসাধনার বিপুল পরিমাণ তাঁহার নিম্নলিখিত রচনাপঞ্জী হইতে সহজেই অনুমিত হইতে পারে—

কাব্য

কুন্দ (১৯০৬), কিশলয় (১৯১১), বল্লরী (১৯১৬), পর্ণপুট ১ম (১৯১৪), পর্ণপুট ২য় (১৯২১), ব্রজবেণু (১৯১৫), ঋতুমঙ্গল (১৯১৬), ক্ষুদকুঁড়া (১৯২২), রসকদম্ব (১৯২৩), লাজাঞ্জলি (১৯২৪), চিত্তচিতা (১৯২৭), আহরণী (১৯৩০), হৈমন্তী (১৯৩৪), বৈকালী (১৯৪০), আহরণী (নবপর্যায়), আহরণ, সন্ধ্যামণি (১৯৫৮), গাথাঞ্জলি (১৯৫৮), দন্তরুচি কৌমুদী (১৯৬১), শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৬৪), গাথাকাহিনী (১৯৬৪), পূর্ণাহুতি (১৯৬৮), তৃণদল (১৯৭০), গাথামঞ্জরী (১৯৭৪), মনীষী বন্দনা (১৯৭৬), গাথাবলী (১৯৭৮)।

অনুবাদ কাব্য

গীতগোবিন্দ (১৯৩০), গীতালহরী, কাব্যে শকুন্তলা (১৯৪৩), ইন্দুমতী (১৯৫২), কুমারসম্ভব (১৯৫৩), মেঘদূত (১৯৬৩), ব্রজবাঁশরী, ঋতুসংহার।

আলোচনা

সাহিত্য-প্রসঙ্গ (১ম ও ২য়) ১৯৩১, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড) ১৯৪৯-৫০, ৫১), বঙ্গসাহিত্য পরিচয় (১ম, ২য়, ৩য়, খণ্ড) ১৯৪৯-৫১ শরৎ সাহিত্য (১ম ও ২য় খণ্ড) ১৯৫৬-৫৭, পদাবলী সাহিত্য, বঙ্গসাহিত্যের ক্রমবিকাশ (১৯৭৭). দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতা ও গান (১৯৭৮), শরৎসান্নিধ্যে (১৯৭৫)।

রম্যরচনা

চালচিত্র (১৯৬১), চণক সংহিতা (১৯৬১), রঙ্গচিত্র (১৯৬৫)।

কিশোর/শিশুসাহিত্য

কথামালিকা (১৯৩৬), কুরুরাজ (১৯৩৬), কথিকা (১৯৩৬), ভক্তমালিকা (১৯৩৭), জাতক মালিকা (১৯৩৮), গল্পমালিকা, লঙ্কেশ্বর, ছেলেদের রামায়ণ, ছেলেদের মহাভারত, জাতকের গল্প, জাতক কাহিনী, গল্পমাল্য, পুরাণ কাহিনী, গল্প কাহিনী (১৯৭৬), গল্প বলি গল্প শোনো (১৯৭৩), যাঁরা ছিলেন মহান (১৯৭৬), গল্পমালা (১৯৭৫)

পাঠ্যসহায়ক পুস্তক ও ভাষাতত্ত্ব

রচনাদর্শ (১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড)। প্রাথমিক রচনা ও অনুবাদ, রচনাদর্শিকা, নব প্রবেশিকা ব্যাকরণ সংক্ষিপ্ত প্রবেশিকা ব্যাকরণ, ব্যাকরণ দীপিকা, প্রবেশিকা ব্যাকরণ ও রচনা, প্রাথমিক ধর্মবোধ, School Pocket Dictionary, কবিতামঞ্জরী, কবিতা মালিকা।

এতদ্ব্যতীত কবিশেখর 'রসচক্র' নামে একটি বারোয়ারী উপন্যাস, 'অষ্টরম্ভা' নামে একটি হাস্যকৌতুকমূলক গল্পসংগ্রহ, কাহিনী, গল্পাঞ্জলি প্রভৃতি গল্পসংগ্রহ এবং কাব্যমঞ্জুষা, মাধুকরী প্রভৃতি

কাব্যসংগ্রহ গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। তাঁহার সমসাময়িক কবি করুণানিধান ও কুমুদরঞ্জনের কাব্যসংগ্রহও তিনি বিশেষ নৈপুণ্যের সহিত সম্পাদনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। মাধুকরী সমগ্র বাংলা কাব্যের একটি সুসম্পাদিত প্রামাণ্য সংকলন।

'বসুধারা' নামক একটি মাসিকপত্রিকা একসময়ে তিনি সম্পাদনা করিয়াছেন এবং মৈত্রী, টিচার্স জার্নাল ও সম্মেলনী নামক পত্রিকাগুলি পরিচালনা করিয়াছেন।

আজীবন সাহিত্যসাধক কালিদাসের বহু রচনা তাঁহার মৃত্যুর পরেও অপ্রকাশিত আছে—সেগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত রচনাগুলির নাম উল্লেখযোগ্য—

রবীন্দ্র-সাহিত্য (তিন খণ্ড), রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের আলোচনা, বঙ্গসাহিত্য পরিচয় (৬র্থ খণ্ড) বঙ্গসাহিত্য পরিচয় (আধুনিক পর্ব,) জীবনস্মৃতি, সাহিত্যিকের সান্নিধ্যে, রম্যরচনা (চতুর্থ খণ্ড), শিক্ষা, সমাজ, ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় আলোচনা, প্রেমকাব্য (আলোচনা), ছন্দের কথা শিশু ও কিশোর কাব্য সংকলন, বিদেশী কাব্যানুবাদ, অভিধান প্রভৃতি।

রবীন্দ্রযুগের কবিসমাজের মধ্যে কবি কালিদাস নিজস্ব স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্যের জন্য একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী এ সম্বন্ধে কোন মতদ্বৈধতার অবকাশ নাই। এই সম্বন্ধে মাত্র একজন অতি প্রসিদ্ধ বিদগ্ধ সমালোচকের অভিমত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে—"রবীন্দ্রপরবর্তী যুগে আমাদের প্রাচীন আদর্শ ও সংস্কৃতিকে নূতন যুগের অনুভূতি দিয়ে এমন চিত্তাকর্ষকভাবে পাঠকের সামনে উপস্থিত করা বিষয়ে তাঁর (কালিদাস রায়ের) কৃতিত্ব অসাধারণ। আমাদের সাহিত্যিক ঐতিহ্যের মধ্যে যে প্রেম, ভক্তির ও আত্মোৎসর্গের ধারা প্রবাহিত হয়েছে তার উৎসমুখকে তিনি বাধামুক্ত করে তার মধ্যে নূতন গতিবেগ সঞ্চার করেছেন। আধুনিক যুগের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিয়ে তিনি আমাদের চিরন্তন সংস্কৃতির নূতন করে মর্মোদ্ঘাটন করেছেন। তাঁর কবিতার মধ্যে সংস্কৃতের শব্দ গাম্ভীর্য ও ভাবের প্রগাঢ়তা আবার যেন নূতন প্রাণ পেয়েছে। (ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কথাসাহিত্য)।

কালিদাসের সাহিত্য সেবা কাব্যচর্চাতেই ক্ষান্ত হয় নাই। কবি কালিদাস অপরের সৃষ্টিকে উপভোগ করিয়া তাহার রস-মাধুর্য অতি দক্ষতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করিয়াও দেখাইয়াছেন। আদিযুগ হইতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের অতি সূক্ষ্ম রসগ্রাহী পর্যালোচনা কালিদাস রচিত বিপুল সমালোচনা সাহিত্যে স্থান পাইয়াছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কালিদাসের এই সূক্ষ্মদর্শী সাহিত্য সমালোচকের ভূমিকার প্রতি শ্রদ্ধা জানাইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে তাঁহার রবীন্দ্র ও শরৎ সাহিত্য সমালোচনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। রবীন্দ্র ও শরৎ সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে কালিদাসের নাম অতি উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, শরৎচন্দ্রের সহিত কবি কালিদাস রায়ের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ ছিল। শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে বহু অজ্ঞাত সংবাদ কালিদাসের মাধ্যমে তাঁহার জীবনী লেখকদের হস্তগত হইয়াছে।

কবি কালিদাস রায় তাঁহার ব্যক্তিজীবন শিক্ষকরূপে অতিবাহিত করেন, উত্তমরূপে বাংলা ভাষা

শিক্ষাদান তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। সমগ্র বাংলার তরুণ ছাত্রদের বিশুদ্ধ বাংলা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে কালিদাস কয়েকখানি বাংলা ব্যাকরণ ও রচনাশিক্ষা পুস্তক রচনা করেন। পরম যত্ন ও নিষ্ঠার সহিত তিনি এই কার্য করেন, নিছক অর্থোপার্জনের জন্য নহে। তাঁহার রচিত রচনাদর্শ, নব প্রবেশিকা ব্যাকরণ এবং প্রবেশিকা ব্যাকরণ ও রচনার মত উপাদেয় ব্যাকরণ গ্রন্থ অতি অল্পই রচিত হইয়াছে। বাংলা ভাষার বিশুদ্ধিরক্ষার দিকে কালিদাসের বিশেষ ব্যাকুলতা ছিল, শুধু ছাত্রসমাজ নহে এবিষয়ে সাধারণ পাঠককে অবহিত করার জন্য ও তিনি সাময়িক পত্রে বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

কবি কালিদাস রায় আজীবন নানা বৈচিত্র্যময় উপচারে বঙ্গভারতীর সেবা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার মত বহুমুখী প্রতিভা অতি অল্পই দেখা যায়। রবীন্দ্রপরবর্তী যুগে একই সঙ্গে সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কালিদাসের ন্যায় কেহই স্বীয় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখিতে পারেন নাই—একথা বলিলে সম্ভবত সত্যের অপলাপ করা হইবে না।

কবিশেখরের সাহিত্য-সাধনার স্বীকৃতিদানে দেশবাসীও কুণ্ঠিত হন নাই। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় ১৩৫০ বঙ্গাব্দে তাঁহাকে 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক'দানে সম্মানিত করেন, এই সম্মানের সর্বপ্রথম প্রাপক ছিলেন স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। ১৩৭০ বঙ্গাব্দে এই বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে বিশিষ্ট সাহিত্য সেবার জন্য 'সরোজিনী স্বর্ণপদকে' ভূষিত করেন। ১৩৭৫ বঙ্গাব্দে কালিদাস 'পূর্ণাহুতি' কাব্যের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন। ১৩৭৯ ও ১৩৮০ বঙ্গাব্দে যথাক্রমে রবীন্দ্র-ভারতী ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কালিদাসকে ডি. লিট উপাধি দানে সম্মানিত করেন। ১৩৭৭ বঙ্গাব্দে কালিদাস বিশ্বভারতীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান 'দেশিকোত্তম' উপাধি লাভ করেন। ১৩৫৪ বঙ্গাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কালিদাস রায়কে 'লীলা লেকচার' নামক ভাষণদান করিতে আমন্ত্রণ করেন। ১৩৭৩ বঙ্গাব্দে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে কালিদাস দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নামাঙ্কিত ভাষণ দান করেন। ১৩৭০ বঙ্গাব্দে তিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে কবি নবীনচন্দ্র সেন ভাষণ দান করেন। ১৩৭০ বঙ্গাব্দে বিশিষ্ট সাহিত্যসেবার জন্য কালিদাস আনন্দবাজার পত্রিকাগোষ্ঠী কর্তৃক প্রদত্ত আনন্দ পুরস্কার লাভ করেন। ১৩৬৮ বঙ্গাব্দে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে কবিশেখর কালিদাস মূল সভাপতির আসনে বৃত হইয়াছিলেন।

১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে অক্টোবর (বঙ্গাব্দ ১৩৮২) কবিশেখর কালিদাস রায় তাঁহার টালীগঞ্জস্থ 'সন্ধ্যারকুলায়' ভবনে পরিণতবয়সে পরলোকগমন করেন। তাঁহার বাসভবনের সম্মুখস্থ রাস্তাটির নাম তাঁহার নামাঙ্কিত হইয়া চিরদিন তাঁহার পুণ্যস্মৃতিকে ভাস্বর করিয়া রাখিবে। জন্মভূমি কড়ুই গ্রামেও তাঁহার গ্রামবাসিগণ স্মৃতি পাঠাগার স্থাপন করিয়াছেন। রবিবাসর, সাহিত্যতীর্থ, বাণীবিতান, তীর্থবাসর, ভাবীকাল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান তাঁহাকে শেষবয়সে গৃহে গিয়া সংবর্ধনা প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীমতী অমিতা ঘোষাল, শ্রীভূনাথ মুখোপাধ্যায়, শরবেণী ভূষণ, শ্রীচণ্ডী লাহিড়ী তাঁহার প্রতিকৃতি অঙ্কন করিয়া অর্পণ করেন।

কিন্তু এহো বাহ্য। তাঁহার কবি সম্মানী দিয়াছেন চিরকালই তাঁহার গুণমুগ্ধ অপরিচিত

দেশবাসী। 'নন্দপুর চন্দ্রবিনা'র সেই অমর গীতিগুঞ্জন 'ছাত্রধাবার' সেই কৈশোর সুখস্মৃতি, 'লালাবাবুর দীক্ষা'র সেই পুণ্যবাণী, 'ভাঙা পাথরের বাটি'র সেই অনন্ত বেদনা সাধারণ বাঙালী পাঠক কোনদিনই, বিস্মৃত হইবেন না।

সরস্বতীর বরপুত্র বহুসম্মানধন্য কবি কালিদাস রায় ব্যক্তিজীবনেও একজন আদর্শ পুরুষ ছিলেন। ভারতীয় সাধনার শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলি তাঁহার চরিত্রকে শ্রীমণ্ডিত করিয়াছিল। শিক্ষক, পিতা, ভ্রাতা, স্বামী, সহকর্মী, আত্মীয়, বান্ধব হিসাবে তিনি আদর্শস্থানীয় ছিলেন। নিরভিমান কবি কালিদাস রায় সর্বশ্রেণীর মানুষেরই শ্রদ্ধা ও আস্থাভাজন ছিলেন। হিংসা-দ্বেষ-পরশ্রীকাতরতা, পরনিন্দা-প্রবৃত্তি প্রভৃতি সাধারণজনসুলভ দোষগুলি হইতে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিলেন। বৈষ্ণব পরিবারের সন্তান বৈষ্ণব-কবি কালিদাস বৈষ্ণবজনোচিত সকল গুণেই ভূষিত ছিলেন। একাধারে বিদ্যা ও বিনয়ের এমন দুর্লভ সমাবেশ অতি অল্পই দেখা যায়। অনুপম চরিত্র-মাধুর্যসম্পন্ন কবি কালিদাস রায়ের সংস্পর্শে যিনি একবার আসিয়াছেন—তাঁহার পক্ষে কালিদাসের স্মৃতি অবিস্মরণীয়। বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে কালিদাস রায়ের নাম ভাস্বর হইয়া থাকিবে এ বিষয়েও সন্দেহ নাই।

কালিদাস রায় শুধু আদর্শ শিক্ষক বা সার্থক কবিই ছিলেন না, তিনি ছিলেন নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান। একযুগ ধরিয়া তিনি কবি, কথাসাহিত্যিক, সাহিত্য সমালোচক ও অধ্যাপকদের গুরুদেবের দায়িত্ব পালন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গৃহে প্রতিষ্ঠিত রসচক্র সাহিত্য সংসদের বৈঠকে যোগদান ছিল সাহিত্যকৌলীন্যের প্রতীক। রসচক্র একদা বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তাঁহার সন্ধ্যার কুলায়ের দ্বার ছিল সকলের জন্য অবারিত।

তাঁহার শান্ত, আপাতভীরু স্বভাবের জন্য সমগ্র জীবন তিনি বহুভাবে প্রবঞ্চিত হইয়াছেন, শেষ পর্যন্ত জনৈক প্রকাশকের নির্দয়তাই তাঁহার জীবনাবসান ঘটায়, কিন্তু সদানন্দ এই পুরুষের নিকট হইতে কেহই কোনদিন কোন অপ্রিয় কথা শোনে নাই বা পরুষ ব্যবহার পায় নাই।



নির্মলেন্দু বসু কর্তৃক আয়োজিত বাণীবিতানের সংবর্ধনাসভায় বনফুল, আচার্য সুনীতিকুমার, জরাসন্ধ, তারাশঙ্কর ও প্রমথনাথ বিশীর সঙ্গে কবিশেখর



কবিশেখরের সঙ্গে তাঁর ছাত্র সুভাষ মুখোপাধ্যায়, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, রমাকান্ত মৈত্র,



কবিশেখর ও কবি কুমুদরঞ্জন



কবিশেখর ও যাদুকর পি. সি. সরকার



কবিশেখর ও সহধর্মিণী সুকৃতি দেবী



কবিশেখর ও বিভূতিভূষণ

বন্ধু কালিদাস

—ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার

কালিদাস রায় আমার সমবয়সী ছিলেন, দুজনে এক বৎসরেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। তাঁহার সঙ্গে আমার খুবই সৌহার্দ্য ছিল এবং মাঝে মাঝে আমাদের মধ্যে সাহিত্য আলোচনা হইত। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডি-লিট উপাধি দিবার প্রস্তাব করিলে এ বিষয়ে তাঁহার সহিত আমার যে কথাবার্তা হইয়াছিল তাহা কালিদাস রায় শরৎ-স্মৃতিতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

আমি যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলাম তখন নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়ের আমন্ত্রণে কয়েকজন সাহিত্যিক ধর্মতলা রোড ও চৌরঙ্গীর মোড়ে হপসিং কোম্পানীর ফটোর দোকানের উপরের একটি কক্ষে সমবেত হইতেন। ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রায় রোজই আসিতেন, কালিদাস রায় মাঝে মাঝে যাইতেন। আমি সাহিত্যিক নহি কিন্তু মহারাজার ইতিহাসপ্রীতিবশতঃ এই সাহিত্যিক বৈঠকে আমিও নিয়মিত সদস্য ছিলাম।

ঐ কারণেই অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও রমাপ্রসাদ চন্দ কলিকাতায় আসিলে মহারাজার বৈঠকে উপস্থিত থাকিতেন। এইখানেই কবি কালিদাস রায়ের সহিত আমার সৌহার্দ্য ও ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। ইহার প্রধান কারণ তাঁহার কবিতা আমার খুব ভাল লাগিত কারণ তাহার ভাষা ছিল খুবই প্রাঞ্জল এবং ভাবের অভিব্যক্তিতে দুর্বোধ্য কিছু ছিল না।

সাধারণ পল্লীজীবনের দৈনন্দিন ঘটনা তাঁহার কবিতায় অপূর্ব মাধুর্যে ফুটিয়া উঠিত। তাঁহার একটি কবিতা দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করিতেছি।

একটি নব পরিণীতা বধূ ঘাটে বাসন-পত্র ধুইবার সময়ে একটি পাথরের বাটি ভাঙিয়া গিয়াছিল। ইহার জন্য শ্বশুর বাড়ীতে লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার ভয়ে তাহার মনের যে অবস্থা হইল তাহা কবিতায় অপূর্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। কবিতাটির নাম "ভাঙা পাথরের বাটি"। কবিতাটির কিয়দাংশ এখানে উদ্ধৃতি করিতেছি :—

একরাশি এঁটো বাসনের মাঝে একলা পা দুটি মেলে,
খিড়কির ঘাটে নূতন বৌটি নয়নের জল ফেলে।
বাসনের ভার সামলানো দায়, নামিতে পিছল ঘাটে

পাথর বাটিটি পড়ে ভেঙে গেছে ঠেকিয়া তালের কাঠে।
দশ পয়সার পাথর বাটিটি দুবছর আগে কেনা।
তার কোণ ভাঙা তুচ্ছ জিনিস, দামী কেউ বলিবে না ॥

দুইটি টুকরা জোড়া দিয়ে বধূ অঞ্জলিপুটে ধরি
বাষ্পসা চক্ষে চেয়ে আছে আহা মুখখানি নত করি।
হেরিছে অভাগী জমা লাঞ্ছনা বাটির মুকুট পুটে,
অন্ন খাবার বাটিটি ক্রমেই লোনা জলে ভ'রে উঠে।
ভাবে ব'সে হায় লাগে নাকি জোড়া কোন মন্ত্রের বলে।
কোন গুণী এসে সহসা যদি বা জুড়ে দেয় কৌশলে।
শ্বশুরবাড়ীতে আসিবার আগে কেন লয় নাই শিখে,
কি দিয়ে জুড়িলে জোড়া যায় ভাঙা পাথরের বাটিটিকে ॥

দেবতায় ডাকে অভ্যাস বশে, দেবতা বাঁচাবে যেন;
বাটিটা ভাঙিল, পড়িয়া তাহার মাথা ভাঙিল না কেন?

এরূপ অনেক কবিতাই অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী।

কবিশেখরের সহিত আমার সারাজীবনই অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা ছিল, তিনি আমার পারিবারিক বন্ধুরূপেই চিরকাল সুখদুঃখের সমব্যথী ছিলেন। কত ভাবে কত সূত্রে যে তাঁহার পরামর্শ, সহানুভূতি পাইয়াছি তাহা বলিবার নয়। এমন আন্তরিকতাপূর্ণ স্বজনসান্নিধ্য জীবনে আমি আর কাহারোর কাছ হইতে পাইয়াছি বলিয়া মনে পড়েনা। পরিবর্তে আমি তাঁহাকে বোধ হয় কিছু দিতে পারিনি।

আমার দেখা কালিদাস

হেমেন্দ্রকুমার রায়

অনেকে অকালে ঝরে পড়েছেন এবং অনেকের প্রেরণা অল্পদিনেই ফুরিয়ে গিয়েছে বটে, কিন্তু আমরা যে সময়ের কথা বলছি, বাংলা সাহিত্যের দরবারকে তখন মুখরিত করে তুলেছিল বহু কবির কলকণ্ঠ। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, গোবিন্দচন্দ্র দাস ও রজনীকান্ত সেন প্রভৃতি অগ্রজগণ বিরাজমান ছিলেন সগৌরবে। উদীয়মান কবিরূপে প্রশংসা অর্জন করেছেন যতীন্দ্রমোহন বাগচী, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুমুদরঞ্জন মল্লিক প্রভৃতি। কয়েকজন মহিলা কবিও তখন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন যেমন কামিনী রায়, স্বর্ণকুমারী দেবী, সরোজকুমারী দেবী, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, মানকুমারী দাসী প্রভৃতি।

কাব্যজগৎ যখন সরগরম, তখন তাঁদের পরে দেখা দেন কালিদাস রায়। বহু পত্রিকার পাতা ওল্টালেই দেখতে পেতুম এই তিনজন কবির কবিতা—জীবেন্দ্রকুমার দত্ত, কুমুদরঞ্জন মল্লিক ও কালিদাস রায়।

আজকের পাঠকরা জীবেন্দ্রকুমারকে জানেন না। কুমুদরঞ্জনও পাড়াগেঁয়ে কবি। বহুকাল আগে একবার মাত্র তাঁকে দেখেছিলুম আমাদের 'ভারতী' বৈঠকে। ছোটখাটো একহারা মানুষ, সাদাসিধে বেশভূষা ও কথাবার্তা, কোনরকম চাল নেই।

কালিদাসও গোড়ার দিকে দস্তুর মত কোমর বেঁধে নিযুক্ত হয়েছিলেন কবিতা রচনা কার্যে এবং বেশ কিছুকাল ধরে পূর্ণোদ্যমে চালিয়ে গিয়েছিলেন কবিতার কারখানা। কিন্তু ইদানীং তিনি যেন উৎসাহ হারিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে চান। সম্পাদকের তাগিদে কখনো-কখনো রচনা করেন দুই-একটি কবিতা। কুমুদরঞ্জনের মত কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীও সত্তর বৎসর বয়সেও বিনা তাগিদে পরম উৎসাহে কবিতা রচনা করতেন। কিন্তু করুণানিধান ও কালিদাস ষাট পার হবার আগেই কবিতার সঙ্গে করে এসেছেন দুয়োরাণীর মত ব্যবহার। করুণানিধান তো লেখনী ত্যাগ করেই বসে আছেন। কয়েক বৎসর আগে আমি যখন 'ছন্দা' পত্রিকার সম্পাদক, করুণানিধানের কাছ থেকে একটি কবিতা প্রার্থনা করি। তিনি পত্রোত্তরে জানালেন কবিতা তাঁর আর আসে না।

কালিদাস কিন্তু কোনদিনই একেবারে কলম ছাড়েননি। মাঝে মাঝে অল্পস্বল্প পদ্য এবং সেই সঙ্গে অপেক্ষাকৃত বেশী মাত্রায় গদ্য রচনা নিয়ে ব্যাপৃত হয়ে থাকেন। তিনি নাকি স্কুলপাঠ্য পুস্তক লেখেন

যা আমার চোখে পড়বার কথা নয়। কিন্তু বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর সাহিত্যনিবন্ধগুলি আমি সাগ্রহে পড়ে আসছি। সেগুলি সুখপাঠ্য রচনা। এমন প্রবন্ধরচনা বোধহয় আর কারো দ্বারা সম্ভব নয়।

তিনি নিজেও শিক্ষাব্রতী। স্কুলপাঠ্য পুস্তক লিখে অর্থ পাওয়া যায়, জীবনধারণের জন্যে যা অত্যন্ত দরকার। কবিতা যশ দিতে পারে, কিন্তু বিত্ত দেবার শক্তি থেকে সে বঞ্চিত। সংসারী হয়ে জীবনের উত্তরার্ধে এই সত্যটা উপলব্ধি করেই হয়তো কবিতার ঝোঁক কমে গিয়েছে কালিদাসের।

আমি তখন সাপ্তাহিক সাহিত্য পত্রিকা 'মর্মবাণী'র সহকারী সম্পাদক। কালিদাসের লেখনী তখন বিস্তর কবিতা প্রসব করেছে এবং যেকোন বিখ্যাত পত্রিকার পাতা ওল্টালেই তাঁর নাম দৃষ্টিগোচর হত। কিন্তু তখনো পর্যন্ত আমার দৃষ্টির গোচরীভূত হননি মানুষ কালিদাস। একদিন কবিবর করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'মর্মবাণীর' কার্যালয়ে বসে গল্প করছি। এমন সময়ে একটি যুবক ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন। দোহারা চেহারা, মুখখানি হাসি-হাসি, কিন্তু সর্বাগ্রে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় তাঁর ঘন কৃষ্ণমস্তকের দিকে। তিনি হেঁট হযে পায়ের ধুলো নিয়ে করুণানিধানকে প্রণাম করলেন।

করুণানিধান আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ইনি কবি কালিদাস রায়।"

তারপর জেনেছিলুম কালিদাস শ্যামবর্ণের চর্মের তলায় ঢেকে রেখেছেন নিজের পরম শুভ্র ও শুদ্ধ চিত্তটিকে। দলাদলির ধার ধারেন না, বড় বড় সাহিত্যবৈঠকেও তাঁকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। জনতা থেকে দূরে একান্তে থাকতেই ভালবাসতেন। প্রাণ খুলে সমসাময়িকদের প্রশংসা করতে পারেন। যখন আমার 'যৌবনের গান' নামে কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল, তখন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ হ'ত না বললেই চলে এবং এখনো তাঁর দেখা পাই কালেভদ্রে এখানে ওখানে। হঠাৎ একদিন সবিস্ময়ে দেখলুম, একখানি পত্রিকায় 'যৌবনের গানের'র উপরে কালিদাসের লেখা একটি প্রশস্তিপূর্ণ কবিতা প্রকাশিত হয়েছে।

কালিদাস কবিতার বই প্রকাশ করেছেন অনেকগুলি—যেমন "কুন্দ," "পর্ণপুট," "বল্লরী" "রসকদম্ব" "ব্রজবেণু", "লাজাঞ্জলি", "ঋতুমঙ্গল" ও "ক্ষুদকুঁড়া" প্রভৃতি। যখন কাসিমবাজারের স্কুলে পড়তেন, পদ্য লেখা শুরু করেছিলেন তখন থেকেই। মাসিক পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করবার আগে সভায় প্রথম যে কবিতা পাঠ করেন, তার মধ্যে ছিল মদ্য ও মদ্যপায়ীদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ। আজও তাঁকে 'পিউরিট্যান' কবি বলে বর্ণনা করলে অত্যুক্তি হবেনা। স্কুলের চেয়ারে বসে হয়েছেন পাকা মাষ্টারমশাই—ছেলেদের দেন হিতোপদেশ। বাড়ীতে ফিরে কবির আসনে আসীন হয়েও তিনি লেখেন না আর প্রেমের কবিতা। তিনি বৈষ্ণব কবিদের পদাবলীর ভক্ত এবং নিজেও পরম বৈষ্ণব। অথচ বৈষ্ণব কবিরা হচ্ছেন প্রধানতঃ প্রেমের কবিই, এটা দেখেও প্রেমকে তিনি 'বয়কট' করে বসে আছেন।

মাথার চুল পাকলে কেউ যে প্রেমের কবিতা লেখে, এটাও তিনি পছন্দ করেন না। আমি তখন পঞ্চাশ পার হয়েছি। আমার এক সাহিত্যিক বন্ধু এসে বললেন, "কবি কালিদাস রায় অভিযোগ করছিলেন,—এ বয়সে হেমেন্দ্র প্রেমের কবিতা লেখে কেন ?"

উত্তরে আমি বললুম, "পঞ্চাশোর্ধ্বেও মনে বনে যাওয়ার ইচ্ছা জাগেনি, তাই।"

বোধ হয় স্কুল মাষ্টারী করলে মানুষের মন বুড়িয়ে যায় তাড়াতাড়ি। কয়েক বৎসর আগে টালিগঞ্জে কালিদাসের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলুম। সদরে বাড়ির নাম লেখা রয়েছে—'সন্ধ্যার কুলায়।' বাড়ির নামেও জীবন সন্ধ্যার ইঙ্গিত। কবির তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, আসন্ন অন্ধকারে তিনি শ্রান্ত দেহে বিশ্রাম করবার জন্যে নিজের নীড় বেঁধে নিয়েছেন। কবির পক্ষে এ যেন বড় বাড়াবাড়ি।

কালিদাসকে ভালবাসি, কিন্তু আজকের কালিদাসকে আমার পছন্দ হয় না। ভাবতে ভালো লাগে সেদিনকার কালিদাসের কথা, যেদিন তিনি কবিতা শুরু করেছিলেন এই ব'লে—নন্দপুর চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার। স্মরণ আছে, কবিতাটি মন্ত্রশক্তির মত পাঠকদের কিভাবে আকৃষ্ট করেছিল। কবিতাটি ফিরত লোকের মুখে মুখে, তা মুখস্থ করে ফেলেছিল বালকবালিকারা পর্যন্ত। রবীন্দ্রোত্তর যুগের আর কোন কবির একটি মাত্র কবিতা এত বেশি খ্যাতিলাভ করেছে বলে আমার মনে হয় না।

স্মরণ আছে, কবিতাটির খ্যাতি দেখে কোন কোন সাহিত্যিকের মনে হয়েছিল হিংসার উদ্রেক। অত্যন্ত অধ্যবসায় সহকারে পুরাতন সাহিত্য হাতড়ে তাঁরা প্রমাণিত করতে চেয়েছিলেন ; এ কবিতাটি হচ্ছে রচনাচৌর্যের দৃষ্টান্ত। আসলে কিন্তু কিছুই প্রমাণিত হয়নি। উলটে চিরকালীন বৈষ্ণবকবিদের চিরন্তন রচনাবলীর মধ্যে অন্যান্য বহু কবিতার সঙ্গে তাঁর এই কবিতাটিও চিরস্থায়ী আসন লাভ করেছে।

স্মৃতির আলোয়

বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র

কালীদার কথা মাঝে মাঝে মনে পড়লেই পুরোনো স্মৃতি জেগে ওঠে। অতি ছেলেবেলায় সব মাসিক কাগজেই তাঁর কবিতা প্রকাশিত হ'ত, সেগুলি পড়ে খুব ভাল লাগত। তাঁর লেখার মধ্যে এমন সহজ সরল ভাব ছিল—সৌন্দর্য উপভোগ করার আভাস, তাঁর কবিতা পড়ে ছেলেবেলা থেকেই আমরা পেতাম। এমন কি স্কুলের পাঠ্য পুস্তকেও তাঁর অনেক কবিতা পড়তাম।

তখন থেকেই আমার ইচ্ছা ছিল কবিকে একবার দেখি। তিনি কি করেন, কি রকম লোক তা জানতাম না।

একদিন দেখলাম, একটি বইয়ের দোকানে কালিদাস রায় মহাশয় বসে আছেন আর সেখানে ছিলেন নরেনদা অর্থাৎ কবি নরেন্দ্র দেব। তাঁর সঙ্গে চেনা অনেকদিন। তিনি আমায় কি একটা কাজে ডাকলেন, আমি দোকানে ঢুকতেই তিনি বললেন, ওহে কালিদাস, এই ছেলেটির নাম বীরেন্দ্র ভদ্র। ও সুরেশ সমাজপতির বাড়ীর সামনে থাকে, ওখানে যত জন সাহিত্যিক আসে তাঁদের সঙ্গে ছেলে বেলা থেকে আড্ডা দেয়, জান? আবার আমার বাড়ীতেও আসে। একদিন তোমার কথা উঠতে ও বললে, নরেনদা আমার সঙ্গে কালিদাস রায়ের আলাপ করিয়ে দেবেন। আমি বলেছিলুম নিশ্চয় দোব। কালিদাসের সঙ্গে দেখা হয়, তুমি একদিন এম. সি. সরকারের দোকানে এস না।

কিন্তু আমার সুযোগ হয়নি। হঠাৎ একটি ছোট্ট দোকানে দেখা। নরেনদাই আলাপ করিয়ে দিলেন।

কালিদাস বাবু গম্ভীরভাবে আমার দিকে একবার তাকালেন এবং গম্ভীরভাবে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কবিতা লেখ নাকি? আমি বললুম, কবিতা লিখিনা, ছড়া লিখি।

—তাই নাকি! তা আমাকে দেখবার ইচ্ছা তোমার হল কেন? আমার কবিতা পড়েছ?

আমি অপ্রতিভ ভাবে বলে উঠলাম, অনেক অনেক কবিতা পড়েছি। যে কাগজই খুলে দেখি সেই কাগজেই আপনার একটা না একটা কবিতা দেখতে পাই। পড়ার বইয়েতেও আছে।

কালীদা মৃদু হেসে বললেন, তুমি কি পড়?

আমি বললুম, কলেজে সবে ঢুকেছি। স্কুলে আপনার দু' একটা কবিতা মুখস্থ করেছিলাম, এগ্জামিনেশান দেবার জন্যে।

কালীদা বলে উঠলেন, দু একটা বল তো ?

আমি হাত জোড় করে বলে উঠলুম, সব লাইন তো মনে নেই, পরীক্ষার সময়ে মনে ছিল, তবে কিছু মনে আছে কিছু নেই, সেটা বলতে গেলে ঢোঁক গিলতে হবে আমাকে।

কালীদা হেসে উঠলেন খুব। তখন নরেন দা বলে উঠলেন, ওহে বীরেন, কালিদাস আবার মাষ্টারী করে। শুধু কবি নয়, বেশি ঘেঁসোনা—এর পরে পড়া জিজ্ঞেস করবে।

তখন কালীদা ও আমি দুজনেই হেসে উঠ্লুম। কিন্তু আশ্চর্য কালীদা জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত যতদিন দেখা হয়েছে ততদিন যেখানে গেছি সেখানেই ডাক দিয়ে আমার সঙ্গে কত আলোচনাই না করতেন। কোনদিন তাঁকে মাষ্টারি করতে দেখিনি, চিরকালই তিনি আমার বড়দাদা, বন্ধু হয়েই কাটিয়েছেন।

টালীগঞ্জের বাড়ী করে আমায় নিয়ে গেলেন, খাওয়ালেন, কবিতা পড়লেন এবং আমার লেখা কাগজে যা বেরুত, সেগুলো পড়ে তিনি খুব খুশি হয়ে বললেন, বীরেন, তুমি যে ছেলেদের গল্পগুলো লেখ, এগুলো পড়ে আমি খুব খুশি হয়েছি। তুমি একটা বই বার কর। সেদিন প্রেমাঙ্কুরকে (প্রেমাঙ্কুর আতর্থী) বলছিলাম সেও তোমার খুব তারিফ করছিল।

আমি হাসলাম। কিন্তু বহু সাহিত্যিকের বহু অনুরোধ শুনেও আমার লেখাগুলোকে আজ পর্যন্ত একত্র করে বার করতে পারিনি। জানিনা, জীবনে কোনদিন সেটা করতে পারব কিনা তবু মাঝে মাঝে মনে হয় আমাকে যাঁরা ছোট ভায়ের মত ভালবাসতেন তাঁদের একে একে সবাই চলে যাচ্ছেন তাঁদের এই ইচ্ছাটা জীবনে পূরণ করতে পারলাম না।

কালীদাকে আমি তারপর বহুবার বহু গ্রন্থালয়ে, তাঁর সহপাঠী বন্ধু শিশির কুমার ভাদুড়ীর সঙ্গে, সুধীর সরকার মশায়ের এম. সি. সরকারের দোকানে, শেষকালের দিকে মিত্র ঘোষ কোম্পানীর বইয়ের দোকানে পেয়েছি, বহুবার গল্প গুজব করার সৌভাগ্য জীবনে হয়েছিল এবং পরমাত্মীয়ের মত প্রতিবার দেখা হলেই বলতেন, তুমি বহুদিন আমার বাড়ী যাওনি—একবার এসোনা।

ঐ বার বারই করা হ'ত কিন্তু সর্বদা ওঁর আমন্ত্রণ রাখতে পারতুম না বলে আজ দুঃখ অনুভব করি।

তবে বেতারকেন্দ্রে বহুবার তাঁকে নিয়ে এসেছি তিনি কবিতা পড়ে শ্রোতাদের শুনিয়েছেন তারপর আমার সঙ্গে শুধু সাহিত্যের গল্প নয় বহুজনের বহু কথা শোনাতেন। এক এক সময় দুঘণ্টা বসে আমার সঙ্গে গল্প করতেন।

তাঁর আচরণে আমি বুঝতেই পারতুম না তিনি আমার আত্মীয় নন। অবশ্য আমি সাহিত্যিক না হলেও ষাট-সত্তর বৎসর অজস্র সাহিত্যিকদের সঙ্গ লাভ করে কত সম্পদ যে পেয়েছি তা বলতে পারিনা। কালীদার কাছ থেকেও বহু বিষয় শুনেছি।

এই স্নেহ আমি ভুলতে পারি না। কবি হিসেবে তিনি বড়, না মানুষ হিসেবে আরও বড় সেটা ঠিক করতে পারিনা। আমার সঙ্গে এমন সদানন্দ পুরুষের পরিচয় ছিল এইটেই ভাগ্য। যথার্থ কবি, যথার্থ ভক্তিমান, চিন্তাশীল, বন্ধু বৎসল এমন মহাপ্রাণকে ভুলে যাওয়া যায় না। কবি কালিদাস রায় আজও যেন আমার সম্মুখে সেই স্নেহ ভাণ্ডার নিয়ে বসে আছেন এইটেই দেখি মানসচোখে।

কবিশেখরের মনুষ্যমহিমা

জনার্দন চক্রবর্তী

পরিচিত জগতের ওপর কালো যবনিকা টেনে দেয় মৃত্যু, আর যাঁদের নিয়ে জীবন তাঁদের সকলের সঙ্গে ঘটায় চিরবিচ্ছেদ। এইজন্য অনিবার্য জেনেও আমরা মৃত্যুকে নিষ্ঠুর ঘটনা বলি। কিন্তু মৃত্যুর চেয়েও নিষ্ঠুরতর ঘটনা মরণাস্তিক বিস্মৃতি। ইদানীং শতবার্ষিকী জন্মজয়ন্তী ও বিচিত্র স্মরণোৎসবের বাহুল্য দেখা দিয়েছে আমাদের কালে। আগে এদেশে ছিল শ্রাদ্ধতর্পণ, দ্যুলোকবাসী স্বধাভোজী পিতৃপুরুষের শ্রদ্ধাবিগলিত স্মরণ, যা এখনও আমাদের পিতৃদৈবত জাতি, বিশ্বাস অবিশ্বাস, টেনে চলেছে। এসব সত্ত্বেও মনে হয় একালে সমাজ ব্যক্তিমানুষের সম্পর্কের আন্তরিকতা ও নিবিড়তা থেকে যেন দূরে সরে যাচ্ছে জীবনে ও মরণে। স্মরণীয় ও বরণীয় যাঁরা এমন লোকোত্তর ব্যক্তিকেও আমরা সহজে ভুলে গিয়ে স্মৃতিভার লঘু করে অহংমুখিতার সঙ্গিন উঁচিয়ে এগিয়ে চলেছি।

কবিশেখর কালিদাস রায় অবিসংবাদিত ভাবে ছিলেন এমন একজন লোকোত্তর পুরুষ। বাংলার সারস্বতজগতে ও সহৃদয় মননশীলসমাজে অনেকখানি স্থান অধিকার করে তিনি 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় চ' সুদীর্ঘ জীবন যাপন করেছিলেন। কবিশেখরের কবি পরিচয়টি মুখ্য ও যথেষ্ট মহিমান্বিত হলেও মানুষ পরিচয়েও তিনি তুঙ্গস্থানে বিরাজ করতেন। আদর্শবাদী শিক্ষক হিসাবে 'ছাত্রধারা'র কবি অনন্যতার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। নিরহঙ্কার নির্বিরোধ নির্মৎসর এই সর্বপ্রীতিময় স্বভাবভদ্র মৃদু মানুষটির চরিত্রমাধুর্য এক হিসাবে তাঁর জাগতিক প্রতিষ্ঠার অন্তরায়স্বরূপ হয়েছিল। তাঁর কাব্যকবিতার ভাষা ও ছন্দে একটি স্বতঃস্ফূর্ত স্বাদুতা প্রত্যক্ষগম্য হয়ে যেন অনেকখানি 'গুণ হইয়া'-দোষ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বৈষ্ণবের প্রাণবিমোহন জীবনসত্য নিয়ে তিনি ক'টি অত্যুৎকৃষ্ট কাব্যকথিকা রচনা করেছিলেন। 'নন্দপুর চন্দ্রবিনা বৃন্দাবন অন্ধকার,' এ কালের এই একটিমাত্র কবিতায় সে কালের গোবিন্দদাসের 'সংস্করণ' দেখা গিয়েছিল, অনুরণন কানে এসেছিল।

কবিশেখরের সৃষ্টিসম্ভারের উৎকর্ষ ও গুরুত্ব বিশেষ মতবাদী কোনও সাহিত্যিকের... স্বীকৃতির অপেক্ষা রাখে না। তাঁর সাহিত্যকীর্তির পরিমণ্ডলটি নিতান্ত সঙ্কীর্ণ নয়। বহুমুখী সারস্বতপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন এই বহুরূপী বাণীপন্থী। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, পণ্ডিত, সংস্কৃতবেত্তা, ছান্দসিক, বৈয়াকরণ, শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক, সাহিত্য সমালোচক, বাংলার তথা ভারতীয় সংস্কৃতির মর্মগ্রাহী ব্যাখ্যাতা। তাঁর রচিত বহু গ্রন্থ সুধীজনের আস্বাদ্য, তাঁর মতামত বিদগ্ধজনের অবলম্বনীয়।

এর যে-কোনও একটি দিক নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। স্থানান্তরে

আমাদের তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতে হয়েছে, অনতিবিলম্বে যার প্রকাশ সম্ভাবনা রয়েছে। এখানে আমরা স্বর্গত মহাপ্রাণ মানুষটির সম্পর্কে দু'একটি স্মৃতিকথার অবতারণা করব। 'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,' রবীন্দ্রনাথের এই সহজ অথচ গভীর উক্তিটি কবিশেখর সম্পর্কে কতখানি সত্য, তার উপলব্ধি আমাদের অভিজ্ঞতার বিষয় হয়েছে।

১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে একই সঙ্গে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক এবং তৎসংলগ্ন ইডেন হিন্দু ছাত্রাবাসের তত্ত্বাবধায়কের পদ থেকে আমাকে বিদায় নিতে হয়। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আশা করেছিলেন, আশ্বাসও দিয়েছিলেন, আমার সেবাকাল বর্ধিত হবে। সদ্যঃ-প্রবর্তিত মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি অপূর্ব চন্দ মহোদয় আমাকে প্রধান পরীক্ষকের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। প্রায় পঞ্চাশ জন পরীক্ষক বন্ধুর সহযোগিতায় নিপুণভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে আমাকে কাজটি সমাধা করতে হবে। খবর এল, আমার কার্যকাল বর্ধিত হবে না। প্রত্যাসন্ন গ্রীষ্মাবকাশের কিছুটা তত্ত্বাবধায়কের বিস্তৃত বাসভবনের একটি কোণে বসে আমাকে গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার কাজটি সমাপ্ত করতে দেওয়া হোক এ প্রার্থনাও বাতিল হয়ে গেল। আশ্রয়চ্যুত প্রধান পরীক্ষকের বিপদের মুহূর্তে একজন সহৃদয় পরীক্ষক সহকর্মী ছুটোছুটি করে হাওড়ার অভ্যন্তরে জনাকীর্ণ অঞ্চলে দুটি কক্ষের একটি দ্বিতলস্থিত গুহাবাস সংগ্রহ করে দিলেন। বিশাল প্রাসাদ ছেড়ে গুহাবাস। আমার নাতিক্ষুদ্র পরিবার, বিশেষতঃ শিশুরা এই অনভ্যস্ত অবস্থা বৈষম্যের উপলব্ধিতে অভিভূত হয়ে পড়েছিল। বহু সংস্র খাতার বাণ্ডিল, পুস্তকাধার ও সারাজীবনের যত্নাহৃত গ্রন্থসম্ভার নিয়ে যখন ট্রাকগুলি নূতন বাসগৃহে উপস্থিত হল তখন পরীক্ষার খাতা ও শিশুদের আশ্রয় দেবার সঙ্কীর্ণ স্থান ছাড়া অর্ধেক দ্রব্যসম্ভার স্তূপীকৃত করবারও স্থান সেখানে ছিল না। দাঁড় বেঁধে গ্রন্থসম্ভার ও পুস্তকাধারগুলি ছাতে তুলে ত্রিপলে ঢেকে রাখতে হয়েছিল। বর্ষায় সেই সম্পদের প্রায় অর্ধেক নষ্ট হয়ে যায় আর সংগ্রহ করা হয়ে ওঠেনি। ঠিক এই সময়ে আমার এঞ্জিনীয়র বড়ো জামাইয়ের একটি দুর্ঘটনায় মস্তিষ্কে গুরুতর আঘাতের দুঃসংবাদ পেয়ে আমাকে জামসেদপুরে যেতে হয়েছিল।

ফিরে এসে শুনতে পেলাম, এই ঘোর দুর্দিনে ওপার কলকাতা থেকে একটিমাত্র মানুষ বৃষ্টি মাথায় করে হাওড়ার দুর্গম অঞ্চলে আমার খোঁজ নিতে এসেছিলেন। কলিকাতা পর্বের সমারোহপূর্ণ সব সেবাময় জনসমাগম মুখর জীবনের অবসানে নিঃসঙ্গ সম্বলহীনতার দুর্দিনে এই অ-দ্বিতীয় অতিথিটির অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব তাই আমার অনুপস্থিতিতে পারিবারিক জীবনস্মৃতিতে স্নিগ্ধ-জলধরের শ্যামলিমায় আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। অতিথিটি কবিশেখর কালিদাস রায়। আমার স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় ও আলাপ ছিল না। তবুও তাঁকে ডেকে কাছে নিয়ে তিনি সান্ত্বনা ও ভরসা দিয়েছিলেন। সে সান্ত্বনার ভাষা কবিভাষা। "বৌ-মা, জনার্দনের অজ্ঞাতবাস চলছে। আমার ভাগার এ দুর্দিন কেটে যাবে, সু-দিন আসবে। আপনি ভাববেন না।" দেড় হাজার বছর আগে যার কবিভাষা মিথ্যা হতে পারে না। 'সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমার্দম্ অন্তঃকরণ প্রবৃত্তয়ঃ।' সজ্জনের বিমল অন্তরে সংশয়াকুল ভবিষ্যতের প্রতিবিম্ব পড়ে। কালিদাসবাবুর শুভাশংসনের অত্যল্পকাল পরেই অধ্যক্ষ প্রশান্তকুমার বসু মহোদয় অধ্যাপক জগদীশ ভট্টাচার্যকে পাঠিয়ে আমাকে আচার্য গিরিশচন্দ্র সংস্কৃতিভবনের সান্ধ্য এম. এ. ক্লাসে ও কলেজ বিভাগে আংশিকভাবে অধ্যাপনার

ভার দেন। পরে-পরে ক্রমান্বয়ে মুরলীধর বালিকা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ-পদ, নবসৃষ্ট বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার বিভাগীয় অধ্যাপক-প্রধানের পদ (উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের একই পদ, যা আমার নেওয়া হয়নি), মহারাণী কাশীশ্বরী (বালিকা) মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ পদের অযাচিত আহ্বান আমার নিকট এসেছিল। প্রতিবারই অগ্রজপ্রতিম সর্বোদয়কামী গুণগ্রাহী বন্ধু স্বয়ং কবিশেখর বাড়ীতে এসে আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে গিয়েছেন।

আর একটি স্নিগ্ধ পরিহাস সমুজ্জ্বল ঘটনার উল্লেখ করি। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রোডের একটি দ্বিতল বাড়ীতে মাধ্যমিক শিক্ষাপর্ষদের ভাড়াটিয়া বাড়ী। পর্ষদের প্রথম সংগঠক-সভাপতি অপূর্ব চন্দ্র মহোদয়ের আহ্বানে আমি, বন্ধুবর স্বর্গত ডঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত ও কবিশেখর কালিদাস রায় প্রশ্নসংকলন, পাঠ্যসূচী রচনা প্রভৃতি নানাকাজের ভার পেতাম। হঠাৎ চন্দ্রমহোদয়কে পদত্যাগ করতে হ'ল, তাঁর উত্তরসূরী হলেন বিচারপতি মাননীয় গোপেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়। সাহিত্য পরিষদের তদানীন্তন সভাপতি সজনীকান্ত দাশ মহাশয় বিচারপতি দাশের আমলে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। একদিন একটি বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্যে পর্ষদগৃহের খাড়াই সিঁড়ি ভেঙ্গে আমরা উপরে উঠছি। কালিদাসবাবু আমার কাঁধে হাত রেখে ভর করে উঠছেন। হঠাৎ পিছন থেকে দ্রুতপদে টক্ টক্ করে উঠে এসে সজনীবাবু আমাদের ধরে ফেলে 'এই যে কালিদা' এই বলে কবিশেখরের হাতখানি আমার কাঁধ থেকে প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে ত্বরিৎপদে উপরে উঠে গেলেন।

আমি থমকে দাঁড়ালাম। বেশ একটু অভিমান হ'ল। আমি সজনীবাবুর নিতান্ত অপরিচিত ছিলাম না। সাহিত্য পরিষদে আমাকে বলতে কইতে তিনি বহুবার দেখেছেন। আমি সাহিত্যিক মেলবন্ধনের (ট্রেড ইউনিয়নের) গোষ্ঠীভুক্ত হতে পারিনি, সেইজন্য বোধহয় মহামহিমান্বিত প্রাক্তন শনিবারের চিঠির গোষ্ঠীপতি আমার সান্নিধ্য লক্ষ্য করতে পারলেন না। আমি অনুচ্চ কণ্ঠে তাঁর কাছে গোহারি জানালাম, "সজনীবাবু, দা-যের সঙ্গে একখানি ছোট্ট কাটারিও ছিল। লক্ষ্য করলেন না।"

সজনীবাবু উত্তর দিতে ইতস্ততঃ করছিলেন।

কবিশেখর হো-হো করে উচ্চ হাসি হেসে বললেন, "দেখলে সজনী, কাটারির ধার, কেমন কাটলো? তাইতো বলি, ভায়া আমার ক্ষুরধার।"

তীক্ষ্ণধী নির্মৎসর এই রসিকতা কত নিরপেক্ষ, সত্যসন্ধ, বেদনায় সহানুভূতিতে সম্পন্ন ও সম্পূর্ণ।

কালীদা

মনোজ বসু

যখন রিপন কলেজিয়েট স্কুলে পড়তাম, তখন আমরা 'বিকাশ' নামে একটা মিনি পত্রিকা বের করেছিলাম। তার প্রধান উদ্যোক্তা পরমবন্ধু পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস। আমি সেই কাগজে লিখতাম ও প্রকাশক হিসাবে কিছুদিন আমার নামও ছিল। 'বিকাশে'র জন্য লেখা দরকার। আমরা কয়েকজন ছাত্র কালিদাস রায়ের কাছে গেলাম একটা লেখা চাইতে। তখন কালিদাস রায়ের কবি হিসাবে খুব খ্যাতি - নানা কাগজে তাঁর লেখা বেরোয়। তিনি আমাদের ইস্কুলের ছাত্র বলে অবহেলা করলেন না। ছোট কাগজ বলেও প্রত্যাখান করলেন না। একটা কবিতা দিলেন—নাম 'কৃত্তিবাস'। এখনও কয়েক ছত্র মনে আছে :

তোমার কীর্তি রক্ষার কথা
ভাবিতে মোদের হাস্য আসে -
কোন্ অংশুক পরাবো আমরা
কাল-জয়ী সেই কৃত্তিবাসে ॥

কলকাতায় ভবানীপুর সাউথ সুবার্বন কলেজে পড়ি। তখন কালীদা বড়িষা স্কুলে মাষ্টারি করতেন—সন্ধ্যার সময়ে ট্যুইশানিতে যেতেন, রাস্তায় আমাদের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হ'ত। আমরা তাঁর দিকে চেয়ে থাকতাম আর বলাবলি করতাম, এতবড় পণ্ডিত কবি, তাঁকেও ট্যুইশানি করে বেড়াতে হয়। বড়িষা স্কুল ছেড়ে তিনি ভবানীপুর মিত্র স্কুলে এলেন। আমিও সাউথ সাবার্বন স্কুলে মাষ্টার হয়ে তখন ঢুকেছি। কালীদার প্রতি আমার তখন অপরিসীম শ্রদ্ধা-প্রীতি, লেখক ও কবি হিসাবে। তিনি আমায় চেনেন না, আমি তাঁকে বিলক্ষণ চিনি। কালীদা তাঁর লেখা পাঠ্যপুস্তক ধরাবার জন্য একদিন আমাদের ইস্কুলে পদধূলি দিলেন। তখন তাঁর সঙ্গে পরিচিত হবার একটা সুযোগ এসে গেল। তখন আমি অল্পস্বল্প লিখি। সাউথ সুবার্বন স্কুলের ম্যাগাজিনে আমার দু'একটা লেখাও বেরোত। আমি ঐ ম্যাগাজিনের সম্পাদকীয় তত্ত্বাবধায়ক ছিলাম। তিনি

চেয়ে নিয়ে সেই সব লেখা পড়লেন এবং খুব তারিফ করলেন। কিছুদিন পরেই প্রবাসীতে আমার গল্প বেরিয়ে প্রসিদ্ধি লাভ হল।

কালীদাই আমাকে পাঠ্যপুস্তক রচনা করাতে উৎসাহিত করেন। কতকগুলো পাঠ্যপুস্তক থেকে বেছে বেছে কয়েকটা প্রবন্ধ আমায় দিলেন আবার আমাকেও কয়েকটা লিখতে বললেন। আমার নামে একটা পাঠ্যপুস্তক বেরোল, নাম 'সাহিত্যমঞ্জুষা'। কালীদার তখন প্রধান পাবলিশার্স কমলা বুক ডিপো। কালীদা আমাকে তাঁদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তাঁরা সাহিত্যমঞ্জুষা ছাপালেন। সামান্য স্কুলমাষ্টারী করি—অর্থেরও অভাব। এই বইএর দৌলতে কিন্তু টাকা আসতে লাগল। কালীদার সংস্পর্শে এসে পাঠ্যপুস্তক রচনায় মেতে উঠলাম। পাঠ্যপুস্তক লেখার মধ্য দিয়েই আমি অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলাম।

তিনি আমাকে ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ করতেন। বিশাল চরিত্রের মানুষ তিনি—তাঁর স্নেহপ্রীতির তুলনা নেই। নিজের পরিবারের একজন ভেবেই ভালবাসতেন আমাদের। দলাদলি তিনি পছন্দ করতেন না। আমরা লেখকরা বৃহৎ পরিবারের মতো থাকতাম, একে অন্যের খুবই আপন ছিলাম। আর তিনি সেই পরিবারের বড়কর্তা—সর্বজ্যেষ্ঠ, আমাদের দাদা।

রসচক্র নামে একটি সাহিত্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন তিনি ও তাঁর কনিষ্ঠভ্রাতা রাধেশ রায়। প্রতিষ্ঠানটি তাঁর ও রাধেশদার প্রাণস্বরূপ ছিল। রাজা বসন্ত রায় রোডে তাঁদের বাসাবাড়িতে প্রতি সপ্তাহে রসচক্র বসত। দুঃখদৈন্য অভাব অভিযোগের সঙ্গে সংগ্রামে ক্ষত বিক্ষত আমরা অবসর দিনে রসচক্রে প্রচুর প্রাণরস আহরণ করতাম। তখনকার দিনের নবীন লেখক অনেকেই যেত, অঞ্জলিভরে সাহিত্যরস পান করে নতুন অনুপ্রেরণা নিয়ে আসত। ভাবি অনেক সময়, আর দশটি সুস্থ ভদ্রজনের মতো তাস-দাবা এবং পরচর্চায় কাল না কাটিয়ে সারা জন্ম নিজেকে নানা রকমে বঞ্চিত করে এই যে লেখনী চালিয়ে যাচ্ছি, কালীদাকেও অনেকখানি দায়ী করা যায় এই জন্য। আমরা রসচক্রের সভ্যেরা মাঝে মাঝে বাগানবাড়ীতে উৎসব করতে যেতাম। সেখান খাওয়া দাওয়া চলত, সকালে ও বিকালে সাহিত্যিকদের নিয়ে অধিবেশন বসত। এখনও মনে আছে একবার আমরা বরানগরের কাছে ও সি. গাঙ্গুলীর বাগানবাড়ীতে গেছিলাম। গাছে চড়ে সেখানে ফল পেড়ে সকলকে খাইয়েছিলাম—সে এক মধুর স্মৃতি।

কালীদার ভাই রাধেশদা 'রসচক্র সাহিত্য সংসদ' নাম দিয়ে বই ছাপাতে লাগলেন। পরবর্তী-কালে তিনি 'নরবাঁধ' নামে আমার বই ছাপালেন। দুটো বড় গল্প তার মধ্যে ছিল-নরবাঁধ ও মাথুর। কবি মোহিতলাল মজুমদার মাথুর সম্বন্ধে যে ভাষায় প্রশংসা করেছিলেন. সাহিত্যজীবনে আমার তা মূল্যবান সম্পদ।

শরৎচন্দ্র ছিলেন কালীদার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ। তিনি ছিলেন রসচক্রের অন্যতম চক্রবর্তী। শরৎচন্দ্র ও কালীদার আগ্রহে এই প্রতিষ্ঠান থেকেই 'রসচক্র' নামে একটি উপন্যাস

বের হয়। এই উপন্যাসের বারোটি অধ্যায় বারোজন সাহিত্যিক লেখেন। প্রথম অধ্যায়টি লেখেন শরৎচন্দ্র। আমিও একটি অধ্যায় লিখেছিলাম, সম্পাদনা করেছিলেন কালীদা নিজে। শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রভৃতি খ্যাতিমান লেখকরাও একটি করে অধ্যায় লেখেন। পরবর্ত্তীকালে সেই রসচক্রের কাহিনী অবলম্বনে 'জয়া' নামে একটি চলচ্চিত্র তোলা হয়।

কালীদা পত্রিকা সম্পাদনাও একসময়ে করেন। 'বসুধারা' নামে একটি সাময়িক পত্র তাঁর এবং অধ্যাপক বিশ্বপতি চৌধুরীর সম্পাদনায় কিছুদিন প্রকাশিত হয়েছিল। সে আমলের সকল নবীন লেখকের সেদিন তাতে ছিল অবারিত প্রবেশাধিকার।

কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের বাড়ীতে 'নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন' হয় এই সম্মেলনে আমি ছিলাম অন্যতম সাধারণ সম্পাদক। কালীদা মূল সভাপতি। কাব্যশাখার সভাপতি সজনীকান্ত দাস, ইতিহাস-শাখার সভাপতি প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত ইত্যাদি। কালীদা অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে সমগ্র সভা পরিচালনা করেন।

কালীদা সাহিত্য-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, নিরলস সাহিত্যকর্মী। তাঁর রসগ্রাহিতা অনন্যসাধারণ। কিন্তু যে ব্যবধান থাকলে হিমালয়ের বিশালত্ব উপলব্ধি করা যায়; তা ছিল না আমাদের মধ্যে। একেবারে ঘরোয়া নিতান্তই এক পরিবারস্থ এই রকম একটা ভাব।

গুরুগম্ভী পণ্ডিত ব্যক্তি বলেই লোকে তাঁকে বেশী চিনত, কিন্তু সেই আপাতগাম্ভীর্যের অন্তরালে তিনি যে কিরূপ মজলিসী সমজদার লোক ছিলেন তা অনেকেই জানেন না। সাহিত্যের আসরে, তাঁর বৈঠকখানায় ঢালাও মজলিসে তিনি ছিলেন অত্যন্ত রসিক, বোদ্ধা, সর্বজনশ্রদ্ধেয় অভিভাবক। এই ধরনের সাহিত্যের অভিভাবক তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেল।

সসম্মান শ্রদ্ধার্ঘ

আশাপূর্ণা দেবী

সর্বতোভদ্র সর্বজন শ্রদ্ধেয় কবি, কবিশেখর কালিদাস রায় সম্পর্কে বলবার কথা আছে অনেক, বলবার আগ্রহও রয়েছে অনেকখানি, কিন্তু ভাবনা, এই সামর্থ্য আর সময় দুটোই এসে ঠেকেছে প্রায় শূন্যের কোঠায়। তাই কলম হাতে নিয়ে মনের মধ্যে জমে উঠেছে ব্যথা। কতটুকুই বা লিখবো? কতটুকুই বা বলতে পারবো?

বাংলা সাহিত্যে একটি দীর্ঘ বিস্তৃত ক্ষেত্র জুড়ে তাঁর উপস্থিতি। সেই উপস্থিতি অটল অচঞ্চল শাখাবহুল বটবৃক্ষ সদৃশ। কবিশেখর কালিদাস রায়কে বলা উচিত 'বনেদী সাহিত্যিক'। তাঁর সুদীর্ঘ সাহিত্যজীবনের চিন্তা ভাবনা আদর্শ বক্তব্য সবকিছুই মজবুত বনেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি কখনো 'বাজার' পাবার জন্যে আপন কেন্দ্র থেকে বিচ্যুত হননি, 'চমক' দেবার জন্যে রচনা রীতিতে আকস্মিক কোনো পরিবর্তন সাধন ঘটান নি। নিজস্ব ষ্টাইলে যুগের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলেছেন, আর দান করে চলেছেন চলার পথের অভিজ্ঞতার ফসলগুলি।

সমাজে, রাষ্ট্রে, জাতীয় জীবনে, যখনি যে অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে কবিশেখরের সৃষ্টিকার্যে তখনি তার প্রতিফলন পড়েছে। এই থেকেই বোঝা যায় এই আপাতগম্ভীর স্থির শাশ্বত মানুষটির দৃষ্টি কত তীক্ষ্ণ, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা কত বিস্তৃত, অনুভূতির আধারটি কত গভীর।

কবিশেখরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় আমার প্রায় তাঁর শেষ বয়সে। কিন্তু তাঁর কবিতার সঙ্গে পরিচয় নিজের প্রথম বয়স থেকেই। একদা কোনো সূত্রে কারো কাছ থেকে তাঁর দুখানি কাব্যগ্রন্থ উপহার পাই, পর্ণপুট ও ব্রজবেণু। কবিতা পড়ার মন চিরকালই, তবে তখন ছিল ভাল লেগে যাওয়া কবিতা তৎক্ষণাৎ মুখস্থ করে ফেলার ঝোঁক। উৎসাহভরে বই দুটি থেকে অনেকগুলি কবিতা মুখস্থ করে ফেলেছিলাম।

দুঃখের বিষয় এখন সেই ভাল লাগার স্মৃতিটুকু ছাড়া আর কিছুই মনে নেই। এ দুটিও কালের প্রবাহে ভেসে গেছে। আজকাল মনে করতে পারার উপায় নেই কোন কবিতাগুলি বেশী ভাল লেগেছিল, শুধু অবিস্মরণীয় দুটি ছত্র মনের মধ্যে ঝঙ্কৃত হচ্ছে 'নন্দপুর চন্দ্রবিনা বৃন্দাবন অন্ধকার, চলেনা চল মলয়ানিল বহিয়া ফুলগন্ধভার।'

বক্তব্যে অবিস্মরণীয় তাঁর 'ছাত্রধারা' কবিতাটিও।

'ছাত্রধারা'য় একজন দরদী চিত্ত শিক্ষকের শিক্ষকজীবনের আনন্দ এবং বেদনার যে গভীর স্পর্শ পাওয়া যায়, তা পাঠকের চেতনাকে আবিষ্ট করে তোলে। শুধু এই কবিতাটিই নয় কবিশেখরের রচনামাত্রই ভাষার সারল্যে এবং প্রকাশভঙ্গীর অনাড়ম্বর আয়োজনে একেবারে মনের মধ্যে এসে পৌঁছে যায়।

তিনি অল্প বয়স থেকেই কবিতা লিখতে শুরু করেন, এবং শিক্ষকতাও শুরু করেন। শিক্ষক জীবনে তাঁর অনবদ্য স্বাক্ষর রেখেছেন ছাত্রদের হৃদয়ে। সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন নিজেকে। কিন্তু স্কুল মাষ্টারের নীরস জীবন তাঁর কবিসত্তাকে ব্যাহত করতে পারেনি, লিখে গেছেন অব্যাহত ধারায়; অক্লান্তভাবে। সে সত্তা বহুশাখায় স্বাক্ষর রেখে রেখে বাংলা সাহিত্য ভাণ্ডারকে পুষ্ট করেছে। গল্পে প্রবন্ধে, সমালোচনা সাহিত্যে, সাংবাদিকতায় রম্যরচনায় সর্বত্রই তাঁর কিছু না কিছু অবদানের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

যদিও কবিশেখরের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় প্রায় তাঁর শেষ জীবনে, তথাপি তাঁর নিকট থেকে স্নেহ ও স্বীকৃতি পেয়েছি যথেষ্ট। যখনি তাঁর বাড়িতে গেছি, শুধু একা তাঁরই নয়, বাড়ির সকলের কাছ থেকেই পেয়েছি সেই সমাদর। তাঁর সহধর্মিণী আমাদের পরম পূজনীয়া শ্রীমতী সুকৃতি দেবীর মধুর ব্যবহার ও অপর্যাপ্ত স্নেহ কোনদিনই ভুলবার নয়। এমন গৃহিণী পেয়েছিলেন বলেই তিনি অমন সাহিত্যসৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আমার পরম ভাগ্য তিনি তাঁর একখানি গ্রন্থ (রঙ্গচিত্র) আমাকে উৎসর্গ করেছিলেন।

এই গ্রন্থে তিনি আমাদের সামাজিক জীবনের নানাদিকে আলো ফেলে ফেলে দেখিয়েছেন জীবনের অনাচার, অসঙ্গতি, দুর্বলতা এবং দুরবস্থাও। মনুষ্যচরিত্রের বহুদিকও উদ্‌ঘাটিত করে দেখিয়েছেন ছোট ছোট রেখায় সামান্য সামান্য তুলির টানে। সবকিছু অনাচার অসঙ্গতি হাস্যকর দুর্বলতা ইত্যাদির উপর কষাঘাতই করেছেন, কিন্তু ভাষার সরসতায় এবং দরদী চিত্তের স্পর্শে তীক্ষ্ণতা তিক্ততায় গিয়ে পৌঁছায়নি। 'রঙ্গচিত্র' তাই রঙ্গ চিত্রই, ব্যঙ্গ তিক্ত তীব্র স্বাদবাহী নয়। এগুলি পড়ার সময়ে পাঠককে হাসায় এবং পড়ার পরে ভাবায়। এদের মধ্যে 'বৃদ্ধচরিত্র' 'কবিযশপ্রার্থী', 'নারী শক্তির সীমা', 'তোষামোদ', 'একখানি পোষ্টকার্ড', 'যুগের সঙ্গে সন্ধি' এগুলি চিরন্তন সামাজিক চিত্র, মানবচরিত্রের যে নিগূঢ় তত্ত্ব এগুলির মধ্যে রয়েছে তা যে কোনো যুগে যে কোনো সমাজে প্রযোজ্য।

কবিশেখরের সমগ্র রচনাসম্ভার একত্রে প্রকাশিত হয়েছে কিনা আমার জানা নেই, যদি তা না হয়ে থাকে তো তাঁর জন্মোৎসবের প্রধান করণীয়ই হওয়া উচিত, রচনাবলী প্রকাশের আয়োজন।

যদিও তীব্র গতিবেগসম্পন্ন যুগের ধর্মই হচ্ছে ফেলতে ফেলতে, আর হারাতে হারাতে ছুটে এগিয়ে চলা, তবু মাঝে মাঝে তাকে দাঁড়াতে হয়, পিছে ফিরে তাকিয়ে হিসেব করতে হয়, সঞ্চয়ের খাতায় জমার অঙ্ক বসাতে হয়। এ না করলে ভবিষ্যৎ যুগ এ যুগকে অকৃতজ্ঞ বলে নিন্দা করবে, ইতিহাসের ধারা খুঁজতে অন্ধকার শূন্যে হাতড়াবে। আমরা যখন আমাদের পূর্বসূরীদের শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করি আমরাই পবিত্র হই, স্মরণ মনন আলোচনায় আমরাই লাভবান হই, আর ভুলে যাওয়া আনন্দ স্বাদকে নতুন করে উপভোগ করবার আনন্দ পাই। আর পাই সকলের সঙ্গে একত্র হয়ে শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা জানাবার সুযোগ।

কবিশেখরের তিরোধানে

দিনেশ দাস

"অনেকদিন দেখিনি, দিনেশকে একদিন দেখা করতে বলো।" কবিশেখর কালিদাস রায়ের তিরোধানের সঙ্গে এ ধরণের মমতা-মাখানো কথা বলার লোক দু'এক জন ছাড়া আর বোধ হয় রইল না। সেই দেখা হ'ল তবে অন্যরূপে—কবি তাঁর প্রিয়তম 'সন্ধ্যার কুলায়' ভবনে অন্তিম শয্যায় শায়িত। লোকান্তরিত হয়েছেন আগের দিন শনিবার ২৫ শে অক্টোবর রাত্রি প্রায় পৌনে এগারোটায়।

কতদিন পূর্বে কবিশেখরের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল, সেই অতীতের কথা আমার ঠিক স্মরণে নেই। মনে হয়, তখন তিনি স্কুল থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন একটানা ৩৯ বৎসর শিক্ষকতা করার পর-সেই ১৯৫২ সালে। তবে এটুকু স্মরণে আছে, প্রথম আলাপের দিন থেকেই তিনি আমাকে একেবারে কাছের মানুষ ক'রে নিয়েছিলেন। এই প্রাণময় সহজ মানুষটির সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় থাকার জন্যেই বোধ হয় তাঁর কাব্যকে আত্মস্থ করা আমার পক্ষে সহজ হয়েছে, কারণ কবির জীবন যেমন তাঁর কাব্যে প্রকাশিত, তার কাব্যও তেমনি অনেক সময় তাঁর জীবনের মধ্যে রূপায়িত। তাই কবিজীবন ও কাব্যজীবনকে একসূত্রে গেঁথে দেখতে পারলে বিচার প্রায় নির্ভুল হয়।

কবি কালিদাস রায়ের অমায়িক ব্যবহার ও প্রাণখোলা হাসির মধ্যে তাঁর কাব্যলোকের সাদামাটা সরল মানুষগুলোর পরিচয় পাওয়া যায়। এমন কি তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'বৃন্দাবন অন্ধকার' পড়ে মনে হয়, আমাদের গ্রাম-বাংলাই যেন কবির কাছে 'নন্দপুর চন্দ্রের বৃন্দাবন'। কবি যেন সেই গ্রাম-বৃন্দাবন থেকে সহরের মথুরানগরে নির্বাসিত। 'ত্রিবন্ধ' কবিতাটিও তাঁর বৈষ্ণবসাধনার তুলসীমঞ্চ। নিত্য-ব্রজলীলা তাঁর শিরা-উপশিরার মধ্যে প্রবাহিত। এর কারণও বর্তমান। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পদকর্তা ও চৈতন্যমঙ্গল রচয়িতা লোচনদাস ঠাকুরের বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কবিশেখর এবং বৈষ্ণব কবি উদ্ধব দাসের আবির্ভাব তাঁর মাতৃকুলে। তাই বৈষ্ণব ভাবধারায় কবি জন্মসিদ্ধ। লোচনদাসের বিখ্যাত পদ —

> "যারে দেখে তারে বলে দন্তে তৃণ ধরি'
> আমারে কিনিয়া লহ, বল গৌরহরি।"

পাঠ ক'রে আধুনিক যুগের খ্যাতনামা লেখক ক্রিষ্টোফার ইসারউড বলেছেন, "গুরুর প্রতি এরূপ অন্তহীন ভালবাসা পৃথিবীতে বিরল।"

কবি কালিদাস রায় জন্মগ্রহণ করেন ১৮৮৯ সালে বর্ধমান জেলার কড়ুই গ্রামে। পিতা যোগেন্দ্র নারায়ণ রায় ছিলেন কাশিমবাজার রাজ এষ্টেটের পদস্থ কর্মচারী। বিশ শতকের প্রথম

থেকেই তিনি কাব্য রচনা আরম্ভ করেন। ক্রমশ সেগুলি কাব্যগ্রন্থের আকারে প্রকাশিত হয় এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ও পরবর্তী কালে। পর্ণপুট, খুঁদকুড়া, হৈমন্তী, বৈকালী, ব্রজবেণু, সন্ধ্যামণি প্রভৃতি তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। যে সময়ে তিনি কাব্যসাধনা আরম্ভ করেন, রবীন্দ্রনাথ তখন বাংলা সাহিত্যের মধ্যাহ্ন-আকাশে ভাস্বর। রবীন্দ্রকাব্যের উদ্ভাসিত আলোকের মধ্যেও করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, যতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রমুখ যে কয়জন কবি বাংলা কাব্যে স্ব-প্রতিভার স্নিগ্ধ আলোক বিকীরণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, কবি কালিদাস রায় সেই তারকাপুঞ্জের শেষ নক্ষত্র।

আমাদের দেশে বার্ধক্যে একেবারে স্থবির হয়ে না পড়লে অথবা বৈতরণীর তীরে এসে না পৌঁছোলে দু'একজন সৌভাগ্যবান ছাড়া অনেকের ভাগ্যেই পুরস্কার জোটে না। কবিশেখরের ক্ষেত্রেও তার বিশেষ ব্যতিক্রম হয়নি। ১৩৬৮ সালে অর্থাৎ ৭৯ বৎসর বয়সে তিনি তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'পূর্ণাহুতি'র জন্যে রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত হন।

রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্তির পর দেখা হ'ল। এই ঘটনার ক'মাস আগে তাঁর সহধর্মিনী লোকান্তরিত হয়েছেন। তাই আনন্দের পরিবর্তে অশ্রুসজল কণ্ঠে বললেন, "দ্যাখো, দিনেশ এই পুরস্কারের কথা শুনলে উনি কত খুশি হতেন।" কী সরল, কী সহজ মানুষটি! সেই জন্যেই বলছিলুম যে, কবি-জীবনের সঙ্গে পরিচয় থাকলে কাব্যজীবন বোঝা সহজ হয়।

অনেক দিন আগেকার কথা। সম্ভবতঃ ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় তখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। কংগ্রেসের এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কবিশেখরকে সম্বর্ধিত করা হয়েছিল। সেখানে তাঁর দীর্ঘ ভাষণের এক জায়গায় বলেছিলেন, "লক্ষ্মীর উপাসনা করতে গিয়ে তার সারস্বত সাধনায় বিঘ্ন ঘটেছে।" মনে হয়, সারাজীবন শিক্ষকতা ক'রে, বহু পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন ক'রে, বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র রচনা ও অজস্র উত্তর-পত্র প্রভৃতি দেখার জন্যে হয়তো কাব্য সরস্বতীর সাধনা তাঁর মতে ঠিক মত হয়নি। কিন্তু একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়, কালিদাসবাবুর সারস্বত সাধনার ফলশ্রুতি নিতান্ত অল্প নয়। বাংলা সাহিত্যকে শ্রীমণ্ডিত করার জন্যে কি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন সারাজীবন। বার্ধক্য, ব্যাধি তাঁকে নিরস্ত করতে পারেনি—৮৭ বছর বয়স পর্যন্ত।

একথা সত্য যে বাংলা কবিতার যথার্থ পালাবদল হয়েছে তিরিশের দশকে। তবু বহুদিন পূর্বে একবার কবিশেখরকে প্রশ্ন করেছিলুম, "সাহিত্যের অধ্যাপক, ডাক্তার ও সমালোচকেরা আপনাকে এবং আপনার সমসাময়িক কুমুদরঞ্জন, করুণানিধান, যতীন্দ্রমোহন, প্রমুখদের "রবীন্দ্রানুসারী কবি" বলে চিহ্নিত করেছেন, আর তা সকলেই এক প্রকার মেনেও নিয়েছেন—এ বিষয়ে আপনার অভিমত শুনতে চাই।" কবিশেখর বললেন, "ছাখো, রবীন্দ্রনাথ একজন যুগন্ধর কবি। তাঁকে হুবহু অনুসরণ করা অসম্ভব। তোমরা যেমন তাঁকে যথাযথ অনুসরণ করনি, আমরাও করিনি। আমাদের রচনায় তাঁর প্রভাব এসে থাকলেও আমাদের মূল কিন্তু দেশের মাটিতে, বাংলার প্রাচীন কবিদের মধ্যে।" তথাকথিত এই রবীন্দ্রানুসারী কবিরাই যে বাংলার গ্রামগুলিকে তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করেছেন এটি বিশদভাবে জানতে চেয়েছিলুম তাঁর কাছে। কারণ তিনি শুধু একজন স্বনামধন্য কবি ন'ন, কবিশেখর একজন মহাপণ্ডিত ব্যক্তি। বাংলার প্রাচীন সংস্কৃতি ও ইতিহাস সব তাঁর নখদর্পণে। কিন্তু এই আলোচনায় হঠাৎ ছেদ পড়ল কবির একজন প্রাক্তন ছাত্রের আবির্ভাবে। তিনি এই ব্যক্তিটির সঙ্গে

অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করি যে, কবিশিক্ষক অত্যন্ত ছাত্রবৎসল ছিলেন। অগণিত ছাত্রদের কাছ থেকে পেয়েছিলেন অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। সেদিন আবার নতুন ক'রে তাঁর সেই বহুপরিচিত কবিতা 'ছাত্রধারা'র ছত্র দুটি মনে পড়ল :

"এ জীবন ভেঙে গ'ড়ে শ্যামল সরস ক'রে
ছাত্রধারা বয়ে চ'লে যায়।
ফেনিলতা উচ্ছলতা হয়ে যায় তুচ্ছ কথা
কলরব সকলি মিলায়।"

একদিন বিকেলে টালিগঞ্জে তাঁর "সন্ধ্যার কুলায়" বাসভবনে গিয়েছিলুম। কবিশেখর নীচের তলায় তাঁর বাইরের ঘরেই বসেছিলেন সেই তক্ত-পোষের ওপর। পাশেই বসলুম। তাঁকে কেমন যেন ম্লান, বিষণ্ণ ব'লে মনে হ'ল। কারণ জিজ্ঞেস করাতে বললেন, "দেখেছ দিনেশ, কীভাবে আমাকে অপমান করেছে।" বুঝলুম, তিনি একটি নামকরা সাহিত্যপত্রের একজন খ্যাতনামা কবির সমালোচনার প্রতি ইঙ্গিত করছেন। (সে কবিও এখন লোকান্তরিত)। উত্তরে বললুম, "হ্যাঁ দেখেছি, তবে বর্ষীয়ান কবির ওটি তাঁর ব্যক্তিগত মত হিসেবে ধ'রে নেবেন।"

কালিদাসবাবুর বিষণ্ণ ভাব তবু কাটল না। তাঁর কথার জের টেনে বললেন, "আধুনিক কাব্যজগৎ থেকে আমাকে অনেক দিনই বাদ দেওয়া হয়েছে তা আমি জানি। তাব'লে"—কবিকণ্ঠ খুবই করুণ শোনাল। বলেছিলুম, 'ওসব আবোল-তাবোল কথায় কান দেবেন না। বাংলার পল্লীপ্রকৃতি ও পল্লীজীবনের আনন্দ ও বেদনা আপনাদের মত আধুনিক কবিরা প্রকাশ করতে পেরেছেন কি? গ্রাম-বাংলার কুটীরগুলো আপনাদের কলমে মঠ-মন্দিরে পরিণত হয়েছে। তা ছাড়া আপনার মত মৌলিক গদ্যসাহিত্য ক'জন রচনা করেছেন। আমার তো মনে হয়, সব মিলে-মিশে কবিশেখর বাংলা সাহিত্যের আসরে একটি মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত।" উনি আর কোনও কথা বলেন নি। শুধু স্নেহভরে তাঁর একটি হাত আমার পিঠের ওপরে রেখেছিলেন।

বাস্তবিক, আমরা এক অদ্ভুত যুগের বাসিন্দা। একালে পরিচিত নামগুলি ক্রমশ হারিয়ে যায় আর অচেনা নাম কোথা থেকে লাফ দিয়ে ওঠে। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে কবিশেখর কালিদাস রায় ও তাঁর সমসাময়িকেরা কাব্যসাধনায় সিদ্ধ হ'যে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তাঁদের এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া চলে না। মনে হয়, কালিদাসবাবু ও তাঁর সমসাময়িকদের কাব্য ছিল নিম্নগ্রামে বা নীচু পর্দায় বাঁধা। পরবর্তী যুগের সরব সাহিত্যের পাশে এঁদের কাব্য নীরব বলেই মনে হয়।—একালের সরব কবিতার পাশে সে-যুগের নীরব কবিতার আত্মগোপন।

এখনও কবিশেখরের ভক্ত ও অনুরাগীর সংখ্যা কম, তা কেমন ক'রে বলি। কয়েক বছর আগে কবির জন্মজয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল কবিগৃহে। অসংখ্য গণ্যমান্য কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, গায়ক ও শিল্পীর সমাবেশে তাঁর গৃহে তিলধারণের ঠাঁই ছিল না। পৌরোহিত্য করেছিলেন আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। কবির দৃষ্টিশক্তি তখন স্তিমিত। প্রণাম করার পর যখন বললুম, আমি এসেছি। ঠিকমত দেখতে না পেলেও কণ্ঠস্বরে ঠিকই চিনলেন, "দিনেশ এলে, ভাল আছ তো?" মমতার মাখনে-মাখা সেই পরিচিত মধুর সম্ভাষণ। এভাবে ডাকবার লোক বোধ হয় আমার জীবনে দু'একজন ছাড়া আর বিশেষ কেউ রইল না। (ক'লকাতা বেতারে পঠিত)

প্রাচীন বট

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

উনিশশো তেতাল্লিশ সাল। দিন দশেক আগে বিয়ে হয়েছে। তবে দিনে রাতে পৃথিবী জ্যোৎস্নাস্নাত দেখছি মনের এমন অবস্থা নয়। অল্প বয়সে অফিসের গুরুদায়িত্ব কাঁধে।

সাহিত্যের নেশা ছেলেবেলা থেকেই ছিল। বিয়ের উপহার স্বরূপ যে বইগুলো পেয়েছিলাম, মাঝে মাঝে সেগুলো নিয়ে ট্রামে বেড়াই আর পডাব চেষ্টা কবি।

এক শীতের বিকালে ট্রামে বসে 'বৈকালী' পড়ছি, হঠাৎ পাশে গুরুগম্ভীর কণ্ঠ। কবিতাগুলো আপনার কেমন লাগছে?

চমকে ফিরে দেখলাম দীর্ঘকায় একজন ভদ্রলোক, বিরলকেশ, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্যাটার্ণের গোঁফ, হাতে কাপড়ের থলি।

দেখা মাত্র চিনতে পারলাম।

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়। বাঙালী শিক্ষিতসমাজে যাঁর ভূমিকা নিষ্প্রয়োজন। আমরা এক গলির বাসিন্দা কিন্তু তাঁর সঙ্গে আলাপ হবার সুযোগ এবং সাহস কোনটাই হয়নি।

সাহিত্যজগতে আমার তখন কোন পরিচয় নেই। গোটা কয়েক কবিতা আর চার পাঁচটি গল্প সম্বল।

কবিতাগুলো কেমন লাগছে তার উত্তরে ট্রামের মধ্যেই কবিশেখরকে প্রণাম করলাম। সবিনয়ে বললাম, আমাকে আপনি নয়, তুমি বলবেন।

থাক, থাক, তুমি থাক কোথায়?

কোথায় থাকি বললাম।

সবিস্ময়ে বললেন, আরে, আমার বাড়ীর কয়েকটা বাড়ীর পরেই তো থাক। ওই নতুন তিনতলা বাড়ীটা? একদিন সময় করে এস। অনেকে আসেন।

সেদিন এই পর্যন্ত।

আমন্ত্রণ সত্ত্বেও যেতে পারিনি। জানতাম সাহিত্যের দিকপালরা কবিশেখরের বাড়ী আসেন।

সাহিত্য নিয়ে বিতর্ক আলোচনা চলে।

সে আসরে যেতে আমার সাহস হয় নি।

আশ্চর্য কাণ্ড। কিছুদিন পর কলিং বেল বেজে উঠল। ওপর থেকে উঁকি দিয়ে দেখি স্বয়ং কবিশেখর দাঁড়িয়ে।

দ্রুতপায়ে নীচে গিয়ে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এলাম।

বললাম, আপনি!

সহাস্যবদনে বললেন, তুমি তো আর এলে না হে। তাই আমি এলাম।

লজ্জায় মাথা তুলতে পারলাম না।

তুমি একটা কথা তো বলনি।

কি বলিনি?

তুমি গল্প লেখ তাতো বলনি।

সর্বনাশ, এ খবর কবিশেখর পেলেন কোথা থেকে?

তিনি বলতে লাগলেন, এ মাসের 'অলকা'য় তোমার একটা গল্প পড়লাম, 'আঘাত'। বেশ লাগল, মানে ভালই। তুমি আমার ওখানে মাঝে মাঝে আসবে। অনেক কথাসাহিত্যিক আসেন। তাঁরা যে সব-আলোচনা করেন, তাতে তোমার অনেক লাভ হবে।

সেদিন অনেকক্ষণ তিনি ছিলেন। কথাবার্তায় এমন ভাব দেখালেন যেন আমার সঙ্গে তিনি এক আত্মীয়তার বন্ধনে বাঁধা।

যে পথে আমি মাত্র যাত্রা শুরু করেছি, সে পথের প্রান্তে কবিশেখর, মধ্যে দুস্তর ব্যবধান, কিন্তু প্রীতির হাত বাড়িয়ে সে ব্যবধান তিনি উপেক্ষা করলেন।

তারপর নিয়মিত তাঁর বাড়ীর আসরে যোগ দিয়েছি। এমনও হয়েছে তিনি তাঁর কোন ছেলেকে দিয়ে আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

বিদগ্ধজনের সেই আসরে বসে বিস্মিত হয়ে শুনেছি, ছন্দ সম্বন্ধে তাঁর অগাধ জ্ঞান, বৈষ্ণব কবিদের রচনা থেকে অনায়াস-উদ্ধৃতি, রসবিচার। তাঁর নীতি ছিল বর্জন নয়, গ্রহণ। তাই আধুনিকতম নিন্দিত লেখকদের রচনাও তিনি শ্রদ্ধা সহকারে পড়তেন।

তারপরে আমার প্রথম উপন্যাস ইরাবতী প্রকাশিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্য-জগতে কিছু খ্যাতি অর্জন করেছি। নানা পত্রিকা থেকে লেখার আমন্ত্রণ পাচ্ছি।

এতে আমার চেয়েও কবিশেখর যেন আরও খুশী।

বারবার আমাকে সাবধান করে দিতেন, হরিনারায়ণ ভারসাম্য হারিও না। আজ এরা তোমার কাছে আসছে, লেখা পড়ে গেলে কেউ ফিরেও দেখবে না। মনে রেখ।

তারপর আরও অন্তরঙ্গ হবার সুযোগ এসেছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার একদল সাহিত্যসেবীকে ও সাংবাদিককে দামোদর পরিকল্পনা দেখার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সে দলে কবিশেখরের সঙ্গে আমিও ছিলাম। মাননীয়া বৌদি আমাকে বিশেষ করে বলে দিয়েছিলেন যে পথে আমি যেন কবিশেখরের প্রতি নজর রাখি। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলাম তাঁর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখতে।

অবশ্য তার আর কোন প্রয়োজন হয় নি। সেচমন্ত্রী মাননীয় অজয় মুখোপাধ্যায় থেকে শুরু করে অন্যান্য অফিসাররা ত্রুটিহীন সেবা করেছেন। কারও কোনরকম নালিশ জানাবার অবকাসই ঘটে নি।

কিছুদিন পর কলকাতা বেতার থেকে বাণীবন্দনার এক আয়োজন করা হ'ল। শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, এবং আমি অংশ গ্রহণের জন্য মনোনীত হ'লাম। ঠিক স্মরণ নেই, প্রবোধদা বোধহয় রবীন্দ্রনাথ থেকে, বীরেনদা করুণানিধান থেকে কবিতা আবৃত্তি করবেন। আমি ঠিক করলাম কবিশেখরের কবিতা থেকে আবৃত্তি করব।

তিনি মহাখুশী হয়ে আমাকে কবিতা বেছে দিলেন। তারপর বেতারে আবৃত্তি শুনে তারিফ করলেন।

অমায়িক, সাহিত্যপ্রাণ, পরহিতব্রতী এই মানুষটির রসবোধ তুলনা রহিত।

দুজনে এক সভায় গিয়েছি। সেখানে এক অতি আধুনিক লেখকের দাপটে সবাই অস্থির কবিশেখর জিজ্ঞাসা করলেন, কে হে লোকটি?

আমি চাপা গলায় লোকটির পরিচয় দিয়ে বললাম, লোকটি জনপ্রিয় লেখক।

কবিশেখর কিছু বললেন না। কিছুক্ষণ পরে তাঁর লেখা একটি চিরকুট আমার হাতের কাছে এল। ভাগ্যক্রমে চিরকুটটি এখনও আমার কাছে আছে।

তাতে লেখা: ভাই হরিনারায়ণ,

বোকায় ভরা খোকায় ভরা দেশটা
নয়ক তাদের ভুলানো খুব শক্ত,
লেখায় আঁকায় যে করে তার চেষ্টা
সে পায় বহু টাকা এবং ভক্ত॥

শরৎচন্দ্রের জীবনের ছোট ছোট ঘটনাগুলো যাঁরা কবিশেখরের মুখ থেকে শুনেছেন, তাঁরা জানেন গল্প বলায় কি ঐন্দ্রজালিকী শক্তি তাঁর করায়ত্ত।

আনন্দবাজার পত্রিকায় মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনের আলেখ্য সপ্তাহের পর সপ্তাহ পাঠকসমাজ পড়বার জন্ত আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করতেন। খুব সহজ অনাড়ম্বর ভাষায় গভীর তত্ত্বের মর্মস্থল স্পর্শ করার দুরূহ কৃতিত্বে কবিশেখর অদ্বিতীয় ছিলেন।

যে পাড়ায় আমাদের বাস, তার অধিবাসীবৃন্দ সম্বর্ধনা দেওয়ার একটা রেওয়াজ প্রবর্তন করলেন। স্বাভাবিকভাবেই প্রথম সম্বর্ধনা দেওয়া হ'ল, কবিশেখরকে।

তিনি অসুস্থ ছিলেন, তাই তাঁর পক্ষে সভায় আসা সম্ভব হয়নি। আমরা তাঁর বাড়ীতে গিয়ে তাঁকে সম্বর্ধিত করে নিজেরা কৃতার্থ হয়েছিলাম।

স্ত্রীবিয়োগের পরই তাঁর শরীর ভেঙে পড়েছিল। প্রায়ই অসুস্থ হ'য়ে পড়তেন। মাঝে মাঝে উঠতেন। লেখণী চালনার বিরতি ছিল না।

তারপর বেশী অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আর উঠতে পারলেন না।

তখনও সাহিত্যিকরা, শিক্ষাব্রতীর দল তাঁকে ঘিরে বসে থাকতেন। তাঁদের অনেক প্রশ্নের তিনি নিরসন করে দিতেন, সমস্তার সমাধান।

কবিশেখর এক বিরাট বটবৃক্ষের প্রতীক। শুধু ছায়াদানই নয়, তাঁর শাখা প্রশাখায় অজস্র পাখীর আস্তানা, কোঠরে অন্ত প্রাণীর আবাসভূমি।

আমার 'ক্লান্তবিহঙ্গী' বইটি কবিশেখরকে উৎসর্গ করেছিলাম। অগ্রজ সাহিত্যিককে আর আমি কিই বা দিতে পারি?

সারাজীবন যাঁর সাহিত্যের প্রতি উৎসর্গীকৃত সেই বিরাট বনস্পতিকে এই সুযোগে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা জানালাম।

সাহিত্য অমর, কৃতী সাহিত্যিকও তাই।

যেন সেদিনের কথা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

চোখ বুজে ভাবলে মনে হয় এই সেদিনের কথা। কিন্তু ছত্তিরিশ সাঁইতিরিশটা বছর কেটে গেছে। আমার বয়েস তখন কুড়ি কি একুশ। থাকি ভবানীপুরে। তিনি থাকেন চারু এভিনিউতে তাঁর সেই সন্ধ্যার কুলায়ে। খুব দূরের পথ নয়। কিন্তু দূর থেকে 'ছাত্রধারা'র গম্ভীর কবিকে দেখে মনে হত দূরের মানুষ। ইচ্ছে ষোল আনা, কিন্তু ভরসা করে কাছে যেতে পারিনি।

আমার ইচ্ছের দুটো কারণ। প্রথম যাঁর এত কবিতা পড়েছি, ভাব আর সুন্দরের তন্ময়তার জগতে যাঁর বাস, তাঁকে কাছ থেকে দেখব জানব বুঝব। বাহরের এই গাম্ভীর্যে মোড়া মূর্তিটি তাঁর সত্যিকারের চেহারা হতে পারে না। আর ইচ্ছের দ্বিতীয় কারণ, প্রবীণ লেখকরা তো বটেই, অনেক আনকোরা নবীন লেখকরাও নাকি লেখা নিয়ে বা বই নিয়ে তাঁর দোরে হানা দেয়। নতুন লেখক বলে হেলা ফেলা করেন না—লেখা দেখে দেন, ছাপা বই হলে মতামত দেন। এ ব্যাপারে নাকি তাঁর ক্লান্তি নেই, দরদেরও অভাব নেই। এদিকে আমার তখন লেখার জগতে হাতেখড়ি চলেছে। নিজে লিখি। নিজে পড়ি। চা ডালমুট খাওয়ানোর লোভ দেখিয়ে অন্তরঙ্গ দুই-একজন বন্ধু বা বন্ধুস্থানীয়কে ধরে বেঁধে এনে বসিয়ে লেখা শোনাই। তারা ভালো বলুক বা মন্দ বলুক, লেখা আদৌ দাঁড়াল কিনা, সে সংশয় থেকেই যেত। ভিতরে ভিতরে তেমন কাউকে লেখা দেখানো, বা পড়ানোর বাসনা। তেমন কেউ বলতে লেখার জগতের কোনো নামী জন। কিন্তু কারো সঙ্গে যোগাযোগের একটা সুতোও তখন আমার হাতে নেই।

যে ভদ্রলোকটির মারফত সুযোগ এলো তিনি সম্পর্কে আমার মাষ্টার মশাই। সম্পর্কে বলছি এই কারণে, তাঁর কাছে আমি কখনো পড়িনি। নাম রাইহরণ চক্রবর্তী। তিনিও আজ বেঁচে নেই। কবিতা লেখায় এত উৎসাহ আমি বোধহয় আর কারো দেখিনি। ট্রাম বাসে বসেও তিনি তর তর করে কবিতা লিখে যেতেন। একদিন চুঁচড়ো থেকে কলকাতায় আমাদের বাড়ি এলেন। বললেন, এক্ষুনি বেরুতে হবে কবিশেখর কালিদাস রায়ের বাড়ী। এই ত্যাখো চিঠি, আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

দেখলাম সত্যি তাঁরই লেখা পোষ্ট কার্ড, তলায় নাম স্বাক্ষর। লিখেছেন, তোমার নতুন কবিতার বই পেয়েছি, পড়েও ফেলেছি। একদিন এসো, সাক্ষাতে আলোচনা করব।

নিজের টাকায় একটা কবিতার বই রাইহরণ বাবু অর্থাৎ মাষ্টার মশাই ছাপিয়েছেন জানতাম। আমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলাম, আমাকে নিয়ে যাবেন মাষ্টার মশাই ?

সেই সূচনা।

খবর পেয়ে তিনি দোতলা থেকে নেমে এলেন। আদুড় গা, পরণে খাটো ধুতি, হাতে নস্যির ডিবে। রাইহরণ বাবু পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। আমিও।

এক নজর আমাকে দেখে নিয়ে জিগেস করলেন, এই ছেলেটিকে তো আগে কোনদিন দেখিনি। রাইহরণ বাবু পরিচয় দিলেন। একটু বাড়িয়েই বললেন, অনেকগুলো গল্প টল্প লিখে ফেলেছে লেখার হাত ভালো।

আমার নাম আগেই বলা হয়েছিল। একটু চিন্তা করে নিয়ে কবিশেখর বললেন, পড়েছি বলে তো মনে পড়ছে না—কোন্ কাগজে বেরিয়েছে ?

ভিতরে ভিতরে বেশ মুষড়ে পড়ে জবাবটা আমিই দিলাম। বললাম, এখন পর্যন্ত কোনো কাগজে ছাপা হয়নি।

—ও.......এবারে হাসলেন তিনি। ভারী, সৌম্য মুখের সুন্দর হাসি। উঠতি লেখকের লেখা তো আমি পড়ি, রাইহরণ এমন করে বলল ভাবলাম মিস্ করেছি।

মাষ্টার মশাইয়ের ছাপা কবিতার বইয়েরও যে খুব প্রশংসা করলেন তা নয়। কিন্তু বলার ধরনটা এমন যে একটুও আঘাত লাগে না। একটা মন্তব্য মনে আছে বলেছিলেন, সহজ ভাব সহজ কথায় লিখবে, ভাষার ধোঁয়ায় ভাব হারিয়ে গেলে আর থাকল কি ! কবিতার বইয়ের আলোচনার পর আমাকে বললেন, লিখে যাও, লিখতে লিখতেই লেখা হয়, খুব ধৈর্যের পরীক্ষা।

আমার পকেটে তখন দু'দুটো লেখা গল্প। কিন্তু ভরসা করে তক্ষুনি আর বার করা গেল না। কথায় কথায় অন্য লেখকদের গল্প করতে লাগলেন তিনি। কবি যতীন বাগচীর কথা। আর দু'কান জুড়নোর অনেক গল্প কবিশেখরের শরৎদার সম্পর্কে। সামনে বসে কি দেখেছেন, কি শুনেছেন এইসব।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। যিনি শুধু তখন কেন, আজও স্বপ্নের মানুষ আমার কাছে।

যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াতে উনি বললেন, কাছেই তো থাকো, আবার এসো লেখা থাকলে নিয়ে এসো, পড়ে দেখব'খন।

মুখ চোরা ছেলের মত এবারে পকেট থেকে ছোট গল্প দুটো বার করলাম। দেখে প্রশান্ত মুখে ভরাট হাসি এবার। হাত বাড়িয়ে ও দুটো নিয়ে বললেন, নতুন লেখকের রোগটা ঠিক রপ্ত করে ফেলেছ পকেটে লেখা মজুত। আচ্ছা, পড়ে রাখব, আর একদিন এসো।

বৃহৎ লেখকদের মধ্যে কবিশেখর আমার হাতে লেখা গল্পের প্রথম পাঠক, এ আনন্দ আমার মনে আজও লেগে আছে।

গঙ্গার উপর দিয়ে দিনে দিনে বছরে বছরে অনেক জল গড়িয়েছে তারপর। প্রতাপাদিত্য রোডের বাড়িতে এসে আরো তাঁর কাছাকাছি হয়েছি। অনেক বছর হয়েছে, তিনি রিটায়ার করেছেন। এই অবসর জীবনে স্নেহের পাত্র কাউকে দেখলেই বেজায় খুশি। কিছুদিন না দেখলে অভিমান। তার আগে ব্যস্ত অসুখ বিসুখ হল না তো? নিজেই চলে এলেন বাড়ি। তারপর ছদ্ম রাগ, দেখ তো, ভালই তো আছ তাহলে এতদিনের মধ্যে ওদিক মাড়াওনি কেন?

লজ্জা পেতাম, আবার কি যে ভালো লাগতো। নতুন বই নিয়ে গিয়ে হাজির হলে মহাখুশি। নিজেই তাড়াতাড়ি কলম এগিয়ে দিতেন, লিখে দাও।

মন দিয়ে পড়তেন, তারপর আবার আলোচনা করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন।

আজ জানি এমন প্রীতি এমন দরদ কত দুর্লভ।

তখন আমি যুগান্তরের সাহিত্য শাখার সম্পাদক। দরকার পড়লেই তিন লাইনের চিরকুট পাঠাতাম দাদা অত দিনের মধ্যে ওমুক বিষয়ের ওপর একটা লেখা চাইই। ঠিক পাঠাতেন। সঙ্গে তাঁর চিরকুট। তোমার চাওয়া এমন ঘোড়ায় চেপে আসে কেন, একটু আগে থাকতে জানাতে পারো না?

সেই সব লেখা ছাপার পরে যদি বলতাম, আপনার এ প্রবন্ধটা কিন্তু নীরস লাগল দাদা, ইচ্ছে করলেই আরো ভালো করতে পারতেন।

বলাটা একটুও ধৃষ্টতা ভাবতেন না, বা তর্ক করে বোঝাতেও যেতেন না। তার বদলে ছোট্ট ছেলের মতোই বিমর্ষ আর চিন্তাচ্ছন্ন মুখ। বলতেন, কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে তাহলে। আমি আর একবার পড়ে দেখব।

আর যখন বলতাম, আপনার ওমুক লেখাটা চমৎকার হয়েছে দাদা—সে এক দেখবার মতো খুশি ভরা মুখ। যেন সেই ছোট্ট ছেলে ভারী লোভনীয় একটা কিছু হাতের নাগালে পেয়ে গেল।

হ্যাঁ এই আমার দাদা কবিশেখর কালিদাস রায়। যত বড়, তত নিরহঙ্কার। আত্মা আছে কি নেই আমি জানি না। কিন্তু ভাবতে ভালো লাগছে—আছে। ভাবতে ভালো লাগছে, কোথাও তিনি আছেন, কোথাও কোন অলক্ষ্যে বসে এই মুহূর্তে তিনি দেখছেন আমি কি করছি। হাসছেন, অল্প অল্প যেমন হাসতেন। আর অনুভবে শোনা যায় এমন স্বরে যেন বলছেন, বোকা ছেলে, তোমার দুচোখ ঝাপসা কেন? তোমাদের ছেড়ে আমি কত আর দূরে গেছি!

সেই তিনি

রমাপদ চৌধুরী

বাংলা দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের মতই কবিশেখরের সঙ্গে আমারও প্রথম পরিচয় স্কুলপাঠ্য কবিতার মাধ্যমে। ব্যক্তিগত পরিচয় সম্ভবত এই 'মাধ্যম' শব্দটিকে নিয়েই। আজকাল আমরা এই শব্দটির আলিঙ্গন পরিধি অনেক বেশি উদার করে নিয়েছি। যেখানে 'মধ্যবর্তিতা' শব্দটিই সুপ্রয়োগ সেখানেও 'মাধ্যম' শব্দ ব্যবহার করে বসি। যদ্দূর মনে পড়ছে, কোন এক বিখ্যাত অধ্যাপকের রচনায় এই ধরনের অপব্যবহার দেখে কালিদাস রায় নামক সেই শ্রদ্ধেয় ইস্কুলের শিক্ষক (তখন অবস লুপ্ত) কিঞ্চিৎ নির্মল রসিকতা করেছিলেন। আমার মত এক অবিনয়ী, তৎকালে উদীয়মান সাহিত্যিককেও কিন্তু তাঁর সেই মন্তব্যে উপযুক্ত গুরুত্ব দিতে হয়েছিল। কারণ, কালিদাস রায় ছিলেন ব্যক্তিত্বের ইতিহাসে এক বিরলতম ব্যতিক্রম। আজকালই নয়, বর্তমান শতকের গোড়া থেকেই সমাজজীবনে একটা বিচিত্র পরিবর্তন ঘটে চলেছে। ব্যক্তিত্ব বলতে তখন বোঝায় চেহারার এবং বা পোশাকের চাকচিক্য, ডিগ্রিটিগ্রির দৈর্ঘ্য, অত্যন্ত উঁচুদরের পদমর্যাদা, বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ার, সাহেব পণ্ডিতদের সঙ্গে যোগাযোগ, ইংরেজী বলা কওয়া এবং সে ভাষায় লেখার করিতকর্মতা। কিন্তু কালিদাস রায়ের ব্যক্তিত্বে এসবের কিছুই প্রায় ছিল না। তিনি তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন না, বৃত্তিতেও ছিলেন একজন শিক্ষক। অথচ তাঁর মধ্যে এমন এক অসামান্যতা ছিল যে তাঁর মতামতকে বাঙালী বুদ্ধিজীবী মহলের শীর্ষস্থানীয়রাও গুরুত্ব দিতে বাধ্য হতেন, অনেকক্ষেত্রেই মাথা নত করে তাঁরা তা স্বীকার করেও নিতেন। একালে এমনটি আর সম্ভব নয় আমরা জানি, কিন্তু সেকালেই বা সম্ভব হয়েছিল কেন? এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তরের মধ্যেই কবিশেখরের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বাংলা ভাষা নিয়ে চর্চা করে গেছেন বহু সাহিত্যিক, অধ্যাপক, বৈয়াকরণিক, গবেষক। বিশুদ্ধ বাংলা ভাষা চিনতেন একজনই। তিনি কবিশেখর। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করলে জানা যেত তাঁর পাণ্ডিত্য কত গভীর এবং তাঁর ব্যাকরণপারদর্শিতা সত্ত্বেও যুক্তির কাছে তিনি কতখানি উদার। 'মাধ্যম' শব্দটির সূত্রেই মধ্যিম, মদ্ঝিম ইত্যাদি হয়ে 'মাঝি' শব্দটিতে গিয়ে পৌঁছেছিলাম সেদিন। নদীর দুই তীরের মধ্যে পারাপার ঘটানোর কৃতিত্ব বা দায়িত্ব যার তাকে যেমন মাঝি বলা হয়, তেমনই সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রতিনিধি বলতেও 'মাঝি' শব্দের প্রয়োগ ছিল। সাঁওতালদের মধ্যেও সম্ভবত গোষ্ঠীর মুখ্যব্যক্তিকেই মাঝি বলা হ'ত। এই জাতীয় নানা কথা তাঁকে শুনিয়েছিলাম। সেই বিখ্যাত অধ্যাপকের শব্দের অপপ্রয়োগের অভিযোগ খণ্ডনের জন্যে অবশ্যই নয়, সম্ভবত নিজের পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের জন্যে। কবিশেখর ধৈর্য্য সহকারে সবই শুনলেন,

তারপর সহাস্যে বললেন, তোমার যুক্তিটুক্তি শুনতে ভাল, শব্দের অর্থ বদলায়, কালক্রমে তা আরো অনেক অর্থ আত্মসাৎ করে বসে ঠিকই। তবে দেখো বাপু, নদীর চরিত্র হ'ল পাড় ভাঙায়, মানুষের চরিত্র বাঁধ দেওয়ায়। ব্যাকরণের সপক্ষে এর চেয়ে সুন্দর অর্থপূর্ণ মন্তব্য আর একটিও পড়িনি।

তাঁকে আমি আগে কখনো চোখে দেখিনি। প্রথম দর্শন, আলাপ এবং বিতর্ক সম্পাদনার সূত্রে। তাঁর লেখা গল্প ধরনের প্রবন্ধগুলির আমি ছিলাম ভক্ত পাঠক। কথাসাহিত্যে এক জাতের ঝকঝকে আধুনিকতা বাংলা ভাষায় এমনই আধিপত্য বিস্তার করে আছে যে সমাজের প্রকৃত চেহারাটা সেখানে অনুপস্থিত থেকে যায়, কতকগুলো বানানো সমস্যা, সাজানো চরিত্র, ধরা ছোঁয়ার বাইরের কিছু চিন্তা ভাবনা, এসব নিয়েই একালের সাহিত্য। এমন কি জটিল বা শব্দভারাক্রান্ত ভাষাও। এসব থেকে বিচ্যুতি ঘটলে, তাকে বুদ্ধিজীবীরা আধুনিক ভাবেন না। কালিদাস রায়ের আধুনিক হওয়ার কোন দায়দায়িত্ব ছিল না, তাই আধুনিক সমাজ ও সংসারের ভিতরের সত্যকে তিনি নির্ভেজাল সরলতায় প্রকাশ করতে পারতেন। তাঁর এই রচনাগুলিই একালের সামাজিক ইতিহাস হয়ে থাকবে, একালের তথাকথিত আধুনিক সাহিত্য নয়।

সরল সুন্দর কবিতা রচনা করা, তত্ত্বপূর্ণ প্রবন্ধ, সাহিত্য আলোচনা, সমাজচিন্তা, জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রেই তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন নিজেকে যথাসম্ভব আড়ালে রেখে। গুরুত্বপূর্ণ নানান দায়িত্ব তাঁর ওপর এসে পড়তো, বিশেষ করে শিক্ষার ক্ষেত্রে। কিন্তু তাঁর মধ্যে হাত বাড়িয়ে কোন কিছুর নাগাল পাওয়ার বিন্দুমাত্র বাসনা বা চেষ্টা ছিল না। এদিক থেকে তিনি সেই প্রাচীন কালের দার্শনিক উপাধ্যায়দের মতই ছিলেন। ইমেজ তৈরী করার কখনো কোন চেষ্টা করেন নি। ডক্টরেটহীন সত্যেন বোসের মতই ডক্টরেটহীন কালিদাস রায় বহু 'ডক্টরে'র স্রষ্টা। এখন ভাবলে ভালও লাগে, কষ্টও হয়। অবশ্য শেষজীবনে তিনি একসঙ্গে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানীয় ডক্টরেট হয়েছিলেন।

প্রথম কয়েকদিন সম্পাদকের আসনে বসেই তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। আমিই প্রার্থী, তিনি দাতা। কিন্তু প্রার্থনা করলেই তাঁর কাছে লেখা পাওয়া যেত না। আবার কখনো কখনো একসঙ্গে কয়েকটা লেখা দিয়ে বলতেন, যখন খুশি ছেপে দিতে পারো। সম্পাদকের ক্ষুধা অল্পে মেটে না। আমি হয়তো কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ছেপে দিতাম। তখন হাসতে হাসতে বলতেন, সারা বছরের চাল এক মাসেই খেয়ে ফতুর করে দিলে, ধান ওঠে কিন্তু বছরে একবার!

আমি জানতাম না কিভাবে উনি আমার ঠিকানা জোগাড় করেছিলেন।

হঠাৎ একদিন বাড়ীতে এসে হাজির। সকালে। তাঁকে কোথায় বসাবো, কিভাবে সম্মান জানাবো, আপ্যায়ন করবো, খুঁজেই পাই না। উনি হাতে বাজারের থলি ঝুলিয়ে এসে বসলেন, দিব্যি গল্প জুড়ে দিলেন, যেন সমকক্ষ কোন সাহিত্যসেবী। তারপরও মাঝে মাঝেই আসতেন। নানান আলোচনা করতেন।

বাজারের শূন্য থলি নিয়ে যখন ফিরতেন বেলা এগারোটায়, তখন বুঝতে পারতাম, ওটা শুধু

শখ, সংসার নিশ্চয় ওঁর ওপর বিশ্বাস করে বসে নেই।

দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে, প্রায় পনেরো বছর তো হবেই, এভাবে সপ্তাহে দুটি দিন তিনি আসতেনই। ইচ্ছে হয়, সেই সব আলোচনার কথা লিখে রাখি। শেষের দিকে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ার ফলে কিংবা আমার কর্মব্যস্ততায় যোগাযোগ ছিন্ন হয়।

একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলাম প্রথম আগমনের হপ্তা কয়েক পরেই। বোধহয় শারদীয়া সংখ্যার লেখার বিষয়ে কিছু বলেছিলাম বাড়ীর আড্ডায়। বললেন, ওসব কথা আনন্দবাজারে, এখানে আসি সাহিত্যিকের কাছে।

তারপরেও লক্ষ্য করেছি, বাড়ীতে আমাকে উনি সম্পাদক হিসেবে স্বীকার করতেন না।

একদিন বলেছিলাম, আমার খুব সঙ্কোচ লাগে, আমারই তো যাওয়া উচিত আপনার বাড়ীতে!

উনি হাসলেন। বললেন, আমার তাহলে বাড়ী থেকে বের হওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। মাঝে মাঝে বাইরে বেরুতে ইচ্ছা করে—কিন্তু যাবটা কোথায়? সারাদিনই লোকে ঘিরে রাখে বাড়িতে। সবই স্বার্থের কথা। পালিয়ে আসি দুটো সাহিত্যের কথা বলতে। বেশীদূরে তো যেতে পারি না। তুমি আছ কাছে, তাই আসি।

তাঁর চরিত্রের আরেকটা দিকের কথা না বললে অনেকখানি অসম্পূর্ণতা থেকে যাবে।

বয়সের দিক থেকেও তিনি ছিলেন আমার পিতৃতুল্য। পিতৃতুল্য কথাটা অকারণে বলছি না।

সে বড় মজার ঘটনা।

নীচে বসার ঘরে বসে গল্প করছি, বাবা কার কাছে শুনেছেন, কালিদাস রায় এসেছেন, সটান চটির শব্দ তুলে চলে এলেন।

কালিদাস রায়কে এসে বললেন, চিনতে পারো?

আমি তো হকচকিয়ে গিয়েছি।

দু'জনে দু'জগতের মানুষ। পরস্পরকে চিনতে পারার কোন কারণই নেই। মনের মধ্যে আতঙ্ক, বাবা কাউকে ভুল করেছেন। কারণ উনি সাহিত্য থেকে দূরে, সায়েন্সের ছাত্র, চাকরির সুবাদে অ্যাকাউন্টেন্সি।

একটা অস্বস্তিকর পরিবেশে আতঙ্কে বুক ধুকধুক করছে, কবিশেখর অনেকক্ষণ তাকিয়ে আছেন, চোখের দৃষ্টিও তখন ঝাপসা।

বাবা হাসছেন।

বাবা সূত্র ধরিয়ে দিলেন, একটা হোষ্টেলে, পাশাপাশি ঘরে। মনে পড়ছে।

কবিশেখর সহাস্য মুখে লাফিয়ে উঠলেন, আরে! বহরমপুরে?

এবার বাবার নামটা নির্ভুল বললেন।

আমার হৃৎকম্প দূর হ'ল। তাহলে বাবা ভুল করেননি।

আমার পক্ষে তখন নিঃশব্দে নিষ্ক্রমণ ছাড়া পথ নেই। কারণ দু'জনে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই যৌবনে ফিরে গেছেন।

মনে আছে, সেদিন তাঁদের আড্ডা ভাঙতে বারোটা বেজে গিয়েছিল।

পরে জেনেছিলাম, বাবা কলকাতায় এম. এস. সি পড়তে আসার আগে পর্যন্ত দু'জনে ছিলেন পরম বন্ধু। বিয়ের পদ্যও নাকি লিখেছিলেন। ও ব্যাপারটাকে তখন অন্তজ সংস্কৃতি ভাবা হত'না।

কিন্তু মজার ঘটনাটা পরের সপ্তাহে।

আবার যথারীতি উনি এলেন। বসে গল্প করছি। হঠাৎ বললেন, কই, সিগারেট দাও তো একটা।

ক্বচিৎ কদাচিৎ একটা সিগারেট নিতেন সযত্নে ধরাতেন খুব আরাম ·বে টানতেন। দৃশ্যটা দিব্যি উপভোগ্য ছিল।

কিন্তু পিতৃবন্ধুর সামনে থেকে সেদিন সিগারেটের প্যাকেট পকেটস্থ হয়ে অদৃশ্য।

বললেন, কই দাও না একটা সিগারেট।

সঙ্কোচের সঙ্গে বের করে দিলাম।

উনি নিজে একটি নিলেন, দেশলাই জ্বেলে ধরালেন, তারপর একটা সিগারেট বের করে এগিয়ে দিয়ে বললেন, নাও ধরাও!

প্রাচীন অস্বস্তিতে বললাম, না থাক্।

উনি আবার বললেন, ধরাও, ধরাও। সাহিত্যিকের কোন বয়স নেই। সবাই সমবয়সী। নাও, ধরাও।

কবিশেখরের তক্তাপোষ

সুমথ নাথ ঘোষ

'নন্দপুর চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার' কবিশেখর কালিদাস রায়ের এই কবিতাটি যেদিন প্রথম পড়ি, তখন আমি কলেজের ছাত্র। বিজ্ঞানের ছাত্র হলেও সাহিত্যের প্রতি ছেলেবেলা থেকেই ছিল অনুরাগ। গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ সব কিছু পড়তেই ভাল লাগত। তাঁর কবিতার প্রতি ছিল একটু বিশেষ পক্ষপাতিত্ব।

তখন সমালোচকের দৃষ্টিতে কবিতার ভালমন্দ বিচার করার মত শিক্ষাদীক্ষা বা জ্ঞানবুদ্ধি হয়নি। ভাল লাগাটাই ছিল আমার কাছে শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের একমাত্র কষ্টিপাথর। সময় নেই, অসময় নেই—যখন তখন যে কবিতার যে কোন পংক্তি মনে এলে, কাজ কর্ম সব কিছু ভুলিয়ে দেয় আর সঙ্গে সঙ্গে মনটা মধুলোভী মৌমাছির মত তার চার পাশে গুন গুন করে ঘুরে মরে—সেই রকম কবিতাই ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয়! প্রিয়তম!

মনে পড়ে সেদিন কি গভীর ভাবে কেবল আমার মনকে নাড়া দেয়নি আমার সমস্ত সত্তাকে যেন ফুলিয়ে, নাচিয়ে, মাতিয়ে, মজিয়ে দিয়েছিল সেই 'বৃন্দাবন অন্ধকার' কবিতার প্রতিটি লাইন, প্রতিটি অক্ষর।

ওর ছন্দে, বর্ণে, রূপে, ভাবে, ভাষায় যেন কিসের জাদু। চাঁদনী রাতের বিহ্বল করা মাধুর্য্যের মত যা মুখে ব্যক্ত করা যায় না, ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করতে হয়। বিশেষ করে অতুলনীয় এই পংক্তিটি—

"করে না দধিমন্থ গোপী নাচায়ে চারু চন্দ্রহার" মুখে আবৃত্তি করার সঙ্গে সঙ্গে যেন সারা দেহমন পুলকে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।

মনে আছে, এমন অপরূপ রসঘন পংক্তি এর আগে আর পড়িনি। না পড়িনি বললে ভুল হবে। ওই পংক্তিটি পড়তে পড়তে বারে বারে আমার মনে পড়েছে কবি চণ্ডীদাসের সেই বিখ্যাত লাইন কটি—'চলে নীল সাড়ী, নিঙাড়ি নিঙাড়ি, পরান সইতে মোর'—

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি, তিনি সবার গুরুদেব, সকলের ঊর্ধ্বে, তিনি সবের ব্যতিক্রম! তবে তাঁর সমসাময়িক আরো যে সব কবি বাংলার সাহিত্যাকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত দীপ্যমান, কি জানি কেন কবিশেখরকে তাঁদের দলছাড়া, গোত্রছাড়া এক ভিন্ন জাতের কবি বলে মনে হয়েছিল। তবে কি আবার এতকাল পরে এক নতুন বৈষ্ণব কবির জন্ম হলো বাংলা সাহিত্যে! দূর থেকে কবিশেখরকে সেদিন বার বার প্রণাম জানিয়েছি।

তখন কল্পনাও করতে পারিনি যে একদিন আমার এই প্রিয় কবির সান্নিধ্যলাভ করার সৌভাগ্য কখনো হবে।

বেশ মনে আছে সেদিন রবিবার। বিকেলে লেকে বেড়াতে গিয়েছি—হঠাৎ পথে দেখা সাহিত্যিক বন্ধু কেশব সেনের সঙ্গে। তিনি সাংবাদিকের চাকুরি করতেন। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অধিকাংশ দিনই 'নাইট ডিউটি' করতে হত। তখন তিনি 'ভোটরঙ্গ' পত্রিকায় সহযোগী সম্পাদকের চাকুরী করতেন। তাঁকে এর আগে কখনো লেকে বেড়াতে দেখিনি। তাই একটু বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলুম, কি ব্যাপার লেকে হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন নাকি?

তিনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, না। আমি যাচ্ছি রসচক্রে। রসচক্র? সেটা আবার কি বস্তু? রসিকতা করছেন মনে করে আবার শুধাই।

তিনি বললেন, রসচক্র হলো সাহিত্যিকদের আড্ডা, প্রত্যেক রবিবার বিকেলের দিকে কবিশেখর কালিদাস রায়ের বৈঠকখানায় কলকাতার তাবৎ সাহিত্যিকরাই এসে জড়ো হন। তারপর সকলে বসে হাসিঠাট্টা, খোসগল্প, আলাপ আলোচনা (সাহিত্য আলোচনা ছাড়া) করেন। কালীদা চা, মুড়ি, বেগুনি, যোগান দেন। তারপর রাত্তির ন'টা নাগাদ সভা ভঙ্গ। বলে একটু থেমে পকেট থেকে বিড়ি দেশলাই বার করতে করতে বললেন, সবচেয়ে মজা এখানে কোন চাঁদার বালাই নেই। আর যে কোন লোক এতে যোগ দিতে পারে। সাহিত্যিক যে হতেই হবে তার কোন নিয়ম নেই। এবার বিড়িটা ধরিয়ে বললেন, যাবেন নাকি, চলুন না? একলা যেতে হয় না তাহলে। বেশ গল্প করতে করতে হাঁটা যাবে। বেশী দূর নয়। লেকটা যেখানে শেষ হয়েছে, তার থেকে সামান্য কয়েক গজ মাত্র। বসন্ত রায় রোডে কালীদার বাসা।

বলাবাহুল্য, তৎক্ষণাৎ তাঁর সঙ্গী হলুম। আমার প্রিয়কবি, কবিশেখর কালিদাস রায় মশাইকে চোখে দেখতে পাবো এখনি। এযে আমার আশাতীত সৌভাগ্য। যিনি 'বৃন্দাবন অন্ধকার' কবিতা লিখেছেন, যাঁর লেখনী থেকে নির্গত হয়েছে সেই অত্যাশ্চর্য পংক্তিটি—'করে না দধিমন্থ গোপী নাচায়ে চারু চন্দ্রহার'। মনের ভেতর তখন শুরু হয়ে গেছে ভ্রমর গুঞ্জরণ। কল্পনায় কবির একটা মূর্তিও আমার মন এঁকে চলেছে।

একটু আগেই আমরা হাজির হয়েছিলুম তখনো অন্য কেউ আসেনি। দেখি, কবিশেখর কালিদাস রায় বসে আছেন তক্তাপোষের ওপর, খালি গা, ভারী দেহ, মাথায় কাঁচা পাকা চুল রুক্ষ এলোমেলো, একা ঘরে বসে কি একটা বইয়ের প্রুফ দেখছিলেন, তাঁর সামনে আরো কতকগুলো প্রুফ গাদা হয়ে জমে রয়েছে। আমি নমস্কার করতে তিনি নস্যির ডিবে থেকে দুই নাকে নস্যি টেনে, নাকের ওপর হাতের থাবা বুলিয়ে আমার নাম জিজ্ঞেস করলেন এবং কোথায় থাকি ইত্যাদি।

একটু পরে সেই প্রুফগুলো হাতে নিয়ে তিনি বাড়ীর ভিতরে চলে গেলেন এবং একটা গেঞ্জি গায়ে দিয়ে ফিরে এলেন।

তাঁর অনুপস্থিতির অবসরে কেশব বাবুর মুখে যখন শুনলুম এতবড় কবি স্কুলমাষ্টারী করেন, উপরন্তু গাদা গাদা স্কুলপাঠ্য বই নীচের ক্লাস থেকে উঁচু ক্লাস পর্যন্ত লিখে সংসারযাত্রা নির্বাহ করতে হয় তখন মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। কেশববাবু আরো বললেন, নিজের নামে বাংলা সাহিত্যের ও ব্যাকরণের প্রায় সব ক্লাসের জন্যেই বই লিখেছেন তাছাড়া শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, ওঁর সকল বিষয়ে এত গভীর পাণ্ডিত্য যে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য, গণিতের বইও একাধিক লিখেছেন এবং সবগুলোই স্কুল ও কলেজ পাঠ্য হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছে। তবে এসব বই তিনি বেনামীতে লিখেছেন। অনেকেই তা জানেও না। ওঁর লেখা বইয়ের নাম দেখলেই ধরা যায়। কবির স্বাক্ষর সেখানে সুস্পষ্ট। যেমন ঐতিহাসী, বিজ্ঞানিকা, ব্যাকরণিকা ইত্যাদি ইত্যাদি।

বললুম—এসব থেকে তাহলে ভাল আয় হয় ওঁর। কেশববাবু বললেন, না। খুবই দুঃখের কথা। উনি অত্যন্ত ভালমানুষ বলে অনেকেই সুযোগ নেয়।

দেখতে দেখতে ঘর ভরে উঠলো। কালীদার ওই তক্তাপোষের ওপর জায়গা না পেয়ে কেউ বসলেন জানলার ওপর, কেউ বা টেবিলে কেউ বা চেয়ারে ভাগাভাগি করে। এক একজন আসেন আর কেশববাবু কানের কাছে মুখ নিয়ে চুপি চুপি বলেন—উনি বিশ্বপতি চৌধুরী, উনি কবি যতীন্দ্র মোহন বাগচী, উনি আর্টিষ্ট সতীশ সিংহ। তারপর এলেন রমেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্তী, জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামী, প্রেমেন্দ্র মিত্র অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও প্রবোধ সান্যাল। আরো কিছুক্ষন পরে কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত এবং সবশেষে এলেন আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। এক-একটি নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমার মন যেন আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। ওদের সকলের লেখা আমি পড়েছি। নামের সঙ্গে পরিচয় ছিল, চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করলুম সেই প্রথম। তখন সেইখানে বসে আমার মনে এলো সেই গানটি—'আজ প্রভাতে সূর্য ওঠা সফল হলো কার।'

বিদায় নেবার সময় কালীদাকে প্রণাম করতে তিনি বললেন-তুমিতো এই কাছেই থাক, সময় পেলে আবার এসো।

'সময় পেলে আবার এসো' কথাটা কালীদা বললেন বটে, কিন্তু সারা সপ্তাহ ধরে রবিবারের সেই সন্ধ্যাটুকুর জন্যে মন যেন উন্মুখ হয়ে থাকতো। সেই প্রথম, তারপর থেকে যতদিন রসচক্রের অস্তিত্ব ছিল, রবিবারের সন্ধ্যায় ওখানে হাজিরা দিতে ভুল হয়নি। গঙ্গায় ডুব দিলে যেমন দেহমন পবিত্র হয় তেমনি সারাসপ্তাহের জীবনসংগ্রামের যত কিছু গ্লানি সব যেন কালীদার ওই তক্তাপোষের ওপর গিয়ে বসার সঙ্গে সঙ্গে কোথায় মিলিয়ে যেতো! একটা শুচিশুভ্র নির্মল মন নিয়ে বাড়ী ফিরে আসতুম।

কালীদার ওই তক্তাপোষটি যেন সরস্বতীর রত্নবেদী। ওখানে দেখেছি অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রকে, কাজী নজরুলকে, বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক কবি সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে, প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার, চিত্রশিল্পী ও. সি. গাঙ্গুলী, অতুল বসু, সঙ্গীতবিশারদ গোপেশ্বর বন্দোপাধ্যায়, গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী থেকে শুরু করে বাণীর বরপুত্র নবীন প্রবীণ কে নয়? রবীন্দ্রনাথ ছাড়া রথী মহারথী সবাই একদিন বসেছেন কালীদার ওই তক্তাপোষে।

রসচক্রের কথা মনে হলে, মনে পড়ে যায় মাইকেলের সেই বিখ্যাত লাইন—

রচো মধুচক্র গৌড়জন সহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

কাছে থেকে দূর

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

কালিদাস রায়ের সাহিত্যপ্রতিভার বিচার বিশ্লেষণ অন্যেরা করবেন। আমার সে স্পর্ধা নেই।

আমি তাঁকে পেয়েছিলাম শিক্ষক হিসেবে। আমার বাংলা ভাষার গোড়াপত্তন তাঁর হাতে। ভুল করলে আর সবাই পার পেয়ে যেত। আমার বেলায় পান থেকে চুন খসলেই লাঞ্ছনা গঞ্জনা।

আমার ক্লাসের ছেলেরাই একদিন আমার ভুল ভাঙিয়ে দিল। আগের দিন কী একটা কারণে যেন আমি ইস্কুলে যেতে পারিনি। সেদিন আমাকে ক্লাসে দেখতে না পেয়ে আমার অসাক্ষাতে স্যার পঞ্চমুখে নাকি আমার প্রশংসা করেছিলেন। শুনে আনন্দে ডগমগ হয়েছিলাম।

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটল হরিষেবিষাদ। সেদিন বাংলার ক্লাসে আমার প্রতি কথিত প্রসন্নতার লেশমাত্রও আমি স্যারের মধ্যে খুঁজে পেলাম না। তাছাড়া শাস্তির মাত্রাটাও সেদিন একটু বেশি হল।

অথচ পরীক্ষার খাতায় আমাকে তিনি ঢেলে নম্বর দিতেন। তাঁর ধারণা ছিল, বাংলায় আমি সবাইকে টেক্কা দেব।

কিন্তু টেক্কা দেওয়া দূরের কথা, বাংলায় লেটারও আমার শেষ অবধি জোটেনি। তার দরুণ স্যার চটে যাবেন বলে আমি যে ভয় পেয়েছিলাম, দেখা করতে গিয়ে বুঝলাম আমার সেই ভয় একেবারেই অমূলক। বলেছিলেন, তুই তো আবার চলতি ভাষায় লিখিস—সেকেলে পরীক্ষকরা চলতি ভাষা দেখলেই চটে যায়। তুই ভাল নম্বর পেলি না, আমারই দুঃখ বেশী রে।

ইস্কুলে সেবার প্রাইজ আনতে গিয়ে দেখি আমার জন্যে একটা বাড়তি নতুন পুরস্কার। সেটার কথা আমি আগে ঘুণাক্ষরেও জানতে পারিনি। সাহিত্যকর্মের জন্যে একটি রুপোর পদক। দিয়েছেন স্বয়ং কবিশেখর কালিদাস রায়।

সাহিত্যের জন্যে আমার জীবনে সেই প্রথম পুরস্কার। আমি জানতাম বাংলায় আমি যে ভালো ফল করতে পারিনি স্যারের এই পুরস্কারের মধ্যে ছিল তার সান্ত্বনা।

ইস্কুলে থাকতে আমি যা লিখেছি স্যারকে কখনও তা দেখাবার আমার সাহস হয় নি। ইস্কুল ম্যাগাজিনের জন্যে যখন লিখেছি তখনও লেখার বাক্সে ফেলে দিয়ে এসেছি। জানতাম সে লেখা স্যারের হাতেই শেষ পর্যন্ত পেঁছুবে।

ইস্কুলের ম্যাগাজিন বেরিয়েছে। আমার কবিতা বেরিয়েছে কিনা দুরু দুরু বক্ষে পাতা উল্টে দেখছি। হঠাৎ দেখলাম আমার পুরো কবিতাটাই আগাগোড়া ছাপা হয়েছে। কিন্তু পড়তে

গিয়ে দেখি বার বার কোথায় যেন হোঁচট খেতে হচ্ছে। তারপর একটু নজর দিয়ে বুঝলাম ছাপার অক্ষরে 'পদ্মা'গুলো সব 'গঙ্গা' হয়ে গেছে।

উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'স্যার, ভুল ছাপা হয়েছে।'

স্যার আমার দিকে না তাকিয়ে বললেন, 'ভুল কিসের'?

স্যার, পদ্মার বদলে ছাপা হয়েছে গঙ্গা।

তোর বাড়ি কোথায়?

'স্যার নদীয়ায়'।

'তাহলে?'

এরপর আর বুঝতে বাকি রইল না যে, স্বয়ং গুরুদেবের হাতেই পদ্মার এই নবকলেবর লাভ ঘটেছে। গঙ্গা লিখলে ছন্দ ঠিক থাকে বটে, কিন্তু নদীটা বেঠিক হয়ে যায়। কথাটা মনে থাকলেও মুখে আনার আমার সাহস হয়নি।

ছেলেবেলা থেকেই আমি ছিলাম কবিশেখর কালিদাস রায়ের কবিতার ভক্ত। আমাকে সবচেয়ে বেশি করে টানত তাঁর দোলা দেওয়া ছন্দ আর শব্দের ধ্বনিমাধুর্য।

পরে আমি তাঁর গদ্যেরও মুগ্ধ ভক্ত হই। জীবিকা জন্যে তাঁকে যদি পাঠ্যবই লেখায় আর অপরের লেখার প্রুফ দেখায় অত সময় দিতে না হত তাহলে মননের ক্ষেত্রেও বাংলা সাহিত্য তাঁর হাতে ঢের বেশি সমৃদ্ধ হতে পারত। কালিদাস রায় যে একজন বড় ভাষাশিল্পী ছিলেন সামান্য রচনাদর্শেও তার অজস্র প্রমাণ মিলবে।

এক সময়ে আধুনিক ব'লে যাঁদের অপাঙক্তেয় করে রাখা হত, মতপথের অমিল সত্ত্বেও তাঁদের রচনাশক্তির তিনি ছিলেন অকপট গুণগ্রাহী। তাঁর সাহিত্যবোধ কোনো গণ্ডি দিয়ে বাঁধা ছিল না।

কবিশেখর কালিদাস রায়ের সঙ্গে আমার ছিল ভয় আর ভক্তি মেশানো সম্পর্ক। যারা তাঁকে শুধু ইস্কুলে দেখেছে তারা ধারণাই করতে পারবে না সাহিত্যজগতের বাঘা বাঘা লোকজন—শরৎ চাটুর্জ্জে থেকে জলধর সেন—তাঁকে কি রকম সমীহ করতেন। ঘরের মধ্যে রসচক্রের বৈঠক হচ্ছে, আমি দেখেছি জানলার বাইরে রাস্তার লোকের ভিড়ের ভেতর দাঁড়িয়ে।

মাষ্টার মশাই হলেও নিজে থেকে যেচে ওঁকে নিজের লেখা দেখাবার সাহস আমার কখনও হয়নি। আমাকে উনি স্নেহ করতেন এ খবর মাঝে মধ্যে অন্যের মুখে শুনতাম। কিন্তু যখনই দেখা হত—'তোর কিচ্ছু হবে না'—এই ছিল তাঁর বাঁধাবুলি। বেশ বুঝতাম, দূরে ঠেলে কাছে টানার ওটা একটা ধরণ।

বহু বছর পরে একবার এক সভায় ওঁর সঙ্গে দেখা। ওঁর চুল তখন সাদা হয়ে গেছে, চোখের দৃষ্টি ঝাপ্‌সা। হঠাৎ আমাকে দেখতে পেয়ে কাছে ডাকলেন। তারপর আমার পিঠে হাত রেখে সবাইকে ডেকে ডেকে বললেন, এ আমার ছাত্র। সেই সঙ্গে জীবনে সেই প্রথম আমার সাক্ষাতে আমার কী যে প্রশংসা করলেন বলার নয়!

আমি সেদিন খুব দমে গিয়েছিলাম। হঠাৎ আমার মনে হল, মাষ্টারমশাই বুড়ো হয়ে গিয়েছেন। সেই সঙ্গে ভয়ও হ'ল, কাছে টেনে এ একরকমের দূরে ঠেলা নয় তো?

শিশুসাহিত্যিক কবিশেখর

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

'কবিশেখর' উপাধিধারী ব্যক্তি হযতো বাংলায কিংবা বাংলার বাইরেও কিছু কিছু থাকতে পারেন কিন্তু এই নাম বললেই একটি মাত্র কবির কথাই আমাদের সকলের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কবিশেখর কালিদাস রায়। বিদ্যাসাগর' এই নামটিও ঠিক ঐ রকম। ঐ উপাধিধারী একাধিক ব্যক্তির কথা আমাদের জানা থাকলেও বিদ্যাসাগর বললে একমাত্র পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কথাই লোকের মনে আসে, আর কারো কথা নয়।

উত্তরাধিকারসূত্রে, যাকে বিজ্ঞানীরা ইংরেজীতে বলেন 'হেরিডিটি' তা থেকে কিন্তু বঞ্চিত ছিলেন না কালিদাস। কোগ্রামের বিখ্যাত বৈষ্ণবকবি লোচনদাস ঠাকুর ছিলেন তার পূর্বপুরুষ। তাঁর ঠাকুমা ছিলেন গোকুলানন্দ সেনের বংশের মেয়ে,—যে গোকুলানন্দ 'পদকল্পতরু'র সংকলয়িতা হিসেবে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। মায়ের দিক্ থেকেও ছিল। তাঁর দিদিমা অর্থাৎ মাতামহী ছিলেন পদকর্তা উদ্ধবদাসের বংশের মেয়ে। অর্থাৎ পিতৃকুল এবং মাতৃকুল দু'দিক থেকেই কবির পূর্বপুরুষেরা বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন। এ হেন বংশের ছেলে কালিদাসও যে বংশের মুখরক্ষা করবেন এ আর আশ্চর্য কি!

কালিদাসের বাবা যোগেন্দ্রনারায়ণ কাশিমবাজার এষ্টেটে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজে পড়বার সময় কাব্যপ্রীতির জন্য ওখানকার ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক হুইলার সাহেবের কালিদাস খুব প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। এই হুইলার সাহেবের ছিল অসাধারণ কাব্যপ্রীতি। কবিতা পড়াতেনও তিনি চমৎকার। পরবর্তী জীবনে কালিদাস কবি হিসাবে যে এত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন তাতে এই অধ্যাপকটির প্রেরণা বড় কম ছিল না।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে কালিদাস বেছে নিলেন শিক্ষাব্রতীর কাজ, মেধাবী ছাত্র, তাই প্রথমেই রংপুর জেলার উলিপুর মহারাণী স্বর্ণময়ী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে তাঁকে নিযোগ করা হ'ল। সেখান থেকে পরে চলে এলেন দক্ষিণ কলকাতার বরিষা হাইস্কুলে, সেখানেও প্রধান শিক্ষক হয়ে। ১৯৩১ থেকে ১৯৫২ সাল শিক্ষকতার এই শেষ ২২ বছর তাঁর কাটে ভবানীপুর মিত্র ইনষ্টিটিউশনে। এই দীর্ঘ সময় কত খ্যাতনামা ব্যক্তি তাঁর ছাত্র হবার সৌভাগ্য লাভ করে গেছেন তার হিসেব দেওয়া কঠিন। তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'ছাত্রধারা' কবিতায় শিক্ষাব্রতীর জীবনের একটি চমৎকার চিত্র দেখতে পাওয়া যায় যার তুলনা বাংলা সাহিত্যে কমই আছে।

এতো গেল কর্মজীবন। কিন্তু বড় পরিচয় হলেও, এটাই তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় নয়। বাঙালীর কাছে তাঁর পরিচয় কবি হিসেবে। রবীন্দ্রযুগে রবীন্দ্রনাথের ভাবশিষ্য হিসেবে যে কয়জন কবি তাঁদের প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন তাঁদের মধ্যে কালিদাসও একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন এবং রবীন্দ্রপ্রভাবের মধ্যে থেকেও তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারান নি। রাঢ়বাংলার উদার প্রান্তর এবং কাশিমবাজারের অরণ্য অঞ্চলে প্রকৃতির যে স্নিগ্ধ সমারোহ ছিল কবির অজ্ঞাতসারেই হয়তো তার ছাপ পড়েছে তাঁর কবিতায় আর তাই-ই পরবর্তী যুগে জীবনের নানা গভীর অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিশে তাঁর কবিতাকে আরও প্রাণোচ্ছল করে তুলেছে।

কিন্তু কেবলমাত্র বড়দের সাহিত্যেই নয়, শিক্ষক কবি শিশু ও কিশোরসাহিত্যে তাঁর অনবদ্য দানে চিরকাল ভরে দিয়েছেন। শিশুদের জন্য গল্প, কবিতা, ছড়া, প্রবন্ধ সকল ক্ষেত্রে তিনি তাঁর সরস কলম ধরেছেন আর রবীন্দ্রনাথের মতই তাদের অতি আপন জন হয়ে গিয়েছেন। তাঁর লেখা ব্যতীত শিশুসাহিত্যের কোন সঞ্চয়ণ ও মাসিকপত্রিকা চলত না।

আমার মনে পড়ে, সেই প্রথম যখন কবিতার রস উপলব্ধি করার বয়স হ'ল তখন থেকেই তাঁর কবিতা পড়ে আসছি। তখন যে পত্রিকা খুলতাম তাতেই দেখতাম কালিদাস রায়ের কবিতা। অজস্র কবিতা যেমন বৈচিত্র্যে ভরপুর, তেমনি শব্দের ঝঙ্কারে মন মাতানো। এক একটি কবিতা কতবার পড়েছি, পড়ে পড়ে মুখস্থ হয়ে গেছে। আজও তা ভুলতে পারিনি। তাঁর সেই "নন্দপুর-চন্দ্রবিনা বৃন্দাবন অন্ধকার, /চলে না চল মলয়ানিল বহিয়া ফুল গন্ধভার।" কিংবা "এসগো জননি, দীন বঙ্গে। দেহে দেহে মনে মনে গেহে গেহে বনে বনে স্নেহময়ী ঋতুর্পতি সঙ্গে।" অথবা "দিনকর-কর-উষ্ণ প্রখর বত চরাচর দাহনে, তড়াগ-বাপীর ক্ষীয়মান নীর ঘন ঘন অবগাহনে।"—আজও যেন কানে বাজছে।

মনে পড়ে তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনটি। কবি কি একটা ব্যাপারে আমার বাবার কাছে এসেছিলেন পরামর্শ করতে। বাবা তখন বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত। আমি তখনও স্কুলের গণ্ডী ছাড়াই নি, কিন্তু কবিশেখরের অনেক কবিতাই তখন আমার মুখস্থ ছিল। বাবা ডেকে বললেন, "চিনিস এঁকে? কবি কালিদাস রায়" তারপর কবিশেখরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমার ছোট ছেলে। ওর ধারণা ও বুঝি একদিন একজন মস্ত কবি হবে। তবে আমার ইচ্ছে ও সায়ান্স পড়ুক।" কবিশেখর আমাকে আশীর্বাদ করে বললেন, "তোমার যখন শুনছি সাহিত্য বোধ আছে তখন সায়ান্স পড়ে বাংলায় বৈজ্ঞানিক রচনা লিখবে সরস করে যা বেশি লোকে লিখতে পারেনা। কেমন পারবে তো?"

এরপর রামধনু বেরোল। আমার দাদা মনোরঞ্জন সবে কলেজ থেকে বেরিয়ে রিপন কলেজে প্রফেসারি শুরু করেছেন। সম্পাদক হিসেবে প্রথম দু'বছর বাবার নামই রইল, তবে কাজ যা কিছু করতে হ'ত তা আমাদের দু'ভাইকেই।

কিন্তু এসব ব্যক্তিগত কথার উল্লেখ করছি এই জন্য যে সেই প্রথম বছরের প্রথম সংখ্যা থেকে কবি কালিদাস রায় রামধনুরও একজন নিয়মিত লেখক হয়ে গেলেন। কত অজস্র কবিতা তিনি রামধনুতে লিখেছেন! শুধু রামধনু কেন, ছোটদের অন্যান্য কাগজেও সর্বদাই তাঁর কবিতা চোখে পড়ত। আর কি সুখপাঠ্য সে সব কবিতা! একবার পড়লে বার বার পড়তে ইচ্ছে করে। মাঝে মাঝে কবিতা ছেড়ে গল্পও লিখতেন। জাতকের গল্প তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল। চাইতে হ'ত না, নিজে থেকেই পাঠিয়ে দিতেন। আমরা ধন্য হতাম।

ছোটদের জন্যে লেখা তাঁর বইগুলির খবর পরিণত বয়সের অনেকেই হয়তো রাখেন না—কিন্তু তাঁর এইসব লেখা সকলেরই সমান উপভোগ্য। যেমন জাতকমালিকা, গল্পমালিকা, কথিকা, গল্পমাল্য, পুরাণের গল্প, তৃণদল, কুরুরাজ প্রভৃতি।

কিন্তু শুধু কবি হিসেবে পরিচয় দিলেই কালিদাস রায়ের আসল পরিচয় দেওয়া হয় না। তিনি ছিলেন পরম পণ্ডিত। সাহিত্যিকদের মধ্যে অমন পণ্ডিত ব্যক্তি খুব কমই দেখেছি। বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর যা পড়াশোনা ছিল তার তো তুলনাই হয় না, তেমনি পণ্ডিত ছিলেন সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্যে। ছেলেবেলায় খাগড়ার আশুতোষ চতুষ্পাঠীতে তিনি সংস্কৃত অধ্যয়ন করেছিলেন; ইংরেজীর কথা তো আগেই বলেছি। ইংরেজী সাহিত্যে সত্যিকার রসবোধ না থাকলে অধ্যাপক হুইলার সাহেবের প্রিয় পাত্র হওয়া সহজ কথা ছিল না।

মনে পড়ে এক সময়ে কলকাতার বেতার প্রতিষ্ঠান—অল ইণ্ডিয়া রেডিও থেকে খুব ঘন ঘন আমার ডাক পড়ত বিভিন্ন বিভাগে আলোচনা করবার জন্য—ওঁদের ভাষায় যাকে বলা হয় 'টক'। তার মধ্যে প্রাচীন সাহিত্য থেকে শুরু করে আধুনিক বিজ্ঞান পর্যন্ত কোন বিষয়ই বাদ পড়ত না এবং অনেক সময়, ২৪ ঘন্টা বা তারও কম নোটিশে ঐ সব 'টক্' দিয়ে আসতে হ'ত। বঙ্কিম-সাহিত্যে হাস্যরস, গোরক্ষবিজয়ের কাহিনী, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য, বাল্মীকি-রামায়নের বিভিন্ন চরিত্র, এমন কি অলংকার শাস্ত্রের নানা দিক নিয়েও আলোচনা করবার জন্য ডাক আসত।

একবার ধন্যাত্মক শব্দের ওপর কিছু বলবার ডাক এল। সেবারে কোনও রকমে চালিয়ে দিলাম। তারপর অনুরোধ এল রৌদ্ররস সম্বন্ধে কিছু বলতে হবে এবং পরদিনই। দশ মিনিট ধরে এই টক্ দিতে হবে।

নবরসের এক রস হচ্ছে রৌদ্ররস। এই রৌদ্ররস সম্বন্ধে সামান্য যা জানি তাতে হয়তো জিনিসটা ২।৪ লাইনে বুঝিয়ে দিতে পারি কিন্তু ঐ নিয়ে মাইকের সামনে দশ মিনিট ধরে অনর্গল বক্তৃতা করা একজন বিজ্ঞানের ছাত্রের পক্ষে সহজ নয় তো। কোথায় পাওয়া যাবে রেফারেন্সের বই? তখন ইংরেজ আমল। বাংলা সাহিত্য এতটা পাংক্তেয় হয়ে ওঠেনি। বাংলা নিয়ে যাঁরা "এম-এ" পাশ করতেন তাঁদের অন্যান্য বিষয়ে ঐ ডিগ্রীওয়ালাদের চাইতে খাতির অনেক কম ছিল বিশেষ করে চাকরির বাজারে। কাজেই এখনকার মত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে

এত বইও ছিল না। এত কেন, প্রায় ছিল না বললেই ঠিক বলা হয়। দু'চার জন বাংলার অধ্যাপক ও শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করলাম, কেউই ভালো মত জবাব দিতে পারলেন না। বইয়ের নাম যা করলেন তা ঘেঁটেও বিশেষ কিছু ফ'ল হ'ল না। তখন হঠাৎ মনে পড়ল কবিশেখরের কথা। তখনই ছুটলাম টালিগঞ্জে তাঁর বাড়ীতে। আর, আশ্চর্য, এত রকম তথ্য আর উদাহরণ দিয়ে তিনি জিনিসটাকে জলের মত সহজ করে দিলেন যে আমি অবাক হয়ে গেলাম। শুধু তাই নয়, শেলফ্ থেকে টান দিয়ে ঝটপট্ কয়েকটা বই বার করে বললেন, অমুক পৃষ্ঠাটা পড়ে নাও, তারপর অমুক পৃষ্ঠা ইত্যাদি। দশ মিনিট কেন, মনে হ'ল একঘণ্টায়ও এত তথ্য পরিবেশন করতে পারব না।

তারপর যখনই এই রকম কোনও ঝামেলায় পড়তাম, ছুটে যেতাম কবিশেখরের বাড়ী। মনে হ'ত সাহিত্যের যেন এক জীবন্ত এন্‌সাইক্লোপিডিয়ার সামনে এসে পড়েছি।

শিশুসাহিত্যিকদের তিনি ছিলেন অভিভাবকতুল্য। আমরা যারা শিশুসাহিত্য নিয়ে চর্চা করি, ছোটদের যাতে ভুল না শিখাই, তার জন্যে সর্বদাই তাঁর শরণাপন্ন হতাম। শিক্ষক কবি ছিলেন শিশুসাহিত্যের অকৃত্রিম সুহৃদ।

কবিশেখরের সমীপে

অরুণ বসু

ছবিটা মোটামুটি এই রকম ছিল। বেলা দশটা বেজে গেছে। কলেজে ক্লাস নেই। আপিসের বাবুরা প্রায় সবাই স্বস্থানে চলে গেছেন। কবিশেখর বসে আছেন কাঠের তক্তপোশটার উপর। আমি সামনে বসে পড়ে শোনাচ্ছি তাঁকে একটি ছোট্ট লেখা, তাঁরই একটি ছোট কবিতা সম্পর্কে। মাথার উপর পুরনো ঢঙের পাখাটা একটু শব্দ করেই ঘুরে চলেছে। কবিশেখর প্রথমটা নির্লিপ্ত, তারপর যেন একটু আগ্রহী। কিছুক্ষণ পরে উৎসাহী ও অধিকতর শুশ্রূষু, অনুরোধে অনুচ্ছেদ-বিশেষ দুবারও পড়তে হল।

আমি পড়ছিলাম এই রকম কিছু কথা দিয়ে গাঁথা একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয়লিপি। দুএক পাতা উদ্ধার করা যেতে পারে—

"রবীন্দ্র বনস্পতির মূল আশ্রয় করে পল্লবিত হলেও কবিশেখর কালিদাস রায় রবিকরোদ্দীপ্ত সমীরিত ও বৃষ্টিবিধৌত পারিপার্শ্বিক থেকেই আপন কাব্যের প্রেরণা সংগ্রহ করেছেন। প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের মৃৎগভীরে শিকড় সঞ্চালিত করে সেখান থেকেও প্রাণের রস আহরণ করেছিলেন। বস্তুত বঙ্গসাহিত্যের অতীত ও বর্তমান এমন প্রীতিসূত্রে আর কারো রচনায় গ্রথিত হয়নি। বৈষ্ণবীয় কবিসংস্কার, বিনম্র ভক্তি ও মাধুর্যবৃত্তি তিনি জন্মসূত্রে লাভ করেছিলেন। কর্মসূত্রে সর্বজনীন সারস্বত-সত্রে তাঁর স্বচ্ছন্দ পর্যটন ঘটেছিল, মর্মপ্রেরণায় সংস্কৃত রসসাহিত্যে তাঁর সাবলীল অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। এ সবের সমবেত প্রেরণা তাঁর কাব্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সঞ্চারিত হয়েছে। মুখ্যত পল্লীজীবনের স্নিগ্ধ বর্ণালেখ্য-রচনায়, বাঙলার মৃত্তিকাঘনিষ্ঠ জীবনের মেদুর গীতিচারণায় তাঁর হৃদয়ানুরাগ তীব্রতর হলেও, কবিতার উপকরণ-নির্বাচনে গত অর্ধশতকেরও বেশি সময় ধরে তিনি প্রায় নির্বিচার ও উদার-মনস্ক। সমকালীন অন্যান্য কবিরা যখন যুগলব্ধ যন্ত্রণায় রক্তাক্ত শতাব্দীর বিষপাত্র পান করেছেন, কবিশেখর তখন অনায়াসে শাশ্বত বাঙলার নিত্য সংস্কৃতিকে, তার চিরকালের দিনযাপনের বৃত্তচ্ছন্দকে মনে প্রাণে গ্রহণ বরণ করে যুগবাত্যার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেছেন। বিদ্যাদানের শুষ্কবৃত্তি তাঁর সারস্বত সাধনাকে নীরস করেনি, পরন্তু বিচিত্রমুখী জ্ঞানের শীকরস্পৃষ্ট হয়ে তাঁর কবিতা পাঠক-চিত্তের রৌদ্রতৃষার সংঘর্ষে ইন্দ্রধনু বিকিরণ করে।"

বোধকরি একটু দম নেওয়ার জন্যই কিছুক্ষণ থেমেছিলাম এবং কবিশেখরের প্রতিক্রিয়া বোঝার জন্যও। উনি তখন আমার দিকে কিছুটা সস্নেহে দৃষ্টি দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে বললেন, "এসব তুমি লিখেছ?"

ঈষৎ পুলকিত হয়ে চুপ করে আত্মপ্রত্যয় অনুভব করলাম। উনি বললেন, "এতদিন তুমি কোথায় ছিলে?"

কাছে পিঠেই ছিলাম নিশ্চয়, কিন্তু যোগাযোগ হয়নি কবিশেখরের সঙ্গে। ১৯৫১ সাল নাগাদ বঙ্গবাসী কলেজে স্নাতকশ্রেণীর ছাত্র হিসেবে স্বনামধন্য কবিসমালোচক, আমার পরমাদর্শ আচার্য জগদীশ ভট্টাচার্যের কাছে কবিশেখরের কাব্যের রসসম্পদের পরিচয় পাই। তারপর আরো দশ বছর পর অধ্যাপনার কাজে কোনো নামজাদা প্রকাশকের ঘরে সৌভাগ্যক্রমে কবিশেখরের সঙ্গে পরিচয় ঘটল, বিস্ময়মুগ্ধ পাঠক সেই প্রবীণ কবির স্নেহপ্রীতি সৌজন্যে কৃতার্থ হল। কবিশেখরের একটি কাব্যসংকলনের কাজে সহায়তা করার জন্য আমি প্রায়ই তাঁর কাছে উপস্থিত হতাম। মাঝে মাঝে উনি চিঠি লিখে ডেকে পাঠাতেন। তারপর কাব্য পাঠ করতেন, আমি প্রশ্ন করতাম। নানা বিষয়ে উনি আমার কৌতূহল নিরশন করতেন। এরই মধ্যে একদিন সাহস করে লিখে ফেলেছিলাম একটি লেখা, যার অংশ উদ্ধৃত করেছি। আর তারই মাঝখানে কবিশেখরের এই স্নিগ্ধ প্রসন্ন স্বীকৃতি।

আবার পড়া শুরু করলাম আমি। উনি আবার আমার লেখা 'কবিশেখর পরিচিতি'তে মনঃসংযোগ করলেন। আমি পড়তে লাগলাম।

"গার্হস্থ্য জীবনের মুগ্ধ বিস্ময়, বৈষ্ণবীয় ভক্তির প্রগাঢ় আত্মনিবেদন, ভারতসংস্কৃতির মানবমাহাত্ম্য বঙ্গীয়জীবনের মাধুর্য-কণিকা, দেশকাল-ব্যক্তি, প্রকৃতি ও জীবন, ইতিহাস ও ভূগোল নানাভাবে তাঁর কবিতার স্বচ্ছন্দ উপকরণরূপে গৃহীত হয়েছে।

তাঁর সমধর্মী কবিসহচর করুণানিধানের মত তিনি একান্ত রোমান্টিক স্বপ্নাতুর নন। বাস্তব জীবনের বৃন্তেই কাব্যকুসুম মুকুলিত করার প্রযত্নে তিনি আমাদের প্রিয়তর। যতীন্দ্রমোহনের দৃষ্টি কেবল গ্রাম্য কোমল অনুভূতি সন্ধানী ছিল। সেই তুলনায় কালিদাস রায় ভূমাক্ষী। কুমুদরঞ্জন মুখ্যত স্বগ্রামে মঙ্গলকাব্যকার, কালিদাস সমগ্র বঙ্গের আধুনিক বৈষ্ণব গীতিকবি। কুমুদরঞ্জনের তুলনায় তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ভাষাশিল্পের সুষমাময় বাণীবিগ্রহরচনায়, সুধাম বাকপ্রতিমা নির্মাণে। তাঁর কবিতায় নদীজলের ফেনপুঞ্জের মতো প্রাগাধুনিক বাঙলা সাহিত্যের ও সংস্কৃত সাহিত্যের বহু উল্লেখ কণিকা দৃষ্ট হয়। এগুলি শুধু সুঅধীতী কবির সযত্নচয়িত অনুসন্ধিৎসা মাত্র নয়। সাহিত্যের মধ্য দিয়ে চিরবাহিত বঙ্গসংস্কৃতির উত্তরাধিকার রূপেই তাঁর কবিতা রচিত হয়েছে।"

আমার রচনা ছিল নিতান্তই সাজানো কথার কিছু অধ্যাপকসুলভ বাগ্‌বিস্তার, তবু কবিশেখর তা মনোযোগ দিয়ে শুনেছিলেন, তাঁর ভালো লেগেছিল। সেই ভালো-লাগাই প্রীতিআশীর্বাদ হয়ে ঝরে পড়েছিল আমার সেদিনকার তরুণশীর্ষে। এসব কথা ভাবতে এখন নিজেরই ভালো লাগে। তারপর একদিন তিনি আমার অনুরোধে 'খণ্ডকপালী' কবিতাটি আমাকে পড়ালেন কী অপূর্ব সেই অধ্যাপনা! স্বয়ং কবি তাঁর কাব্যপাঠ ও ব্যাখ্যা করেছেন আমি একমাত্র তাঁর শ্রোতা। সে আলোচনার টীকা রেখেছিলাম আমি, পরে তা ব্যবহারও করেছি। আর কিছুকাল পরেই 'খণ্ডকপালী' কবিতাটি স্নাতক শ্রেণীতে আমাকে পড়াতে হয়েছিল। সে কবিতা পড়াতে আমার যে ভালো লাগত তার একটিই কারণ, আমি স্বয়ং কবির চরণপ্রান্তে বসে সে কবিতার ব্যাখ্যা শুনেছিলাম। আজ আর সেসব আলোচনার অবকাশ নেই, কিন্তু সে স্মৃতি আজও আমার কাছে অমলিন হয়ে আছে।

কবি শিক্ষক

ডাঃ জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায়

কবিশেখর ছিলেন আমার শিক্ষক, আমার সাহিত্যকর্মের প্রেরণাদাতা, আরও অনেক কিছু। মনে আছে, মারা যাবার কয়েকবছর আগে একদিন তাঁর রচিত সাহিত্য নিয়ে কথা হচ্ছিল। আমি বললাম, "একদিন মহাকালের বিচারে আপনার সাহিত্য ও ভাষাতত্ত্বের ইতিহাসে সঠিক স্থান নির্ণীত হবে।"

কথাটা শুনে তিনি একটু ম্লান হেসে বললেন, "দেখ্, কোর্টে যেমন কেসটা উপস্থাপিত করার জন্য উকিল ব্যারিষ্টারের দরকার হয়, তেমনি কালের এজলাসেও তো বিচারের জন্যে কারুকে পেশ করতে হবে। আমার কথা আর কে পেশ করবে বল?"

কথাটা শুনে সেদিন ব্যথা পেয়েছিলাম, কিন্তু কথাটা করুণ হলেও যে সত্যি, এটা বুঝতে পারলাম, কয়েকদিন আগে। কথা হচ্ছিল একজন সাহিত্যিকের সঙ্গে, যিনি রবীন্দ্র পুরস্কার, আকাদেমী পুরস্কার দুই পেয়েছেন। তিনি বললেন, আর একজন কবির কথা বলতে গিয়ে, কালিদাস রায় তাঁর চেয়ে বড় কবি নন।" ইচ্ছা হল একবার, তর্ক করি। কিন্তু তখনি মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথের সেই কথা—আমি মারা গেলে বরং বলো রবীন্দ্রনাথ কবি ছিলেন না, সে বরং আমার সইবে। কিন্তু সভা ডেকে সার্টিফিকেট দিতে বসো না যে রবীন্দ্রনাথ একজন কবি।

রবীন্দ্রনাথের সেই কথাটি মনে রেখে আমি বলতে চেষ্টাই করব না, কালিদাস রায় কত বড় কবি, কারণ কবিদের মাপবার কোন মাপের ফিতে বা দাঁড়িপাল্লা আজও তৈরী হয় নি। তাই সেদিক দিয়ে না গিয়ে কালিদাস রায় সম্পর্কে বিরূপতা কেন তাই দেখা যাক। ১৯৩৮-৪০ সাল নাগাদ আমাদের একটা ছোটখাটো সাহিত্যের আড্ডা ছিল। সেই আড্ডাতে আসর জমাতেন, রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়, সুশীল জানা, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, রামপরাণ চট্টোপাধ্যায়, সত্যপ্রেম চৌধুরী এবং বর্তমান লেখক প্রমুখ অনেকে। একদিন আড্ডায় হঠাৎ কবি কালিদাস রায়ের কথা উঠল। একজন বললেন "কালিদাস বাবুর মিলবাঁধা ছন্দ, অনুপ্রাস, প্রভৃতির দিকেই বেশী ঝোঁক। শিক্ষক কবির বাগ্‌বৈশিষ্ট্য হওয়া বিধেয়।"

কিন্তু প্রশ্ন এই, কেন সেদিন আমাদের মনে হয়েছিল, যে এই বক্তার বক্তব্যের মধ্যে কিছু আছে? আমার মনে হয়, এরও একটি ঐতিহাসিক কারণ আছে। যখন তিরিশ দশক শেষ হচ্ছে তখন 'পুনশ্চের'

মত গদ্যছন্দে কবিতাগুলি রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছেন। বুদ্ধদেব বসুরা 'কবিতা' পত্রিকা প্রকাশ করেছেন। এই পত্রিকার সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব ছিল 'গদ্যকবিতা'। এই পত্রিকায় কবিতা লিখে বিখ্যাত হয়েছেন, এঁদের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছেন, যাঁরা অজস্র গদ্য কবিতা লিখেছেন কিন্তু একলাইনও মিল দিয়ে, পদ্যে কবিতা লেখেন নি; যেমন সমর সেন। কাজেই সেই সময় থেকে একটা ফ্যাসান হল যে আধুনিক কবি হতে গেলে মিল, ছন্দ এগুলো বাদ দিতে হবে। তার পরবর্তী ধাপে এই দাঁড়াল যে, বড় কবি হতে হলে মিল, ছন্দ, প্রাচীন অলঙ্কার শাস্ত্রের অনুশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হবে।

বিদ্রোহটা তিরিশ দশক থেকে সত্তর দশক পর্যন্ত ওই একটি কেন্দ্রবিন্দুর চারিদিকে বৃত্ত রচনা করেই চলেছে। আবার সেই কেন্দ্রবিন্দুটিও রবীন্দ্রনাথের দেওয়া। কাজেই এ যুগের কোন পুরস্কৃত সাহিত্যিক যদি বলেন, কালিদাস রায় বড় কবি নন, তা হলে তাঁর কবিতার লাইন তুলে তুলে দেখাবার দরকার নেই। কারণ সবারই কেন্দ্রবিন্দু রবীন্দ্রনাথ। কে আর কতটুক এগিয়েছেন?

প্রাচীন সাহিত্যে, সংস্কৃত ভাষায়, ভাবাতত্ত্বে, বৈষ্ণব সাহিত্যে, আমার শিক্ষকের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি লিখতে গেলে, পড়াতে গেলে, কথা বলতে গেলে এগুলি তাঁর উপর প্রবল ছায়াপাত করত। তাই তাঁর রচনায় এর নিবিড় ছায়া। কিন্তু ছন্দ, মিল, থাক নাই থাক, তা তখনই কবিতা, যখন তা ফুলের মত ফুটে ওঠে। তিনি ফুটিয়েছেন অজস্র ফুল। ফুলগুলোকে যে এগুলো ফুল এটা বলার জন্যে ফুলদানিতে ফুল সাজিয়ে ধরতে হয় না। তাই যাঁর ইচ্ছে, তিনিই কালিদাস রায়ের কবিতা পড়লে বুঝতে পারবেন। তবে পড়তে হবে। আজকাল যেমন না পড়েই সব ব্যাপারে লম্বা লম্বা কথা বলা যাচ্ছে, কবিশেখর কালিদাস রায়দের যুগে সেটা ছিল স্বপ্নাতীত।

লেখাপড়ার কথাতে চলে এসেছি বলে, কালিদাসবাবু শিক্ষক হিসাবে কি রকম ছিলেন তাই বলছি। স্কুলে তিনি যখন আমাদের পড়াতে শুরু করলেন, তখন আমার একটা অনুভূতি হয়েছিল তাই বলছি। স্কুলে যখন আমরা পড়তাম, মনে হত যেন আমরা একটা ছোট জগতের মধ্যে বাস করছি। আমাদের বাড়ী, ইস্কুল, খেলার মাঠ ইত্যাদি নিয়ে একটা ছোট দুনিয়া। সেই হিন্দীতে যাকে বলে ছোটি-সে-দুনিয়া। কিন্তু যেদিন থেকে কালিদাস রায় পড়াতে এলেন, সেইদিন থেকে যেন আবিষ্কার করলাম, এ বিশ্বের বুঝি সীমা নেই। ক্লাশরুমের জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে যে আকাশ, সেই আকাশেই আইনষ্টাইনের মহাবিশ্ব। যেন কালিদাস রায়ের মাধ্যমে একটু একটু করে ধরা দিতে লাগলেন রবীন্দ্রনাথ, ব্যাস, বাল্মিকী, হোমার, ভার্জিল, সেক্সপীয়ার, শ, মেটারলিঙ্ক, মান, প্রমুখ বিশ্বনাগরিক লেখক, ও মণীষীরা। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, তিনি আমাদের শেখাতে লাগলেন যে, আমরাও আমাদের সৃজনশীলতার মাধ্যমে এই বিশ্বমানবদের মধ্যে একজন না হলেও, এঁদের দিকে তাকিয়ে এঁদের কাছে দাঁড়াতে পারি।

টুকরো-টুকরো অনেক ঘটনা উল্লেখ করে আমার বক্তব্য প্রমাণ করতে পারতাম, কিন্তু তার বদলে দু একটি মাত্র প্রসঙ্গের উল্লেখ করি। একদিন তিনি আমাদের পড়াচ্ছিলেন অক্ষয় বড়ালের একটি বর্ষার কবিতা। সেদিন পড়াবার সময়ে আকাশে মেঘ করে বৃষ্টি এলো। সেই সুযোগ গ্রহণ

করে, সেদিন পড়াতে গিয়ে, প্রকৃতি যে আবহাওয়া আমাদের দিয়েছে, কবি বা সাহিত্যিক কেমন করে তা আত্মস্থ করে তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে আমাদের পরিবেশন করেন তিনি পড়াতে গিয়ে যেন আমাদের সাহিত্যসৃষ্টির ল্যাবরেটারি বা ওয়ার্কশপের ভিতরে নিয়ে গিয়ে বুঝিয়ে দিলেন। আমাদের সহপাঠী যারা, তাদের অনেকেরই তাঁর পড়ানোর অনেক কথাই মনে পড়বে। আমরা পড়তে অভ্যস্ত ছিলাম, এতদিন অন্য-নানা বিষয়। যেমন আমরা পড়তাম বিষয় হিসাবে ইংরাজি, বাংলা, অঙ্ক। তিনি প্রথম আমাদের পড়াতে সুরু করলেন সাহিত্য; যে সাহিত্য আমাদের বৃহত্তর জীবনের সঙ্গী হয়ে ওঠে।

সাহিত্যের কথা উঠল বলে, এই প্রসঙ্গে আর দু একটি কথা বলে নি। আগেই বলেছি ছাত্রদের মধ্যে যে সৃষ্টিশীল দিকটা আছে, সেটিকে তিনি বিকশিত করে তুলতে চেষ্টা করতেন। সে জন্য তিনি ছাত্রদের নানা বিষয়ে রচনা লিখতে বলতেন। আর ঠিক সাহিত্যসভায়, যে রকম রচনাপাঠের আসর বসে, তেমনি ভাবে এই রচনাগুলি আমাদের পাঠ করতে বলতেন। লেখার প্রসাদগুণগুলিকে প্রচণ্ডভাবে উৎসাহিত করতেন ও দুর্বলতাগুলি কি ভাবে দূর করতে হবে তাও বলে দিতেন। তাঁর ক্লাসে বসে বসেই মনে হত, আমিও একজন কবি কি সাহিত্যিক হতে পারব। অনেকেই তো হয়েওছেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে আকাদেমি পুরস্কার পাওয়া কবি আছেন, আছেন একাধিক মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি, চিত্রনাট্যকার, স্বনামধন্য অভিনেতা, খ্যাতনামা অধ্যাপক, অধ্যক্ষ, ব্যবহারজীবী, চিকিৎসক ইত্যাদি, তবু, মারা যাবার মাত্র কিছুদিন আগে তাঁকে বলতে হয়েছিল—"আমার কথা আর কে মহাকালের এজলাসে পেশ করবে বল?" সত্যিই বোধহয় তাই প্রদীপের কোলের গোড়ায় অন্ধকার। কে-ই বা তাঁকে তেমন করে মনে রেখেছি?

সাধারণতঃ দেখা যায়, শিক্ষক বা অধ্যাপকদের মধ্যে যাঁদের সাহিত্যে অনুরাগ, তাঁরা সাহিত্যই পড়ান। ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব, অলঙ্কার, ছন্দ এগুলির জ্ঞান তাঁদের অনেকেরই কিছুটা সীমাবদ্ধ। কবিশেখর এ ব্যাপারে ছিলেন একটি উজ্জ্বলতম ব্যতিক্রম। অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মত একজন ভাষাতত্ত্ববিদও তাঁকে বাংলা ও সংস্কৃত ভাষাবিদ হিসাবে কতটা শ্রদ্ধা করতেন তা সুনীতিবাবুর নানা আলোচনায় শুনেছি। কবিশেখরের কাছে সুনীতিবাবুর এমনি একটি লেখাতেই বহুকাল আগে, আমি প্রথম সুনীতিবাবুর বাংলা হস্তাক্ষর ও সই দেখেছিলাম।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের খ্যাতিমান অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ ডঃ শুদ্ধসত্ত্ব বসুর কাছে শোনা একটি ঘটনার উল্লেখ করি। ডঃ বসু কালিদাস বাবুর ছাত্র না হলেও ছাত্রকল্প। ডঃ বসুর "অলঙ্কার জিজ্ঞাসা" বইখানি তখন সবে প্রকাশিত হয়েছে। এই বইখানি তাঁকে উপহার দেবার জন্য তিনি নিয়ে গিয়েছেন। ছাত্ররা কেউ বই লিখলে তিনি যে কত খুসী হতেন, তা আমরা সকলেই জানি। তিনি একগাল হেসে ডঃ বসুকে বললেন, "বাঃ তুই অলঙ্কার শাস্ত্রের উপর বই লিখেছিস? এর খুব দরকার ছিল রে। তবে তোকে সহজে ছাড়ছি ভাবিস নি। এই আমি দরজা চেপে বসলুম। পালাতে পারবি না। আমি তোকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে দেখব বিষয়টি তোর কতটা আত্মস্থ হয়েছে; বই তো দেখে শুনেও লেখা যায়।

ডঃ বসু নিজে আমার কাছে গল্প করেছেন, যে প্রায় আধঘণ্টা নানা প্রশ্ন ও আলোচনা করে

তিনি খুশী হলেন। আমার মনে আছে আমি একদিন ওঁর বাড়ীতে গিয়ে ডঃ [illegible] এই প্রসঙ্গটি তুলেছিলাম। উনি উচ্ছ্বসিতভাবে [illegible] ও তাঁর বইগুলির প্রশংসা করলেন।

ইংরাজী সাহিত্যে যেমন সমালোচনা এক নতুন ও অতি উচ্চপর্য্যায়ে উঠে গেছে; আমাদের বাংলা সাহিত্যে কিন্তু তা মোটেই হয় নি। অবশ্য তার একটি কারণ সহজেই বোঝা যায়, আমাদে সমালোচকরা পড়াশোনাতে বেশ খাটো। বই না পড়ে তার সমালোচনা, গান না শুনে সঙ্গীত সমালোচনা, এ আমাদের দেশে আখচার। বাঙ্গালী 'সমালোচকরা' স্টেটসম্যানের মত ইংরাজি কাগজে লেখবার সময়েও এ কাজ করে থাকেন। আমাকে কখনো-কখনো এর প্রতিবাদও করতে হয়েছে। এই কথাগুলো বললাম এইজন্য যে, কবিশেখর কালিদাস রায়, বাংলা সাহিত্যে সমালোচনাকে নতুন রূপ দিতে চেয়েছিলেন। ইউরোপীয় সমালোচনার রীতি অনুসরণ করেই তিনি মনে করতেন সমালোচকের কাজ হল নতুন দিগন্ত আবিষ্কার। আর এই আবিষ্কারের অস্ত্র বা হাতিয়ার হল সমালোচকের নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তি; আর তখনো পর্যন্ত বিভিন্ন জ্ঞানবিজ্ঞানে যা জানা গিয়েছে তার উপলব্ধি। এই হাতিয়ার ব্যবহার করে সমালোচক বিশ্লেষণ করেন ও নতুন কিছু দেখিয়ে দেন আমাদের। সমালোচনাকে একটি স্বতন্ত্র সাহিত্য করে তুলেছেন আমাদের শিক্ষক।

আশ্চর্য ব্যাপার। সমালোচক হিসাবে কবিশেখর কালিদাস রায় যে কত বড় ছিলেন, তা নিয়ে কিন্তু কোন আলোচনাই হয় না। তাঁর সমালোচনা সাহিত্যের বইগুলি আর ছাপা হয় না। লোকে আজ সমালোচক কালিদাস রায়কে ভুলে যেতে বসেছে। কিন্তু যিনি সমালোচনাসাহিত্যে নতুন পথের দিশারা দিয়েছেন, তাঁকে বিদগ্ধ পাঠকসমাজ একেবারে ভুলে যেতে পারবে না। তাই তাঁর নতুন সংস্করণ না হওয়া বইগুলি লাইব্রেরিতে জমে থেকে যাবে। থিসিস লিখবার জন্য কেউ কেউ হয়ত ওই বইগুলি ধুলো ঝেড়ে পড়বে। আর পড়তে গিয়ে তারাই অবাক হবে, এই কথা ভেবে যে কতবড় একটা ব্যক্তিত্বকে কত সহজে আমরা ভুলে গেলাম।

সাহিত্যের ইতিহাসে, বিজ্ঞানের ইতিহাসে কিন্তু এ রকম ঘটে। নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক মেডোয়ার তাঁর একখানি বইয়ে উইলিয়াম হীওয়েল নামে এক বৈজ্ঞানিকের কথা বলেছেন। ১৮৪০ সালে তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধান ছিলেন। তাঁর বুদ্ধিমত্তা, পাণ্ডিত্য ও আবিষ্কারের খ্যাতি তখন ছিল অসাধারণ। আজ যে আমরা "সায়ান্টিষ্ট" "ফিজিসিষ্ট" কথাগুলি ব্যবহার করি, এ কথাগুলি পর্যন্ত তাঁর আবিষ্কার ও তিনিই প্রথম ব্যবহারও করেন। জগৎ বিখ্যাত মাইকেল ফ্যারাডে যখন বিদ্যুতের ঋণাত্মক ও ধনাত্মক দুটি দিক আবিষ্কার করলেন, তখন বিজ্ঞানী সমাজ হীওয়েলের কাছে গেলেন। তিনি ব্যাপারটি বুঝিয়ে দিলেন ও এই দুটি দিকের নাম দিলেন "ক্যাথোড" ও "এ্যানোড", যা আজ স্কুলের ছেলেরা পর্যন্ত জানে। কিন্তু এই অসামান্য হীওয়েলকে সবাই ভুলে গেছে। ঘটনাটি পড়েই আমার মনে পড়ল কবিশেখর কালিদাস রায়ের কথা।

তাঁর জীবৎকালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জগতে তাঁর অসাধারণ প্রভাব আমরাই দেখেছি। দেখে আমাদের অবাক লাগত। আজ আবার যখন দেখি তিনি বিস্মৃতপ্রায়, তখনও অবাক লাগে। বলতে ইচ্ছা করে "অবাক পৃথিবী, অবাক করলে তুমি।"

সাহিত্যের এক-একটা আড্ডাকে কেন্দ্র করে সাহিত্যের এক-একটা যুগের সৃষ্টি হয়। যেমন কল্লোলযুগ। কল্লোলযুগের অপূর্ব এক ইতিহাস লিখে এই যুগকে আমাদের সামনে রেখে গেলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। ঠিক এমনি একটি আড্ডার মধ্যমণি ছিলেন কবিশেখর কালিদাস রায়। এই আড্ডার নাম ছিল রসচক্র। শরৎচন্দ্র থেকে সুরু করে সাহিত্যিক কবিদের মধ্যে প্রায় সকলেই কখনো না কখনো, রসচক্রের কোন না কোন সভায় গেছেন। তবে এই আড্ডার প্রধান উৎসাহী ছিলেন কালিদাস রায়, সতীশ সিংহ, বিশ্বপতি চৌধুরী, কুটবিহারী মুখোপাধ্যায় যতীন্দ্রমোহন বাগচি, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কবির কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাধেশ রায়। আমাদের ছোটবেলায় অনেক সভাই আমরা হতে দেখেছি বসন্ত রায় রোডে, সাহানগর রোডে, যতীন দাস রোডে। যদিও এটা ছিল সাহিত্যের ও সাহিত্যিকদের সভা, কিন্তু কবিশেখর বলতেন যে কবি সাহিত্যিকরা তো লিখছেনই। সারা বছরই তাঁরা নিজেদের পেশার ফাঁকে ফাঁকে, হয়ত বিনিদ্র রজনী যাপন করে লিখে যাবেন। কিন্তু এই সাহিত্যের আড্ডাগুলো হবে তাঁদের ছুটির মত। একেবারে আড্ডা। অবশ্যই সাহিত্যিকদের আড্ডায় সাহিত্য আলোচনা হবেই। কিন্তু সেই আড্ডায় খোস গল্প, যাকে গল্প-গুজব বলে, তাই হবে প্রধান।

কেউ কেউ অবশ্য বিশিষ্ট রচনাও এই সভায় পাঠ করেছেন। বিশ্বপতি চৌধুরীর "কাব্যে রবীন্দ্রনাথ" বইখানির পাণ্ডুলিপি, রসচক্র নামে একটি বারোয়ারী উপন্যাস এই রসচক্রের সভাতে ধারাবাহিক ভাবে পাঠ করা হয়েছিল।

রসচক্রের সম্পর্কে এমনি আর একটি ঘটনার কথা শুনেছি। শরৎচন্দ্রের বিজয়া ছবিখানির প্রদর্শন শুরু হয়েছে, ঠিক আগের দিন। অমর মল্লিক, যিনি রাসবিহারীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন, তিনি নিজে গেলেন শরৎচন্দ্রের বাড়ী; যাঁর ঠিকানা বর্তমানে অশ্বিনী দত্ত রোড। গিয়ে শুনলেন শরৎচন্দ্র সতীশ সিংহের বাড়ী গেছেন। সেখানে কালিদাসবাবু ও রসচক্রের অন্য অনেকের সঙ্গে আগের দিন দেখা বিজয়া ছবি নিয়েই আলোচনা হচ্ছে। শুনেছি নাকি অমর মল্লিক সেইখান থেকেই বিজয়া ছবি সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মতটি লিখিয়ে নেন। সেইটিই শরৎচন্দ্রের হাতের লেখায় পরের দিন কাগজে ছাপা হয়েছিল। এমনিই রসচক্রের নানান ইতিহাস আছে। কিন্তু কই তা লেখা হল? কালিদাস বাবুর ভাই রাধেশ রায় রসচক্র নামে একটি প্রকাশভবন করেছিলেন, তাও বিলুপ্ত। সেকালে নানান পুস্তক সেখান থেকে ছাপা হত।

আমি ব্যবহারজীবী নই। এজলাসে কোন কারুর মামলা কিভাবে পেশ করতে হয় জানি না। তবে শুনেছি নাকি কারুর নামে মামলা পেশ করার আগে দরখাস্ত করতে হয়। কয়েকপাতার এই দরখাস্তখানা পেশ করছি এই কথা বলার জন্য। কবি হিসাবে, ভাষাবিদ হিসাবে, সমালোচক হিসাবে, মানুষ হিসাবে, কবিশেখর কত বড় ছিলেন, তার মূল্যায়ন হোক। সেদিনকার সেই সাহিত্য সভায় সেই অর্বাচীন অথচ প্রথিতযশা সাহিত্যিকের সেই বাতুল অভিমতের বিচার হোক।

পুণ্যস্মৃতির প্রেক্ষাপটে

সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

মনে পড়ে, স্কুলের ছাত্রজীবনে অষ্টম থেকে নবম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে প্রবেশিকা 'বাংলার' যে সংকলনটি হাতে পেয়ে আনন্দে নেচে উঠেছিলুম তারই মধ্যে ছিল যাঁর একটি অনবদ্য হৃদয়গ্রাহী কবিতা, দীর্ঘকাল পরে আজ তাঁরই স্মৃতিচারণ করতে বসেছি। কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় পরে শুধু একবার নয়, অনেকবার হয়েছে কিন্তু ভাবের জগতে সাক্ষাৎকার সংকলনের সেই কবিতাপাঠ থেকেই। ছোটবেলায় কোন বাংলা সংকলন হাতে পেলেই আমার প্রথম কাজ হতো, সব কবিতাগুলো ধারাবাহিক ভাবে পরপর মুখস্থ করা। এবারও সেই একই নিয়মে পরিচিত কয়েকজন কবির কবিতা আয়ত্ত করার পর 'ছাত্রধারা' নামে যে কবিতাটি চোখে পড়লো, সে কবিতার কবি বা তাঁর লেখা সম্বন্ধে কোন পরিচয় ইতিপূর্বে আমার ছিল না, কিন্তু পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে তা যেন একটা আশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করল। ছাত্রমনে যে চিন্তাগুলো স্বভাবতই উঁকি মারে তাদের একসঙ্গে মালার 'মতো' গেঁথে এমন সরস ক'রে যে কবিতার ছন্দে প্রকাশ করা যায় তা কোনদিন ভাবতেও পারি নি। কবিতাটা তাই এত ভাল লাগলো যে তার পরিসর অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও অতি অল্প সময়ের মধ্যে আগাগোড়াই মুখস্থ হয়ে গেল। সে সুখস্মৃতি আজও আমার মনে অম্লান হয়ে রয়েছে। কবির লেখা কোনো মূল গ্রন্থ তখনও আমার হাতে আসে নি বটে, কিন্তু তারপর থেকে কোনো পাঠ্য-পুস্তকে, পত্র-পত্রিকায় বা সংকলনে যখনই তাঁর লেখা দেখতুম, গভীর শ্রদ্ধা এবং অভিনিবেশের সঙ্গেই আমি তা পাঠ করতুম।

লোকমুখে শুনেছিলুম, কবি নাকি খুবই রসিক, মিষ্টভাষী ও সদালাপী, কিন্তু ওই পর্যন্ত। চোখের সামনে কোনদিন যে তাঁকে দেখতে পাব, তা যেন তখন ভাবতেও পারতুম না। হঠাৎ অপ্রত্যাশিত-ভাবে সে সুযোগও একদিন উপস্থিত হ'ল। আমাদেরই এলাকায়, রাজপুর পদ্মমণি গার্লস্ হাই-স্কুলের চত্বরে কি একটা অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিশেষ অতিথিরূপে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি এসেছিলেন। তাঁর স্বভাবগম্ভীর চেহারা দূর থেকে দেখে ঐ কিশোর বয়সে বেশি কাছে এগিয়ে যেতে সেদিন আর সাহস করি নি বটে, কিন্তু তাঁর উজ্জ্বল মায়াময় চোখ দু'টো যে ঋষিদৃষ্টির অধিকারী তা সেই প্রথম দর্শনেই আমি যেন কতকটা অনুমান করতে পেরেছিলুম।

তারপর দেখতে দেখতে বেশ কয়েকটি বছর গড়িয়ে গেল। স্কুল কলেজের গণ্ডি পেরিয়ে আমিও হয়ে উঠলুম তরুণ শিক্ষাব্রতী। এদিকে শিক্ষাদানের ফাঁকে ফাঁকে শুরু করলুম সাহিত্যচর্চা। এরপর 'মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, বীরবল প্রভৃতি পূর্বসূরীদের আদর্শে চতুর্দশপদী কবিতা রচনায় যখন আমি ব্রতী

হলুম, মাথায় তখন হঠাৎ একটা চিন্তা খেলে গেল। চোদ্দ অক্ষরের চোদ্দ লাইনের চোদ্দটি কবিতার ছোট ছোট তিনটি সংকলন ক'রে, সনেট প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড নাম দিয়ে যথাক্রমে কবিরঞ্জন কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কবিশেখর কালিদাস রায় ও কবিবর নরেন্দ্র দেবকে উৎসর্গ করলুম। এবার আমাকে আর পায় কে! একদিন সাহসে ভর করে 'নিরবদ্য' আর সনেট দ্বিতীয় খণ্ডটি হাতে নিয়ে টালিগঞ্জের 'কবিকুঞ্জে, 'সন্ধ্যার কুলায়' গিয়ে উপস্থিত। কবি ভিতরে ছিলেন। খবর পাঠাতেই এসে দেখা করলেন। সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয় দিয়ে প্রণাম ক'রে আসার উদ্দেশ্য জানিয়ে বই দু'খানা তাঁর হাতে যখন তুলে দিলুম, তখন এক অপূর্ব স্বর্গীয় আনন্দে আমার সারা মনটা যেন ভ'রে গেল। হাসিমুখে তিনি তা গ্রহণ করতে উৎসর্গের কবিতাটি খুলে আমি নিজেই তখন তাঁকে পড়ে শোনালাম—

কবিশেখর কালিদাস রায় করকমলেষু—

বর্ণের আমরা যাঁর নিপুণ চয়নে
পেলো এক সুবিন্যস্ত ছন্দোময়ী ভাষা,
ভাবের দীনতা যাঁর কুশল বয়নে
ভুলে গেল যুগান্তের নেপথ্য হতাশা
তাঁর করে আমি আর কি সঁপিব কবি
অখ্যাত অজ্ঞাতনামা দৈন্য প্রপীড়িত!
এ যেন নিছক কোন কল্পনার ছবি
অলস মানসভূমে উদিত অঙ্কিত॥

তবে আজ এই হোক, অবাধ কল্পনা
আসুক দুর্বারগতি মানস গগনে
তারি মাঝে শুনি তব সুরের মূর্চ্ছনা
জীবনের ক্ষুদ্র এক আবিষ্ট লগনে।
হোক তা ক্ষণিক সত্য, সেও তো দুর্লভ,
সেও তো আমার পক্ষে পরম গৌরব॥

পাঠ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সস্নেহে মাথায় হাত রেখে কবি আমাকে আশীর্বাদ করলেন আর অন্তহীন ভালবাসার প্রতীকস্বরূপ তাঁরও দু'খানি অনবদ্য কাব্যগ্রন্থ 'বল্লরী' ও 'পর্ণপুট' আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন, নাও, এগুলো তুমি যত্ন করে রেখ। এরপর ভাবাবেগে কবি তাঁর সমসাময়িক কালের প্রথিতযশা কবিদের জীবনকথা ও কলাকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে নানাভাবে আমাকে উৎসাহিত করলেন। এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ কবিসঙ্গ ক'রে আবার তাঁকে শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানিয়ে সেদিনকার মতো ঘরে ফিরলুম।

এরপর থেকে সময় পেলেই কবির কাছে যাই এবং নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করি। একদিন দেখি এক ভদ্রলোক আগেই এসে কবির কাছে বসেছেন এবং নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন। আমি প্রণাম ক'রে পাশে গিয়ে বসতেই তাঁর পরিচয় দিয়ে কবি আমাকে-বললেন, ইনি

হচ্ছেন আমার কবিতার একজন অনুরাগী পাঠক, অধ্যাপক অমিয়কৃষ্ণ রায় চৌধুরী। আমারও পরিচয় তাঁর কাছে দিতে অচিরেই তাঁরও আমি স্নেহভাজন হয়ে উঠলুম।

আর একদিন কবিপুত্রের বিবাহ উপলক্ষে আমন্ত্রিত হয়ে আলাপ হয়েছিল লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপক সাহিত্যিক ও সমালোচক প্রমথনাথ বিশীর সঙ্গে। সেদিন আমন্ত্রিতদের আপ্যায়নে যে রসকৌতুক কবি পরিবেশন করেছিলেন তা ছিল সত্যই মনোমুগ্ধকর।

ঘরোয়া পরিবেশে একান্ত নিবিড়ভাবে কাছে পেয়ে কবির মধ্যে আমি প্রত্যক্ষ করেছি, যে কোন বিষয়বস্তুর মর্মমূলে অবাধে প্রবেশ করে তা থেকে মৌলিক রসসৃষ্টি করার আশ্চর্য নৈপুণ্য, শাস্ত্রে যাকে বলা হয় 'অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা'। তাছাড়া কোন্ লেখা কোথায় আরম্ভ করে কোথায় শেষ করতে হবে সে সম্বন্ধেও কবি ছিলেন বড়ই সচেতন। কোন লেখাকে অনাবশ্যকভাবে তিনি বাড়াতেন না। বলতেন, অমন করলে রসহানি ঘটে। এ সম্পর্কে একটা উদাহরণ দিলে বক্তব্যটি আরও স্পষ্ট হবে। একবার 'গাঁয়ের হাটে' নামাঙ্কিত আমার একটি কবিতা তাঁর কেমন লাগে জানবার জন্য পড়ে শোনাতে শোনাতে যখন এইখানে এসেছি—

"কেমন যেন ভাঙলো চমক ওর এই কথাটিতে
থমকে গেলেম হঠাৎ আচম্বিতে।
সত্যি কথাই, ওজন দরে যায় না তো সব কেনা
ওজন ক'রে যায় না মানুষ চেনা।"

এবং তারপর আরও যে দু'চার লাইন বাকী ছিল তা পড়ার জন্য উন্মুখ হয়েছি কবি তখন সস্নেহে থামিয়ে দিয়ে বললেন, আর না, এইখানেই শেষ করো। কবিতার মূলভাব এইখানেই রসঘন ও সার্থক হয়ে উঠেছে; এরপর আর কিছু বলা অর্থহীন। সেদিন বুঝলাম প্রবীণ কবির কি অদ্ভুত রসজ্ঞান আর কাব্য পরিমিতি সম্পর্কে কি অপূর্ব তাঁর সচেতনতা!

শুধুমাত্র কাব্যসৃষ্টির ক্ষেত্রেই নয়, জীবনের সর্বক্ষেত্রেই ছিল তাঁর প্রগাঢ় পরিমিতিজ্ঞান। কখনও তিনি তাঁর পরিধির বাইরে একপাও অনাবশ্যক বাড়ান নি।

কাব্য-কবিতার সত্যকার অনুরাগী একটা সচেতন গোষ্ঠী বা পাঠকসমাজ সৃষ্টির ব্যাপারেও কবি ছিলেন খুবই উৎসাহী। একথা তিনি প্রায়ই বলতেন যে, শ্রদ্ধার সঙ্গে কবিতা পাঠ করার মতো লোকের সংখ্যা আমাদের সমাজে এখন খুবই কম। তাই মাঝে-মাঝে কবিতার আসর জমিয়ে বিভিন্ন কবিদের ভাল ভাল লেখাগুলো আবৃত্তি বা পাঠ করার একটা সুযোগ করে দিলে পাঠকমহলে বা জন-সমাজে কবিতার প্রতি একটা অকৃত্রিম অনুরাগ জন্মাবে। তখন আগ্রহের সঙ্গে কবিতা পাঠ করতে অনেকেই এগিয়ে আসবেন। কবিতারও একটা আসরের দরকার।

কবির দুঃখ ছিল, ইদানীং তাঁর কবিতা কেউই তেমন আগ্রহ করে পড়েন না। কিন্তু তিনি নিজে তো জানতেন না তাঁর কবিতার অনুরাগী পাঠক সমস্ত দেশে ছড়িয়ে আছে।

আমরা জানি যে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি তাঁর নিজস্ব আসন যেমন অধিকার করে

আছেন। ঠিক তেমনই সাধারণ বাঙালীর অন্তরেও তাঁর একটি প্রীতির আসন রয়েছে। আমরা কবিবন্ধু সুধীররঞ্জন অধিকারীর কথা উল্লেখ করতে পারি। তিনি এক সাক্ষাৎকারে কবিশেখর কালিদাস রায়ের চিত্তে চমক জাগিয়েছিলেন রায় মশায়েরই কাব্যগ্রন্থ থেকে পরপর বিভিন্ন পঙক্তি উদ্ধার করে—যে অনবদ্য স্তবকগুলি কবিশেখর নিজেই তখন সম্পূর্ণ বিস্মৃত।

আবার দু'একবার নির্জন পল্লীপ্রান্তরে বিভিন্ন সূত্রে বিচরণ করতে করতে পল্লী বালকের মুখ থেকে তাঁর লেখা 'ও ভাই কানাই ফিরে আয়' কবিতাটি সঙ্গীতের 'সুরে' ভেসে আসতে শুনে সুধীররঞ্জন চমৎকৃত হয়েছিলেন। কবিকে সে কথা বলায় তিনি বলেছিলেন, 'সত্যিকারের প্রাণ তো এদের মধ্যেই আছে।'

কবির মধ্যে কোনদিন কোন কৃত্রিমতাই আমি দেখিনি। নিজের জন্মস্থানটির প্রতিও কবির ছিল অনাবিল শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। এ প্রসঙ্গে যখনই কোন কথা উঠতো তখনই তিনি উদ্দীপিত হয়ে উঠতেন। তাছাড়া সমসাময়িক কবিদের প্রতিও তিনি ছিলেন যথার্থই শ্রদ্ধাশীল। কবি কুমুদরঞ্জন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, করুণানিধান প্রভৃতি তাঁর সমসাময়িক কালের প্রথিতযশা কবিদের কথা যখনই উঠতো তখনই অত্যন্ত সহানুভূতি ও দরদের সঙ্গে তিনি তাঁদের জীবনের সুখ-দুঃখের বিচিত্র কাহিনী ও সাহিত্যকীর্তি নিয়ে আলোচনা করতেন। সকলের প্রতি ছিল তাঁর নিবিড় প্রীতি।

কালিদাস মূলত ছিলেন কবি কিন্তু কবিতার পরিধি অতিক্রম ক'রে ছোটগল্প; নিবন্ধ ও রম্য-রচনার ক্ষেত্রেও তিনি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তাছাড়া ভাষাতত্ত্ব আলোচনায়, সাহিত্য সমালোচনায় এবং সাহিত্যের ইতিহাস উদ্‌ঘাটনেও তাঁর কর্মপ্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। বলা বাহুল্য যে তাঁর শিক্ষাব্রতীর জীবন এ সবের খুবই সহায়ক হয়েছিল।

আজ স্মৃতিচারণ করতে বসে কেবলই মনে হচ্ছে কবিশেখর কালিদাসের লেখায় যে শাশ্বত উপাদানগুলি রয়েছে, সারাজীবনের গভীর অনুধ্যান ও জীবনচর্চার মধ্য দিয়ে যে অমর সাহিত্যসম্পদ দেশকে তিনি উপহার দিয়েছেন তার সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দেশবাসীর এই সচেতনতা বাস্তবিকই আনন্দের বিষয়।

আঙ্গিকের ক্ষেত্রে কতকাংশে রবীন্দ্রানুসারী হয়েও বিষয়নির্বাচনে, অপূর্ব উপস্থাপন কৌশলে ও প্রকাশভঙ্গীর সরসতায় কালিদাস যে তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল ও ভাস্বর এ সত্য আজ আর অস্বীকার করার উপায় নেই।

পত্রালাপে কবিশেখর

সলিল মিত্র

আমার পরম প্রিয়, পরম শ্রদ্ধেয় কবিশেখরকে কখনো চোখে দেখিনি—তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে ছিল চিঠির মাধ্যমে। বিগত ২৫ বছর ধরে অবিচ্ছিন্নভাবে না হলেও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ একটা ছিল। শেষ চিঠি ডাকে দেবার পরের দিনই শুনলাম, কবি আর নেই।

মাঝে মধ্যে নিজের প্রয়োজনেই কবিকে চিঠি দিতে হত, তিনিও জবাব দিতেন।

আমরা পাঁচবন্ধু মিলে "বনবীথি" নামে একটি কবিতার সংকলন করেছিলাম ১৩৬৫ সালে। বইটি শ্রদ্ধেয় কুমুদরঞ্জন মল্লিক ও শ্রদ্ধেয় কবিশেখর কালিদাস রায়-কে উৎসর্গ করি। সেই বই পেয়ে কবিশেখর খুশী হয়েছিলেন।

আমি কবিতা লিখি শুনে তিনি আমায় লিখেছিলেন—'কল্যাণীয়েষু, তুমি কবিতা লেখ, কিন্তু আগে লেখাপড়া শেখ, তারপর লিখো। দারিদ্র্যের কথা লিখেছ, কবিতা লেখা দরিদ্রের জন্য নয়। ওটা দরিদ্রের একটা ব্যাধি।'

মাঝে মাঝে তাঁকে খুবই বিরক্ত করতাম হাতে লেখা পত্রিকা, বিদ্যালয় পত্রিকা ইত্যাদির জন্যে আশীর্বাণী ও কবিতা চেয়ে। তিনি আশীর্বাণী দিতেন, কবিতাও দিতেন। একবার তিনি "রবীন্দ্র-তর্পণ" নামে একটি কবিতা পোষ্টকার্ডে পাঠিয়েছিলেন, নীচে লিখেছিলেন—"তোমরা পল্লীগ্রাম থেকে পত্রিকা বার করছ—এ পত্রিকা কি করে চলবে? মাসে মাসে কে লোকসান বহন করে?"

—ইতি শ্রীক

তাঁকে প্রণাম করার জন্য এক কবি সংবর্ধনা সভায় আমি গিয়েছিলাম গত ১৯৫৮ সালে। ওখানে এক সংস্থা থেকে কবি কুমুদরঞ্জন, কবিশেখর কালিদাস রায় ও কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়কে সংবর্ধনা জানানোর ব্যবস্থা হয়েছিল। আমারই দুর্ভাগ্য, সেই সভায় কবিশেখর আসেন নি। কেন আসেন নি জানতে চাইলে কবিশেখর গত ৫ই মার্চ, ১৯৫৮ তারিখে একটি চিঠিতে লেখেন—'সংবর্ধনা নিতে ইচ্ছা করেই যাইনি। ওদের সভাপতি শ্রীমান—(কবিশেখরের চিঠিতে সভাপতির নাম আছে। কিন্তু কবিশেখর নিজে আমায় নাম প্রকাশ করতে নিষেধ করেছিলেন। তাই এখানে অপ্রকাশিত রইল। সংবর্ধনার সভাপতি এখন বাংলা শিক্ষা ও সাহিত্যজগতের

লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি।) তাঁর বই-এ আমাকে ও কুমুদরঞ্জনকে কবি বলে স্বীকারই করেন নি। সেজন্য ওঁদের আমন্ত্রণে আমি যাইনি।'

সত্যিই তো, সংবর্ধনা সভার সভাপতি যখন তাঁর বইয়ে কবিশেখরকে কবি বলেই স্বীকৃতি দেননি তখন কি করেই বা তিনি সংবর্ধনা সভায় গিয়ে প্রণাম গ্রহণ করবেন? (আমাদেরা ঔদ্ধত্যেরও একটা সীমা আছে!)

ঐ চিঠিরই এক জায়গায় লিখেছেন—'কবিতার বই বিক্রী হয় না বলে সংবর্ধনা নিতে ইচ্ছ হয় না। আমি চাই অন্ততঃ আমার কবিতার সংকলন প্রতি গৃহে না হোক প্রতি পাঠাগারে প্রতি স্কুল কলেজে এবং আমার অনুরাগীর কাছে থাকে।'

কবিশেখরের এই বক্তব্য আমি সংবর্ধনা সভার প্রধান উদ্যোক্তাকে জানাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে কবিশেখর আমায় লেখেন—'এর সঙ্গে দেখা হলে কোন কথা বলো না। তাতে সে ভাববে আমি কাঙালপনা করে উপেক্ষার কথা সকলকে বলছি। তার সঙ্গে আমার বিরোধ নেই—সে আমার প্রতি শ্রদ্ধাবান—কবি হিসাবে নয় বটে কিন্তু শিক্ষাব্রতী, প্রবন্ধলেখক এবং মানুষ হিসাবে। তোমাকে গোপনে ও কথা লিখেছিলাম। যাঁরা শিক্ষা বিভাগে উচ্চ পদে আরূঢ় হচ্ছেন—তাঁদের সঙ্গে আমার বিরোধ করার উপায় নেই, তাঁদের তোষামোদ করেই চলতে হয়। কত কারণে তাঁদের দ্বারস্থ হতে হয়।' (দ্বারস্থ? কবিশেখর কালিদাস রায়কেও? হায় শিক্ষা! হায় সংস্কৃতি!)···

কবিশেখর আরো লিখেছেন—'আমি সামান্য স্কুলমাষ্টার তাও অবসরপ্রাপ্ত। তবু শিক্ষা বিভাগেই আমার কিছু প্রতিপত্তি আছে। সাহিত্যক্ষেত্রে আমার বিন্দুমাত্র প্রতিপত্তি নেই বলে আমাকে বিদায় দিয়েছে অপ্রবীণের দল।' (বাংলা কাব্যসাহিত্যের অনন্য রূপকার কবিশেখরকে বিদায় দান? একথা উচ্চারণ করার মত স্পর্দ্ধাও আমাদের হয়?)

আধুনিক কবিতার আলোচনাপ্রসঙ্গে কবিশেখর চিঠিতে খুবই মূল্যবান মন্তব্য করেছেন, ...'অধিকাংশ কবিতার আমি রসবোধ করতে পারি। আমি সকল শ্রেণীর কবিতাই বুঝি—কারণ কবিতা যে কত শ্রেণীর হতে পারে তা আমাকে আমার অধ্যাপক হুইলার সাহেব শিখিয়েছিলেন। তিনি শিখিয়েছিলেন—নিজের সংকীর্ণ রুচির অনুযায়ী কবিতা বিচার করো না। সকল রুচি ও মানদণ্ডের উপরে একটা সাংস্কৃতিক মান আছে, সেখান হতে দেখলে বহু রচনাই উপভোগ করবে। যে তা পারে না সে হতভাগ্য। বহু ভাল রচনার রসাস্বাদে সে বঞ্চিত।··· ...'

শ্রীকালিদাস রায়। ১৫. ৩. ৫৮

গত ১৯৭০ সালে আমি 'তুষুর গান' লোকগীতি সংকলন রচনা প্রকাশ করে কবিশেখরকে পাঠাই। ৩ চারু এভিনিউ থেকে গত ৮।১।৭০ তারিখে একটি চিঠি পাই—"কল্যাণীয়েষু সলিল, তোমার চিঠি পেলাম। আমি দৃষ্টিশক্তিহীন, একেবারে শয্যাগত। নিজ হাতে লিখতে বা পড়তে পারি না। তোমার 'তুষুর গান' শুনলাম। শুনে দেখলাম তোমার তুষুর গানগুলি খুব সুমধুর হয়েছে। ইতি—শ্রীকালিদাস রায়।"

এ চিঠিতে কবিশেখরের হস্তাক্ষর নেই, মনে হয়, তাঁরই কথামত তাঁরই কোন আপনজন এই চিঠি লিখেছিলেন।

একটি চিঠিতে তিনি আমায় লিখেছিলেন—"সলিল, আমি বড়ই বিব্রত হয়ে আছি অনেক দিন থেকে—সেজন্য পত্রের উত্তরাদি দিতে পারি না। শরীর ও মন সুস্থ না থাকলে কিছু ভাল লাগে না।

ইতি—শ্রীকা।"

সত্যিই তো, আমরা অপ্রধানেরা কবিশেখরকে বৃদ্ধ বয়সেও বিব্রত করে তুলেছি। যাঁর নানান্ রসের কাব্য সুধা পান করে আমরা শিশুবয়স থেকে যৌবনে উত্তীর্ণ হলাম; যাঁর রচনা পাঠ করে উচ্চশিক্ষিত হয়ে হাতে কলম ধরার শক্তি সঞ্চয় করলাম, সেই কলমেই কিনা লিখতে পারলাম—কবিশেখর কবি কি কবি নন! মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিকে, গুণীকে আমরা মর্যাদা দিতে ভুলে যাই কেন? কেন নাসিকা কুঞ্চন করে তাঁর যোগ্যতার বিচার করতে বসি।

বৃদ্ধ বয়সে কবি দুঃখ পেয়েছেন, অভিমানে ক্ষুব্ধ হয়েছেন; জানিনা হয় তো বা ভেবেছেন, তিনি কালোত্তীর্ণ কিনা!

নিশ্চয়ই তিনি কালোত্তীর্ণ কবি। সব নয়, একমাত্র 'ছাত্রধারা'-ই তো এক যুগ থেকে আরেক যুগের ছাত্রসমাজের হৃদয়ে আন্দোলিত হবে, কল্লোলিত হবে তাদের রক্তে প্রবাহিত হবে কবিশেখরের কবিতার ছন্দমাধুর্য!

যথার্থই কবি যিনি তাঁকে কি আমরা ভুলতে পারি, না কখনো ভুলেছি?

কবিশেখরের এই ধরনের নানা বিষয়ে সরস ও গভীর মন্তব্যপূর্ণ চিঠিপত্রাদি নানা ভক্তপাঠকদের কাছে আছে। সেগুলি থেকে তাঁর কবিচিত্তের উদারতা যেমন প্রকাশিত, তেমনই তাঁর ব্যক্তিমানসের দুঃখবেদনার কথাও প্রকটিত। এইসব চিঠিপত্রের সংকলন কি করা যায় না? যে কেউ তাঁকে চিঠি লিখুক, প্রতিটি পত্রের তিনি উত্তর দিতেন। দূর গ্রামপ্রান্তের অখ্যাত পাঠককেও তিনি নিজহাতে উত্তর দিয়ে বাধিত করতেন।

শিল্পীর দৃষ্টিতে কবিশেখর

ভূনাথ মুখোপাধ্যায়

বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকে কবিশেখর কালিদাস রায়ের কবিতা পাঠ করে আমার কাব্য সাহিত্য রসপিপাসু জীবনের প্রথম দিকেই তাঁকে আমার শ্রদ্ধার আসনে বসাই। তখনও তাঁকে চোখে দেখিনি। পরে কলিকাতা সরকারী চারুকলা বিদ্যালয়ে (অধুনা কলিকাতা সরকারী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ে) শিল্পকলা সাধনার সময়ে অখণ্ড বাংলার শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য, কাব্য, সঙ্গীত প্রভৃতি সাংস্কৃতিক আসরে যোগ দিতে আরম্ভ করি। তখনই পেয়েছি তাঁকে চোখের সামনে।

তিনি তাঁর কবিজীবনকে ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিলেন। ব্যক্তিজীবনে, সাংসারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, বাঙ্গালী-জীবনে; ভারতীয় জীবনাদর্শের এক সমুজ্জল মূর্তিতেই দেখলাম তাঁকে। তাঁর সঙ্গ যত পেয়েছি, নানা প্রসঙ্গে, ততই তিনি আমাকে কাছে টেনেছেন।

তাঁর বাড়ীতে যাতায়াত সুরু হল। সেই সুযোগে তাঁকে একদিন আমি অনুরোধ করি, তাঁকে সামনে বসিয়ে পেন্সিলে তাঁর একখানি রেখাচিত্র আঁকব। তিনি সানন্দে সম্মত হ'লেন। ছবিখানি আঁকা হ'ল ১৩৪৫ সালের ১১ই ভাদ্র তারিখে; প্রায় ৪১ বৎসর পূর্বে।

রবীন্দ্রযুগে, অখণ্ড বাংলার সুপ্রসিদ্ধ এবং সুমধুর সম্পর্কযুক্ত কবি-পরিবারের প্রায় সকলের সঙ্গে আমার কম-বেশি মেলামেশা থাকায়, তাঁদের পরস্পরের মধ্যে যে কি মধুর এবং অকৃত্রিম আত্মিক বন্ধন ছিল, তা জানা এবং দেখার সৌভাগ্য আমার হ'য়েছে। কবিশেখরকে সেই কবিগণের অন্যতম রূপেই দেখেছি।

এক সময় তিনি আমাকে আমার একখানি কবিতার বই প্রকাশে উৎসাহ দেন। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে, আন্তর্জাতিক শিল্পচর্চার আকর্ষণে আমি সুদীর্ঘকালের জন্য ইউরোপ যাত্রা করি, দেশে ফিরেই আবার তাঁর কাছে যাই। তিনি আমাকে আবার সস্নেহে কাছে টেনে নেন।

আনন্দ পাওয়া এবং আনন্দ দেওয়ার যে প্রচেষ্টা বিশ্বের সকল সংস্কৃতিবানের জীবনে দেখা যায়, কবিশেখরের জীবনেও তা দেখেছি। তাঁর কাছে যাঁরাই এসেছেন, মিষ্টিমুখ করিয়ে লৌকিক আনন্দ এবং মধুর কাব্য-সাহিত্য বা সাংস্কৃতিক চর্চায় মানসিক আনন্দ তাঁদের দিয়েছেন। আত্মিক আনন্দ প্রতিষ্ঠার মূলে যে এ দ্বিবিধ আনন্দ, এ শিক্ষা তিনি আপন সন্তান-সন্ততিদের মধ্যেও রেখে গিয়েছেন।

তাঁর জীবনের শেষভাগে, দৃষ্টির স্বল্পতা সুরু হ'তে, যখন বাড়ী থেকে স্বাভাবিক ভাবে বাহিরে

হওয়া সম্ভব হ'ত না, তখন তিনি একটু নিঃসঙ্গ বোধ করতেন। সেই স্তব্ধ তন্ময়তায় তাঁকে কখনও বা মনে হ'ত আপন কল্পনা আকাশের দিগন্তে অস্তমিত-প্রায় দিনমনি।

অখণ্ড বাংলা তথা অখণ্ড ভারতের অবিচ্ছিন্ন সাংস্কৃতিক জীবন থেকে বঞ্চিত হওয়ার জ্বালা তাঁর মধ্যে দেখেছি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কালো বাজারের পণ্য ও অপসংস্কৃতির বেচা-কেনা তাঁকে মর্মাহত করত। কাব্যে, সাহিত্যে, আধুনিকতাবাদের মাত্রাধিক্য তিনি পছন্দ করতেন না। শিল্পকলা প্রসঙ্গেও তিনি আমার সঙ্গে একমত ছিলেন। চিরন্তন সত্য-আশ্রিত ভাবস্রোতে প্রবাহিত মানব সংস্কৃতিকে পৃথিবীর মানুষ চিরদিনই গ্রহণ করবে, এ বিশ্বাস তাঁর ছিল।

১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারির বিকালে, তাঁর কাছে বসে আছি। অতীত স্মৃতি-চারণে তিনি তন্ময়! অসীম কল্পনা-আকাশে তাঁর উড়ন্ত মনের পিছনে পিছনে আমার মনও উড়ে চলেছে। তাঁর সঙ্গে ছুটে চলেছে আমার হাতের পেন্সিল;—একখণ্ড নিরেখ সাদা কাগজের বুকে। চলেছে রেখার পর রেখা পাত ক'রে। মৃদু স্ফূর্তির আবির্ভাব হল, তাঁর চোখ ও ঠোঁটে। রেখায় আবদ্ধ হয়ে তা হল মূর্ত! মূর্ত হ'ল তাঁর রৈখিক অবয়ব! আর আমার তন্ময় কানে এলো তাঁর সস্নেহ ভাষণ;—"অক্ষম শরীরে অপরকে কষ্ট দিয়ে বেঁচে থাকাতে কষ্ট বোধ করি, তবে বার্ধক্যের সব কষ্ট ভুলে যাই যখন দেখি তোমাদের মত যারা আমার কাছে আসো, কথা শোনো, আমাকে চাও, আমাকে ভালবাসো, তখন আমার সব কষ্ট চলে যায়! তোমাদের আনন্দই আমার আনন্দ!"

তাঁর সে কথা আজও ভুলিনি। আমি মনে করি, পটের পূজায় যেমন দেবতা তুষ্ট হন, আজ আমার সেই দুখানি রেখাপটের শ্রদ্ধা নিবেদনে তাঁর আত্মাও তুষ্ট হবেন।

ঘটনাপঞ্জী

শিবকুমার গুহ ও বিমল কুমার ভট্টাচার্য

১৮৮৯ বর্ধমান জেলার কড়ুই গ্রামে ৭ই আষাঢ়ে জন্ম।

১৯০৭ কাসিমবাজারের খাগড়া এল. এম. এস স্কুল হতে সরকারী বৃত্তিসহ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। প্রথম কাব্য গ্রন্থ "কুন্দ" প্রকাশ, রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ ও প্রশংসাপত্র লাভ।

১৯১১ বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ হতে ডিষ্টিংশন সহ বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

১৯১২ ধানবাদ প্রবাসী শ্রীমতী সুকৃতি দেবীর সহিত বিবাহ।

১৯১৩ উলিপুরে মহারাণী স্বর্ণময়ী হাইস্কুলে সহকারী প্রধানশিক্ষক পদে যোগদান ও পরে প্রধানশিক্ষক।

১৯২০ রংপুর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক কবিশেখর উপাধি প্রদান। উলিপুর ত্যাগ—দীনেশ চন্দ্র সেনের প্রচেষ্টায় বড়িষা হাইস্কুলে সহকারী প্রধানশিক্ষক পদে যোগদান।

১৯২৮ "রসচক্র সাহিত্য প্রতিষ্ঠান" প্রতিষ্ঠা। প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হন শরৎচন্দ্র। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। বসুধারা পত্রিকা সম্পাদনা।

১৯৩১ শ্যামাপ্রসাদের অনুরোধে বড়িষা স্কুল ত্যাগ করিয়া ভবানীপুর মিত্র স্কুলে যোগদান।

১৯৩৮ কলিকাতার দক্ষিণে "সন্ধ্যার কুলায়" বাসভবন নির্মাণ।

১৯৪৭ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক লীলা লেকচার প্রদানের জন্য আমন্ত্রিত ও লেকচার প্রদান।

১৯৫৩ মিত্র স্কুল হতে অবসর গ্রহণ। সাহিত্য ও কাব্যে শ্রেষ্ঠ কীর্তির জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক জগত্তারিণী স্বর্ণপদক প্রদান।

১৯৫৭ পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক স্বাধীনতা দিবসে সম্বর্ধিত।

১৯৫৯ দিল্লীতে সাধারণতন্ত্র দিবসে সর্বভারতীয় কবিসম্মেলনে বাংলার প্রতিনিধিত্ব।

১৯৬১ রবীন্দ্রশতবর্ষে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতি।

১৯৬৩ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে গবেষণার জন্য "সরোজিনী স্বর্ণপদক" প্রদান।

শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তির জন্য আনন্দবাজার পত্রিকা কর্তৃক আনন্দ পুরস্কার প্রদান।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নবীনচন্দ্র লেকচার প্রদানের জন্য আমন্ত্রিত ও লেকচার প্রদান।

১৯৬৬ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি. এল. রায় লেকচারশিপ প্রদানের জন্য আমন্ত্রিত ও লেকচার প্রদান।

১৯৬৮ ৭ই জানুয়ারীতে সহধর্মিনী শ্রীমতী সুকৃতি দেবীর পরলোকগমন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক "পূর্ণাহুতি" কাব্যগ্রন্থের জন্য "রবীন্দ্রপুরস্কার" প্রদান।

১৯৭০ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সর্বোচ্চ সম্মান দেশিকোত্তম প্রদান।

১৯৭২ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ডি. লিট প্রদান।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক অন্যতম বিশিষ্ট সদস্য নির্বাচিত।

১৯৭৫ ২৫শে অক্টোবর রাত্রি ১০.৪০ মিনিটে পরলোকগমন।

১৯৭৬ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মরণোত্তর ডি. লিট প্রদান।

সব্যসাচী কবিশেখর

ডক্টর প্রদ্যোত ঘোষ

বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য কবিশেখরের কবিআত্মা ও সমালোচকচরিত্রের মর্মোদ্ধার এবং তারই মধ্যে সংগুপ্ত তাঁর সব্যসাচীত্বের পরিচয় প্রদান।

বিংশ শতকের তথাকথিত লেখকগোষ্ঠীর প্রচণ্ড ঢক্কানিনাদে কবিশেখরের মধুর শান্ত কাব্য-ক্ষেত্রের দিকে তাকানো দায়! তবু বাংলাসাহিত্যের এমন একটা সবজনগ্রাহ্য স্বাদু অথচ বিশিষ্ট শ্যামলিমায় ঘেরা শান্ত জন ও জনপদের স্রষ্টা কবিশেখরের দিকে সাবধানী ও একনিষ্ঠ পাঠকের তাকাতেই হবে। কবি নিজেও এ ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। ১৯৫২ সালের মে মাসে বর্তমান প্রাবন্ধিকের পিতামহী কবি সুনীতি ঘোষকে (মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের ভ্রাতুষ্পৌত্রী ও মানকুমারী বসুর ভ্রাতুষ্পুত্রী) জনৈক খ্যাতনামা সমালোচক-কবির উক্তি উদ্ধৃত করে তিনি চিঠিতে খেদোক্তি করেছিলেন- "আমি কবি নই, ইস্কুলের পাঠ্যপুস্তকেই আমার কবিতা নাকি স্থান পাবে। আমি কেন? স্বয়ং মাইকেল নাকি কেরানীগিরি করেছেন। মেঘনাদবধে কবির কাজ কিছু নেই ইত্যাদি।" দীর্ঘ সাত দশক কবিশেখর যে ভালবাসায় কাব্যচর্চা করেছিলেন তাতে সমালোচনার বিষদশন স্বভাবতই স্পর্শাতুর কবিপ্রাণকে বিদ্ধ করেছিল। কিন্তু সে আলোচনা এ ক্ষেত্রে অবান্তর, কারণ কবি তাঁর স্বকীয় কাব্যগুণে আজও আমাদের মধ্যে আছেন এবং থাকবেন—এটি আমাদের একান্ত বিশ্বাস!

বাংলা কাব্যসমালোচনার ক্ষেত্রে তিনটি বিশিষ্ট স্তম্ভ আজ আমাদের সামনে দণ্ডায়মান। রবীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল ও কবিশেখর। বুদ্ধদেব, সুধীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দও বর্তমান, তবে তাঁদের আলোচনা সমালোচনা-অপ্রতুল। মোহিতলালের চেয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর আত্যন্তিক আসক্তি বর্তমান। কারণ সমালোচক চরিত্রের সাজাত্যবোধে তাঁর কবিপ্রাণ ঋদ্ধ। উভয়েই মুখ্যত কবি এবং কবিমানসের পাদপ্রদীপে সকল আলোচনার বিচার। মোহিতলালের কবিপ্রাণ সমালোচনার ক্ষেত্রে তাত্ত্বিকচরিত্রকে অতিক্রম করেনি।

কবিশেখরের সমালোচনায় কবিআত্মার স্পর্শলাভ করে আমরা ধন্য হই। তাঁর সমালোচনা শুধুমাত্র কাব্যের জগতের ঘেরাটোপে আবদ্ধ থাকেনি। সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি তাঁর অন্তর্দৃষ্টিকে কাজে লাগিয়েছেন, সেখানে কবিশেখরের প্রজাপতিদৃষ্টিটিকে আমরা লক্ষ্য করি। কাব্যের জগতের তাঁর গতায়াত ব্যাপক, তাঁর অভিজ্ঞতা বিস্তীর্ণ, অনুভব্যতা অতলান্ত, জীবনের শেষপ্রহরেও তাঁর সৃষ্টি অব্যাহত ছিল, সেখানে অর্থনৈতিক তাগিদের কোন খবরদারি ছিল না, ছিল নির্মল কাব্যপ্রেরণা।

'রম্যরচনা' বলে সাহিত্যের যে ক্ষেত্রটি ইদানীংকালে সাহিত্যের জগতে বেশ ব্যাপক অধিকার করে বাজার জেঁকে বসেছে সেখানেও তিনি সিদ্ধ রূপকার। সাহিত্যের বিভিন্ন অঙ্গনে তাঁর অনায়াস পরিক্রমার জন্য তাঁর প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। তাঁর অতিবিস্তীর্ণ সৃষ্টির জগতে (এর মধ্যে তাঁর পাণ্ডুলিপিও যুক্ত) যে বিচিত্র ছন্দের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় তাতে বিস্মিত না হয়ে পারি না। কবিতায় তিনি রূপমুগ্ধ। অবজেকটিভিটির দিকে তাঁর অধিকতর দৌর্বল্য থাকলেও সাবজেকটিভিটিও

তাঁকে কম আকর্ষণ করে না। সাবজেকটিভিটির বাইরে অবজেকটিভিটির রূপবলয় সর্বোপরি যে সোনারকাঠির ছোঁয়াছে কবিতাকে হৃদ্য করে তু'লে শম্বিত সাহিত্যে পরিণত করে সেটি তাঁর কাব্য-কবিতার প্রথম দর্শনেই বোধ্য হয়।

কবিশেখরের লেখায় এক নিরাবরণ, নিরাভরণ সারল্যের সঙ্গে মাধুর্যের মণিকাঞ্চন সংযোগ ঘটেছে, তবে পদাবলী সাহিত্যের রূপ ও ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মহাজনদের জীবনদর্শন যাঁরা অনুসন্ধান করবেন, তাঁদের হতাশ হতেই হবে, কারণ কবি তো সেই অতীতযুগের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে নেই, অতীত সাধনমার্গের সাধকও তিনি নন, তিনি নৈষ্ঠিক গৃহী, কিন্তু তিনি জীবনরসরসিক, তাঁর চরম সার্থকতা এইখানে যে তিনি বৈষ্ণবীয় অপরূপ অলোকসামান্য জগতকে গভীরভাবে ভালবেসেছেন, সৌখীনভাবে নয়, তাঁর নাড়ীর টানে। কিন্তু যুগ যে পৃথক, তাই অন্তরের চরিত্রের রূপ বদল হয়, তবুও বৈষ্ণবভাবপরিমণ্ডলের সঙ্গে তাঁর সহজাত অধিকার ও অন্তরঙ্গ সম্পর্কসূত্রে তাঁর পদাবলীর জগতে পরিভ্রমণ, সেই পরম রসাস্বাদের ভাগ পাঠকদেরও সমানভাবে পরিবেশন করে তিনি মুক্তির নিঃশ্বাস ছেড়েছেন। সর্বক্ষেত্রে তাঁর ভাবোচ্ছ্বাস যে সংযমের কঠিন দুই তটপ্রান্তের মধ্যে আবদ্ধ থেকেছে এমন না হলেও তাঁর ভাবাবেগ কখনও মালিন্যের দ্বারা কলুষিত হয় নি। বাংলাদেশের শতকরা ৯০ভাগ লোকায়ত জীবনের নরনারী তাঁর লেখাতেই পল্লীর সাধারণ, ঘরোয়া, একেবারে আপনজনের কথা শুনেছে, নতুনরূপে আবিষ্কার করেছে নিজেদের। তাই কবিশেখর আমাদের জাতীয়জীবনের কবি একথা বললে হয়ত অত্যুক্তি হবে না। এ অভিধায় কবিশেখরের কবিআত্মার স্বীকৃতি বর্তমান। আমাদের সমাজের ছোটখাট সুখদুঃখ অনুভবের এমন গার্হস্থ্যচিত্র বাংলা সাহিত্যে কেউ লেখেননি এমন কথা বলি না, তবে জনস্রোতের সঙ্গে এমনভাবে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে যেতে কবি কুমুদরঞ্জন ছাড়া আর কাউকে দেখি নি। তবে কুমুদরঞ্জন অপেক্ষা আরও কয়েকধাপ এগিয়েছেন কবিশেখর, সেখানে তিনি দোসরহীন। ক্ষুদ্র অথচ নিটোল অনুভব্যতার মধ্যে কবিত্বের অমৃতস্পর্শ (hem of eternity) যে আছে তা কবিশেখর আবিষ্কার করার জন্য ঐকান্তিক, আর এই জন্যই তিনি স্মরণীয় ও বরণীয়। বর্তমান যুগে মনোবিকলন, রাজনীতি, অবক্ষয় ও যুগধর্মী নগ্নসত্যতার প্রতি আগ্রহী কবিদের দ্বারা এই ক্ষেত্রটি একেবারেই অবহেলিত, অথচ এ যুগটি অপরিসীম সহানুভূতিপ্রার্থী শিল্পীদের দরজায়। জাতীয় জীবন, তাৎকালিক সামাজিক ত্রুটিবিচ্যুতি, তার মূল্যবোধও তাঁর কাব্যে ব্যাপকস্থান অধিকার করে চলেছে। ভারতীয় সংস্কৃতির মাহাত্ম্যকথনে কবিশেখরচিত্ত অনেকসময়েই মুখর হয়েছে।

কবিচিত্তের যে ভিয়েনে কাব্যকবিতার জন্ম, তার খবর সকলের কাছে পৌঁছায় না, না কবির কাছে, না পাঠকের কাছে, অথচ তার খবর জানা না থাকলে কাব্য আস্বাদনে ঘাটতি থেকে যায়। কবিশেখর অসাধারণ মর্মানুভূতির চাবিকাঠি নিয়ে নিজের ও সব কবি, সাহিত্যিকের অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছেন, বিশেষ করে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের হেম-মধু-নবীনের কাব্যাঙ্গনে। অত্যাধুনিক কাব্যজগতে প্রবেশে তাঁর যে অনীহা তা একান্তই স্বাভাবিক, কারণ যে মানসিকতার ঘেরাটোপে তাঁর কবিজীবন 'নির্বাত নিষ্কম্পমিব প্রদীপের মত ধ্যানে নিরত ছিল, যে ভাবনা তাঁর জীবনে গভীর প্রত্যয় বা ধ্রুবপদ হিসেবে অবিচল মূর্তি নিয়েছিল, তাকে সরিয়ে দিয়ে নতুন পথে যাত্রায় তাঁর মন তেমন সায় দেয়নি। সমালোচনার ক্ষেত্রে কবি-সাহিত্যিকের অন্তর্জগতে প্রবেশে তিনি পারতপক্ষে পূর্বসূরীদের কাছ থেকে পাসপোর্ট জোগাড় করেন নি। নিজস্ব কবি-আত্মার প্রদীপালোকে তিনি সকলের অন্দরমহলকে আমাদের দেখিয়েছেন। বিশেষ কোন সমালোচন রীতির তিনি প্রবক্তা নন বটে, কিন্তু তাঁর দুর্লভরসবোধ ও তজ্জাত কথকতা—যেখানে তিনি একক ও অদ্বিতীয়, তাই তিনি ধনী। কাব্যরচনায় তিনি মুখ্যত মধুর শান্তরসের পূজারী, অনুভব্যতায় তিনি রূপকার, ছন্দে তিনি কারুকৃৎ, শব্দপ্রয়োগে তিনি কথাকোবিদ, সমালোচনায় তিনি রসনিষ্ঠ এবং সর্বোপরি সৃষ্টিতে তিনি অকৃত্রিম ও সাবলীল। তাই কবিশেখরের সব্যসাচী চরিত্রের দিকে আমরা শ্রদ্ধাসম্মত দৃষ্টিতে তাকিয়ে হই ধন্য!

কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ কুন্দ প্রকাশিত হলে কবিগুরুর আশীর্বাদ

জোড়াসাঁকো

কল্যানীয়েষু,

এগুলি তোমার কাঁচা বয়সের লেখা—ইহার উপরে অধিক ভরসা রাখিয়ো না—ক্রমে বয়োবৃদ্ধি ও অভ্যাসের সহিত যখন তোমার শক্তি পরিণতি লাভ করিবে তখন বাহিরের সমালোচনায় প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়ো। এখন অনেকদিন পর্যন্ত নিন্দা প্রশংসায় তোমার কোনো উপকার হইবে না। যদি কাব্যরচনায় তোমার অন্তরের অনুরাগ থাকে তবে অন্য কোনো ফললাভের আকাঙ্ক্ষা মনে না রাখিয়া আপাততঃ সেই আনন্দে লিখিতে থাক, পরে সময় উপস্থিত হইলে পাঠকসমাজের সমক্ষে উপস্থিত হইলে সার্থকতা লাভ করিবে। ইতি—২২শে কার্ত্তিক, ১৩১৩

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কুন্দ, কিশলয় ও পর্ণপুট সম্পর্কে সে যুগের অন্যান্য মনীষীদের পত্র

বন্দেমাতরম্

২/১, রামধন মিত্রের লেন
শ্যামপুকুর
কলিকাতা

শুভাশিষ : সন্তু,

আপনার 'কুন্দ' পড়িয়া প্রীত হইয়াছি। আপনার কুন্দ সুরভি ও সুন্দর, শুভ্র ও নির্মল। কতকগুলি কবিতায় আপনি ভাবতেব নব-ভাবের উদ্বোধন কপিয়াছেন। আশাকরি ভবিষ্যতে নবভাবের সহযোগে আপনার পূর্ণ বিকশিত শক্তির পরিচয় পাইব। অন্যশ্রেণীর কবিতায় আপনি যে ক্ষমতার আভাস দিয়াছেন, তাহাও আশাপ্রদ। সাধনাই সিদ্ধির সোপান; আপনি সারস্বতসাধনায় অবহিত ও সিদ্ধ হউন, ইহাই আমার আন্তরিক আশীর্বাদ। ইতি ৩রা কার্ত্তিক ১৩১৫।

শুভাকাঙ্খী

শ্রী সুরেশ সমাজপতি

জোড়াসাঁকো

কল্যাণবরেষু,

তোমার 'পর্ণপুট' পেয়েছি। এর মধ্যে খাঁটি কবিত্বসুধা আছে। পান করে পরিতৃপ্ত হয়েছি। যেমন শব্দের ঝঙ্কাব, তেমনি ভাবের ঝঙ্কার, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের বিচিত্র ও পবিত্রবাণী মাখামাখি ভাবে আছে। কবির কি আশ্চর্য শব্দসম্পদ্! কবিতায় ছন্দের ভিতর ভিতর ছোট ছোট শব্দের সুন্দর অনুপ্রাসে সঙ্গীতের একটা বেশ ঝঙ্কার উঠেছে। আবার যেখানে খাঁটি ঘরকন্নার কথা, সেখানে খাঁটি বাঙ্গলা বড় সুন্দর। ভাষার সঙ্গে ভাবের বেশ মিল আছে। —ইতি ১৮ই ভাদ্র ১৩১৭

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং

শুভাশীর্বাদপূর্বক বিজ্ঞাপন,

'কুন্দ' পাইয়া আপ্যায়িত হইয়াছি। অনেকগুলি কবিতা পড়িয়া দেখিলাম—সবগুলিই ভাল লাগিল। রস, ভাব, ছন্দ, অলঙ্কার, পদবিন্যাস—সকল দিকেই আপনার দৃষ্টি আছে, অতএব আপনি কবিতা রচনায় অধিকারী তাহাতে সন্দেহ নাই। আশীর্বাদ করি আপনি দীর্ঘজীবী এবং যশস্বী হউন।

—শুভমিতি ১৩১৫। ২৮শে কার্ত্তিক

আঃ
শ্রী ইন্দ্রনাথ দেবশর্ম্মণ
গঙ্গাটিকুরী

কবির 'ব্রজবেণু' পাঠান্তে পত্র

সহায়

কলিকাতা
৫।১১।১৬

মমলাস্পদেষু

আমার প্রতিবেশী শ্রীমান্ অনিলের মুখে শুনিলাম, 'ব্রজবেণু' পাইয়াছি কিনা এবং তাহা আমার কেমন লাগিল আপনি জানিতে চাহিয়াছেন। শুনিয়া বড় অপ্রস্তুত হইলাম। কেন না, পুস্তকখানি গ্রীষ্মের ছুটিতে কাশীবাসকালে পাইয়াছিলাম, অথচ এই কয় মাসেও প্রাপ্তি স্বীকার করি নাই। এই শিষ্টাচারের অভাবের জন্য ত্রুটিস্বীকার করিতেছি। এ কয়মাস প্রবন্ধরচনা, পুস্তকমুদ্রণ প্রভৃতি কার্যে একেবারে ডুবিয়া আছি; কাশীবাসকালেও ইহার বিরাম ছিল না। এই ব্যস্ততাবশতঃ যথাসময়ে ও যথানিয়মে প্রাপ্তি স্বীকার করিতে পারি নাই। এখনও পারিতাম না—যদি এইভাবে প্রশ্ন উপস্থাপিত না হইত।

পুস্তকখানি কেমন লাগিয়াছে তাহার অল্পকথায় উত্তর—

'রন্ধ্রে রন্ধ্রে এ পুস্তকে ভক্তিরস পড়ে ঝরি ঝরি'
দরদর ঝরিয়াছে হেথা তাঁর ভক্তিঅশ্রুধারা।

আর পাঠ করিয়া

'এবে শুধু ভাবমগ্ন কাঁদি বার বার
গলে যায় হৃদয়ের শিলা।'

তবে যে অংশে 'শ্যাম মিলে রাধাসনে' তাহাতে আর শিলা গলে না; সে কবির দোষ নহে,

বিষয়েরও দোষ নহে—দোষ বয়সের ও অদৃষ্ট বিড়ম্বনার। এ যেন দ্বিভুজ মুরলীধর আমার চক্ষে লোলরসনা খর্পরকরা শ্মশানবাসিনী শ্যামার মূর্তিতে প্রকট। সেই জন্যই বুঝি আমার অদৃষ্টক্রমে মহিমা-ক্রোরে মহাযাত্রা প্রসঙ্গে পুস্তকখানির আরম্ভ।

যাহা লিখিলাম, ইহা সমালোচনা নহে। ইহা কোথাও উদ্ধৃত করিয়া নিজেকে বিড়ম্বিত করিবেন না। আমার স্বভাব, এক-একখানি বই পড়িলে কেমন একটা ঝোঁক আসে, সেই ঝোঁকে সমালোচনা বাহির হয়। এ ক্ষেত্রে অবস্থার দোষে (পুস্তকের দোষে নহে) সে ঝোঁক আসে নাই, সুতরাং সমালোচনাও আসে নাই।

আশাকরি আপনি কুশলে আছেন

ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রী ললিতকুমার শর্মণ

(বন্দ্যোপাধ্যায়)

কবির 'রচনাদর্শ' সম্পর্কে পত্র

ওঁ

৬৩, সাউথ এণ্ড পার্ক,

২৬শে কার্তিক, ১৩৪২

প্রীতিসম্ভাষণপূর্বক সবিনয় নিবেদন—

আপনার রচনাদর্শ পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। আমি দেখিতে পাইতেছি ইহার রচনায় আপনাকে কত ভাবিতে ও পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। বাঙ্‌লায় এইরূপ অপর পুস্তক আমি দেখি নাই। কেবল ছেলেরাই নহে, যাঁহারা তাহাদিগকে পড়ান তাঁহারাও ইহা হইতে প্রভূত উপকার পাইবেন, ইহাতে আমার বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। যাহাদের জন্য ইহা রচিত, যাহাতে ইহা তাহাদের হাতে পড়ে কর্তৃপক্ষ যদি এইরূপ ব্যবস্থা করেন তবে তাঁহাদের বাস্তবই একটা ভাল কাজ করা হইবে।

আশাকরি আপনি কুশলে আছেন।

ইতি—

আপনার

শ্রী বিধুশেখর ভট্টাচার্য (শাস্ত্রী)

পুঃ 'জ্যোতিশ্চন্দ্র' ও 'জ্যোতিষচন্দ্র' দুইই হইতে পারে। 'হস্তক্ষেপ' ও 'হস্তক্ষেপণ' অর্থও একই। "সুখ, শান্তি ও ঐশ্বর্যভরা' না চলিবার কারণ নাই। সম্বন্ধটা স্পষ্ট দেখিবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটি শব্দের পর 'হাইফেন' দিতে পারা যায়। এইসব খুঁটিনাটি কথা সাক্ষাতে আলোচনা করিতে পারা যায়।

সাহিত্যসম্পর্কে ব্যক্তিগত পত্র

২৯ বৈশাখ ৩৫
রমণা, ঢাকা

প্রিয়বরেষু—

ভাই কালিদাস, তোমার প্রেরিত সাহিত্যালোচনাগুলি পেয়ে প্রীত উপকৃত বিস্মিত ও দুঃখিতও হলাম। এই মননশীলতা ও পাণ্ডিত্য থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও আমরা কতো উপকৃত হ'তে পারতাম! সত্যসুন্দর দাস কেবল কয়েকটা প্রবন্ধের জোরে সস্তায় কিস্তিমাৎ ক'রে দিলে। তুমি কেবল কবিতাই লিখলে, তোমার মনীষার এ দিকটার পরিচয় তুমি কাউকে দিলে না। এই ইউনিভার্সিটি যখন বাংলার প্রশ্নকর্তা খুঁজে পাচ্ছিলো না, তখন আমিই তোমার ও মোহিতের নাম প্রস্তাব করি এবং তোমাদের দুজনেরই প্রশ্ন দেখে আমার প্রস্তাবের জন্য আমি সুখী হয়েছি। কিন্তু ভাই, তোমাকে কাছে পেলে তোমার সঙ্গে সাহিত্য আলোচনায় বৃদ্ধ বকেয়া আমি নবজীবন লাভ করতাম। বন্ধু সত্যেন্দ্রকে হারিয়ে জীবন্মৃত জড়বুদ্ধি হয়ে আছি। তুমি মাঝে মাঝে সাহিত্য রসসিঞ্চনে আমার জরাজীর্ণ অন্তরকে তাজা করে রাখলে উপকৃত হবো। তোমার লেখাগুলি আমি কপি ক'রে নিয়ে ফেরত পাঠাবো। যদি সময় পাও রবীন্দ্রনাথের Constructive genius সম্বন্ধে তোমার further বক্তব্যগুলিও লিখে পাঠিয়ো।

তোমার গুণমুগ্ধ শুভাকাঙ্ক্ষী

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়

টেলিফোন সাউথ ২৩২
১২, বকুলবাগান রোড, কলিকাতা
১৭।৩।৫২

শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় কবিশেখর

শ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার দুইখানি কবিতা সংকলন পুস্তক পাইয়া সুখী হইলাম। এই উপহারের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

বর্ণান্ধ লোক অনেক আছে, সেইরূপ গণিতান্ধ, সংগীতান্ধ ও কাব্যান্ধ লোকও আছে। স্বভাব-দোষে আমি শেষোক্ত শ্রেণীর একজন, অনেক কবিতা, বিশেষতঃ অতি আধুনিক কবিতা বুঝিতে পারি না। কিন্তু অন্ধ হইলেও কবিবিশেষের রচনা বুঝিতে পারি, পড়িতে ভালও লাগে। আপনি সেই বিশিষ্ট কবিগণের অন্যতম, আমার বুদ্ধিতে বর্তমান কবিগণের শীর্ষস্থানীয়, আপনার কবিশেখর উপাধি সার্থক। আপনার প্রবন্ধও আমি সাগ্রহে পড়ি, এবং ভাবি, আপনি আরও লেখেন না কেন।

আপনার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

বিনীত
রাজশেখর বসু

রসচক্রের সম্পাদককে রসচক্রের সভাপতি শরৎচন্দ্রের পত্র

সামতাবেড়, পানিত্রাস
জেলা, হাওড়া

কল্যাণীয়েষু,

ভাই কালিদাস, তোমার চিঠি পেলাম, আমার একটা দুর্নাম আছে যে আমি জবাব দিইনে। নেহাৎ মিথ্যে বলতে পারিনে, কিন্তু যে বিশেষটি নিয়ে তুমি নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছো তারও যদি সাড়া না দিই তা শুধু যে অসৌজন্যের অপরাধ হবে তাই নয় কোন দিক থেকেই যে যতীনকে সমাদর করবার অংশ নিতে পারলাম না সে দুঃখের অবধি থাকবে না। অনেকেই জানে না যে যতীনকে আমি সত্যিই ভালোবাসি। শুধু কেবল কবি বলে নয়, তাঁর ভেতরে এমনি একটি স্নেহ-সরস বন্ধু-বৎসল ভদ্রমন আছে যে তার স্পর্শে নিজের মনটাও তৃপ্তিতে ভরে আসে।

যতীন জানেন আমি তাঁর কবিতার একান্ত অনুরাগী। যখন যেখানেই তাদের লেখাপাই বারবার ক'রে পড়ি। স্নিগ্ধ সকরুণ নিখুঁত ছন্দগুলি কানে কানে যেন কত কি বলতে থাকে।

কারও সম্বন্ধেই নিজের অভিমত আমি সহজে প্রকাশ করিনে—আমার সঙ্কোচ বোধ হয়। ভাবি, আমার মতামতের মূল্যই বা কি, কিন্তু যদি কখনো বলতেই হয় তো সত্যি কথাই বলি। যতীনকে স্নেহ করি, কিন্তু স্নেহের অতিশয়োক্তি দিয়ে তাঁকেও খুশি করতে পারতাম না সত্যি না হলে। যাক্ এ কথা।

তোমাদের অনুষ্ঠানটি ছোট, হবেই তো ছোট। কিন্তু তাই বলে তার দামটি ছোট নয়। এ তো ঢ্যাঁট্রা দিয়ে বহুলোক ডেকে এনে উচ্চ কোলাহলে 'জয়, যতীন বাগচী কি জয়।' বলার ব্যাপার নয়, এ তোমাদের ছোট্ট রসচক্রের প্রীতিসম্মিলন। অর্থাৎ, কোন একটি বিশেষ দিনে ও বিশেষ স্থানে জন-কয়েক সত্যিকার সাহিত্যরসিক ও সাহিত্যসেবী একসঙ্গে মিলে আর একজন সত্যিকার সাহিত্যসেবককে সাদরে আহ্বান ক'রে এনে বলা, কবি, আমরা তোমার সাহিত্যসাধনায় আনন্দ লাভ করেছি, তোমার বাণীপূজা সার্থক হয়েছে, তুমি সুখী হও, তুমি দীর্ঘায়ু হও. আমরা তোমাকে সর্বান্তকরণে ধন্যবাদ দিই,—তুমি আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ কর। এই তো? আয়োজন সামান্য বলে তোমরা ক্ষুণ্ণ হয়ো না।

কিন্তু তবুও সম্মিলনে একটুখানি ত্রুটি ঘটলো, আমি যেতে পারলাম না। কারণ, আমি বোধকরি তোমাদের সকলের চেয়ে বয়সে বড়।

এ অঞ্চলটায় ব্যারাম-স্যারাম নেই, কিন্তু হঠাৎ কোথা থেকে হতভাগা ডেঙ্গু এসে জুটেছে। সকাল থেকে ছোট ছেলেমেয়ে দুটির চোখ ছলছল করছে, চাকরদের জন দুই ছাড়া সবাই বিছানা নিয়েছে। আমার এক নাক বন্ধ, অন্যটায় টিউবওয়েলের লীলা সুরু হয়েছে, রাত্রি নাগাদ বোধ হয় স্নেহ-মন-প্রাণ উৎসবে যোগ দেবেন আভাসে-ইসারায় তার খবর পৌঁছোচ্চে। নইলে, এ অনুষ্ঠানে আমার নামে তোমাকে গরহাজিরির ঢ্যারা টানতে দিতাম না।

অনেকে উপস্থিত আছো, এই সুযোগে একটা দুঃখের অনুযোগ জানাই। কালিদাস, তুমিও তো প্রায় সাবালক হতে চললে। আগেকার দিনের সকল কথা তোমার স্মরণে না থাকলেও কিছু কিছু হয়তো মনেও পড়বে। এদিনের মতো সেদিনে আমরা এমন করে পরস্পরের ছিদ্র খুঁজে বেড়াতাম না। এক আধটা ব্যতিক্রম হয়ত ঘটেচে, কিন্তু এখনকার সঙ্গে তার তুলনাই হয় না। সাহিত্যসেবকদের মাঝখানে ভাবের আদান-প্রদান, একের কাছে অপরের দেওয়া এবং পাওয়া চিরদিন চলে আসচে এবং চিরদিনই চলবে। কিন্তু তরুণ দলের মধ্যে আজকাল এ কি হতে চললো? নিন্দে করার এ কি উদ্দাম উৎসাহ, গ্লানিপ্রচারের এ কি নির্দয় অধ্যবসায়! কেবলি একজন আর একজনকে চোর প্রতিপন্ন করতে চায়। খবরের কাগজে কাগজে যত দেখি ততই যেন মন লজ্জায় দুঃখে পরিপূর্ণ হয়ে আসে। ক্ষমা নেই, ধৈর্য নেই, বেদনা-বোধ নেই, হানাহানি। নিষ্ঠুরতার যেন শেষ হতেই চায় না। কোথায় কার সঙ্গে কার কতটুকু মিলেচে, কার লেখা থেকে কে কতখানি নকল করেচে, রুক্ষ কটু কণ্ঠে এই খবরটা বিশ্বের দরবারে ঘোষণা করে যে এরা কি সান্ত্বনা অনুভব করে আমি ভেবেই পাইনে। ঘরে বাইরে কেবলি জানাতে চায় যে বাঙলা দেশের সাহিত্যিকদের বিদেশের চুরি করা ছাড়া আর কোন সম্বলই নেই।

যতীনকে জিজ্ঞেসা করলেই জানতে পারবে অতি পরিশ্রমে খুঁজে খুঁজে এই গোয়েন্দাগিরির কাজটা তখনও আমাদের সাহিত্যিক মহলে প্রচলিত হয়ে ওঠেনি। যাই হোক্‌, কামনা করি তোমাদের রসচক্রের রসিকদের মধ্যে যেন এ ব্যাধি কখনো প্রবেশ করবার দরজা খুঁজে না পায়।

কবি নই, মনের মধ্যে কথা জমে উঠলেও তোমাদের মত প্রকাশের ভাষা খুঁজে পাইনে, গুছিয়ে বলা হয় না। তাই চিঠি লেখা হয়ে যায় আমার চিরদিনই এলোমেলো।

তা হোকগে এলোমেলো। তবু এমনি করেই বলি, তোমাদের রসচক্রের জয় হোক্‌, তোমাদের আজকের আয়োজন সফল হোক্‌। যতীনকে বোলো শরৎদা তাঁকে এই চিঠির মারফৎ স্নেহাশীর্বাদ পাঠিয়েছেন।

—ইতি ৫ই ভাদ্র ১৩৩৮

শরৎদা

অগ্রজ কবির আশীর্বাদ

শ্রীহরি

কোগ্রাম

৩।১০।৫৯

কল্যাণবরেষু,

অনেকদিন লিখি নাই। তোমার সেই সুন্দর কোগ্রাম কবিতাটি ছাপাইয়া মেলায় বিলি করা হইতেছে। দামোদর প্রেসে ছাপিতে দেওয়া হয়। তাঁহারা কোনো মূল্য না লইযাই ছাপিয়া দিয়াছেন। গ্রামের সকল লোকে আশীর্বাদ করিতেছে। দুকপি পাঠালেম, বহু দেখা সত্ত্বেও একটি ভুল রহিয়া গিয়াছে।

দীর্ঘজীবী হও সুখী হও আরও যশস্বী হও। আমি একরকম আছি।

আঃ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

বাল্যবন্ধু সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পত্র

।। ওম্ ।।

ভাই কবি

তোমার চিঠির উপযুক্ত উত্তর দিতে পারি এ ক্ষমতা আমার নেই। আমার চিঠির উত্তরে তোমার চিঠি—এ যেন 'শুকুতার বদলে মুকুতা।' ভাই, তুমি আমাকে যথার্থ স্নেহ কর তা' আমি জানি। আমি তোমার সরল অকপট হৃদয়কে কতকটা বুঝতে পেরেছি বলে বিশ্বাস করি, তা' না হলে' তোমার কবিতা দুটা গরীবকে ঠাট্টা করবার জন্য লেখা হয়েছে মনে করতুম।

আমার কবিত্বশক্তি নেই বলে কি তোমাদের এই প্রিভিলেজটা, কবিতার বিষয় নির্বাচনেও এমনি করে' abuse করতে হয়? আমার নিজের কথা ভালো করে express করবার কৃতিত্ব নেই, তবে যখন আমি তোমাদের মত বন্ধুর কথা ভাবি—আমি এটা lover's language এ বলছি—সত্যি সত্যিই আমার 'বুক ভরে ওঠে'। কবিপ্রিয়ার পক্ষে তাঁর 'আপনার হতে প্রিয়' কবিবরকে ভালোবাসা যে কত সহজ ও সুখের, তা' কবির এই নীরসপ্রকৃতি বন্ধু নিজের মনের ভাব থেকেই অনায়াসে বুঝতে পাচ্ছে।

তোমার ঝগড়ার খেলা কি এখনও চলছে? যাঁরা একেবারে নিকটতম, একেবারে হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে বিরাজ করেন, বোধহয় তাঁদের কাছে আত্মপরিচয় সব সময়ে হয়ে উঠে না। কবির কথায় তাঁরা আপনার রাজ্যের সীমা জানেন না, বা জানতে চান না, তথাপিও তাঁরা নিজের গৌরবে রাজত্ব করেন। গ্রহের বা নক্ষত্রের অধিবাসীর কাছে, সেই অধ্যুষিত গ্রহ বা নক্ষত্র যে জ্যোতির্ময় হয়ে আকাশ উজ্জ্বল কচ্ছে, এটা সব সময়ে উপলব্ধ হয় না। কবিপ্রিয়া যে কবিতার উপর বীতশ্রদ্ধ হচ্ছেন, সেটা বোধহয় আশ্চর্য্যের বিষয় না। কবি, তোমার মূর্তিমতী মানসীদেবী নিশ্চয়ই কাব্যসুধাপানে মুগ্ধ হৃদয় তোমার দেশবাসীর উপহৃত প্রীতিমালিকা গ্রহণ করে তোমার গৃহে একসঙ্গে লক্ষ্মীর সাথে সরস্বতীকেও বন্ধন করবেন, সন্দেহ নেই।

তুমি কি ছুটীর মধ্যে নতুন কিছু কবিতা লিখেছ? আচ্ছা, অমিত্রাক্ষর ছন্দে তোমার কোনও sustained রচনা আছে কি? আজকাল heroic কিছু লিখতে গেলে, ছন্দের দিকে, আমার বোধহয় মাইকেলের পদাঙ্ক অনুসরণ ছাড়া পথ নেই। সত্যেনবাবুর আগমনীর ছন্দটা কি রকম? আমার ত খুব সুন্দর লাগে। আমি একটা প্রাচীন জর্মান বীরগাথার উপাখ্যান পড়লুম—অনেক আগেই পড়েছিলুম, এখন anglo-saxon সাহিত্যের ইতিহাস পড়তে পড়তে আবার দেখতে হয়েছিল-গল্পটা আমার ভারী চমৎকার লেগেছে, অবশ্য এর ভিতর খুব deep অর্থ কিছু আছে আমার বোধহয় না, কিন্তু এটা romance pure and simple এর theme টা নিয়ে পরিবর্তন করে বাদ দিয়ে আবশ্যকমত যোগ করে, প্রাচীন ভারতের ঐতিহাসিক রঙ দিয়ে একটা dramatic বা narative কবিতা লিখলে ভারী চমৎকার হবে বোধহয়। এই সব গল্পগুলির, প্রাচীন জাতির মধ্যে প্রচলিত কাহিনীসুলভ এমন একটা গাম্ভীর্য, freshness, একটা সরল সবলতা আছে যা, বাঙলা ভাষায় transfer করতে পারলে

বেশ হয়। এতে তোমার মত কবির প্রতিভাকে full play দিতে পারা যায় এরকম situation খুব পাওয়া যাবে। পরীক্ষার ঝঞ্ঝাট চুকে' যাক, how would I like to see my friend handle grand theme and excel in their treatment. I তুমি কলকাতায় এলে বইটা তোমায় পড়তে দেব।

আমার ইচ্ছা হয় বাঙলায় একটু ভালো করে যাতে লিখতে পারি। নিজের যা' যা' ভালো লাগে তা' আংশিক ভাবেও প্রকাশ করবার ক্ষমতা পেলেই আমি যথেষ্ট মনে করি। তোমার সঙ্গে বেড়িয়ে contact এর গুণে যদি বাঙলাটা একটু শিখতে পারা যায়।

তোমার কলেজ ত খুলে এলো। আমার তবুও দিন কতক আরো ছুটী আছে। তোমার অধ্যাপকেরা বাস্তবিকই নিষ্ঠুর।

তুমি ফিরে এলে Instituteএ দেখা হবে। এখন au Revoir

তোমারই সুনীতি

পুনশ্চ—তোমার প্রেরিত কবিতায় "যূথিকার শাখী" আর কি কি দেখেছি। একটা ভালো simile-কে কি বেওয়ারিস জিনিসের মত যেখানে সেখানে অপব্যবহার করা উচিত? তোমার 'বালিকা বধু'তেও jasmine Simileর প্রয়োগ করেছ। বন্ধু।

মা:রা ন মীবরাজদ্ বা রসেলৎ আশ্‌নাঈ:
বুলবুল্ নকুতর আজ মন্ বায়দ্ হম্ আশিয়ানৎ।
"আমি তোমার সখ্যের বন্ধনে বদ্ধ হবার যোগ্য নই; তোমার নীড়ের বিহঙ্গ নিশ্চয়ই আমার চেয়ে [তোমার muse এর দ্বারা aletrated হবার জন্য] যোগ্যতর।"

শেখসাদীর কবিতা-এ caseএ apply করবার একটা nonsensical attempt করা গেল। আর pedantic হলেও 'মূল' ফারসীটা তোমার উপর inflict করবার লোভটা ছাড়তে পারলুম না।

কলকাতা, ২৯শে ডিসেম্বর ১৯১২

তাহলে তোমার সঙ্গে next year-এ দেখা হচ্ছে।

অগ্রজ সাহিত্যিকের পত্র

"মানসী ও মর্মবাণী কার্য্যালয়,
১৪এ, রামতনু বসুর লেন, সিমলা পোঃ, কলিকাতা
৪।৭।১৯

ভাই কালিদাস,

তোমার আর কোনও কবিতা আমাদের কাছে নাই। ২।৩ মাস তোমার কবিতা মানসীতে যায় নাই। অতএব শীঘ্র গুটি কয়েক পাঠাইলে ভাল হয়।

আমরা ভাল আছি। তোমাদের কুশল সংবাদে সুখী করিবে।

ভবদীয়
শ্রী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

অগ্রজ সাহিত্যিকের কাছে অনুজ সাহিত্যিকদের পত্র

কল্লোল

৪ বৈশাখ, ৩৫

সন্ধ্যা

শ্রীচরণকমলেষু,

কালিদা ! এইমাত্র সুবোধের কাছে শুনলাম, আপনি আমার ওপর রাগ করেছেন। আমায় নাকি বই এবং পত্রও দিয়েছেন। অবশ্য কোন ঠিকানায় দিয়েছেন আপনিই জানেন। কৃষ্ণনগরের ঠিকানায় নিশ্চয়ই দেননি, তাহলে নিশ্চয় পেতুম।—সবারই সঙ্গে দেখা হয় কোথাও না কোথাও, শুধু আপনাকেই পাওয়া যায় না। একেবারে হেডমাষ্টারির চেয়ারে আড়াল পড়েছেন। আগামী রবিবার সন্ধ্যায় যাচ্ছি। থাকবেন যেন। নৈলে বাড়ীতে লঙ্কাকাণ্ড ক'রে আস্ব—। আপনার 'সীতারাম কুটীর' রাবণের লঙ্কা হয়ে উঠবে। আমার গজলের ন্যাজ নিয়ে খুব বড একটা "লিপ" দিয়েছি। গেলেই দেখতে পাবেন। সশ্রদ্ধ প্রণাম নিন।

ইতি—

প্রণত

নজরুল

কবি কালিদাস রায় শ্রীচরণেষু
"সীতারাম কুটীর"
P—159 B
P. O. Kalighat
(Local)

Sarat Babu's Bunglow
Dahigora
Ghatsila P.O.
(Singbhum) B.N.Rly.
24.11.48.

শ্রদ্ধাভাজনেষু,

দাদা, ৺বিজয়ার প্রণাম নেবেন। এবার কলকাতায় গিয়ে গজেনবাবুর মুখে শুনলাম আপনি বাতে শয্যাগত। কথাটা কিছু অতিরঞ্জিত বলেই আমার মনে হোল। দেখতে যাবার ইচ্ছে থাকলেও সময়াভাবে পারিনি। প্রমথ ও আমি একই পাড়ায় আছি। এখন বেলা ১০টা। মাঠের মধ্যে একটা হর্তুকীতলার ছায়ায় বসে আমরা দুজনে বনভ্রমণের মতলব আঁটচি। কতদূর হয়ে ওঠে বলতে পারিনে।

চিঠির উত্তরে জানাবেন আপনার শরীর কেমন। আপনার কথা খুব মনে হয় এবং দেখতে ইচ্ছে করে।

ইতি

প্রীতিমুগ্ধ

শ্রী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

দারভাঙ্গা

৩০-৬-৫৬

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,

দাদা, আমার আশীর্বাদের ভাগ্যটা ভালো, দেখেছি প্রণাম পায়ে পৌঁছবার আগেই মা'র হস্তটা আশীর্বাদে উঁচু হয়ে উঠত, ওষ্ঠাধরে নীরব চাঞ্চল্য উঠত। কথাটা মনে পড়ে গেল আপনার চিঠি পেয়ে "বিশেষ সংখ্যা" টা সদ্য পড়ে আমি প্রণাম জানাবার জন্য প্রস্তুতই হচ্ছিলাম। এমন সময় আপনার আশীর্বাদলিপি। মনে আছে গত শারদীয়া আশীর্বাদও এই রীতিতেই পৌঁছেছিল। অন্তরে কতখানি জায়গা দিয়েছেন দেখে অভিভূত হয়ে পড়ি। ..

আপনার পদ্যটিতে আসা যাক। বলাবাহুল্য আমি পাতা খুলেই যাঁদের নাম দেখে তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে যাই তাঁদের মধ্যে আপনি ছিলেন একেবারেই সামনের দলে। পদ্যটা পড়ে আমি যে কতটা কৃতার্থম্মন্য এই বলে উঠতে পারি না। পদ্যটা যে এত অন্তরস্পর্শী হয়েছে তার কারণ আপনার চিঠি পেয়ে বুঝতে পারলাম। আপনি গোড়াতেই মনে একটা বেদনাবোধ নিয়ে শুরু করেন যে—"বিভূতির জন্যে কিছু করা হোল না," মনস্তত্ত্বে এটাকেও কি Complex বলে?—যাই হোক, এই বেদনাবোধই আপনার কবিতাটিকে এত সুন্দর মধুর করে তুলেছে—আমার কাছে তো বটেই। ছোট পদ্যটিতে আপনি আমায় আর সবার থেকে যেন নিজ অধিকারে আলাদা করে নিয়ে আলিঙ্গনবদ্ধ ক'রে নিলেন, এ যে অমূল্য।

আপনার অসুস্থতার কথায় নিরতিশয় উদ্বিগ্ন রইলাম, খানিকটা আশ্বস্ত হয়েছেন জেনেও।

শ্রদ্ধানত হয়ে প্রণাম জানাই

অনুগত

শ্রী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

ভাগলপুর

১০।১২।৪৪

পরম শ্রদ্ধাভাজনেষু,

আপনার চিঠি পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। আপনাদের মতো কৃতী যশস্বী বাণীসেবকের প্রশংসালাভ করা ভাগ্যের কথা। ভবিষ্যতে যদি কখনও চিঠি লেখেন 'শ্রদ্ধাস্পদেষু' লিখবেন না, সঙ্কোচ হয়। আপনি সব বিষয়েই আমার চেয়ে অনেক বড়। আমরা যখন স্কুলে পড়তাম তখনই আপনার পর্ণপুটের কবিতা কণ্ঠস্থ করেছি এবং আজও তা ভুলিনি।

আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

ইতি—

প্রণত

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

আমাদের কথা

কবিশেখর কালিদাস রায় বাঙালীর কাছে একটি অত্যন্ত পরিচিত নাম, বাংলার সাহিত্য-গগনে উজ্জ্বল নক্ষত্রবিশেষ। কবিশেখর ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। একাধারে তিনি ছিলেন কবি, সাহিত্যিক, পণ্ডিত, প্রাবন্ধিক, ছান্দসিক, বৈয়াকরণ, সাহিত্যসমালোচক, শিক্ষাব্রতী ও ভাষাতত্ত্ববিদ। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় পরিচয় ছিল আদর্শ শিক্ষকরূপে। স্বল্পবয়সেই তিনি শিক্ষকব্রত গ্রহণ করেছিলেন এবং জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত তার ছেদ ঘটাতে দেন নি। তবে শেষ বয়সে তিনি আর ছাত্রগঠনকারী শিক্ষক ছিলেন না, লোকশিক্ষক রূপে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল। জাতির চরিত্রগঠনে তিনি তাঁর লেখনীকে অবিরত ব্রতী রেখেছিলেন। দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের শিক্ষকতা কালে তিনি অসংখ্য কৃতী ছাত্র তৈরী করেছেন, যাঁরা উত্তরজীবনে দেশের বিশিষ্ট নাগরিক হিসাবে সম্মানিত হয়েছেন।

কিন্তু আক্ষেপ ও ক্ষোভের বিষয় তাঁর মৃত্যুর (২৫শে অক্টোবর ১৯৭৫) প্রায় পাঁচ বছর হতে চলল অথচ তাঁর স্মৃতিরক্ষার ব্যাপারে কোন সাহিত্যিক বা সাহিত্যিকগোষ্ঠী অথবা তাঁর কৃতী ছাত্রগণ অথবা সরকার কেউই এগিয়ে এলেন না। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হল না, তাঁর লেখাগুলি সঙ্কলিত হল না, তাঁর অপ্রকাশিত মূল্যবান রচনাবলী লোকচক্ষুর অগোচরেই রয়ে গেল। তাঁর সারা জীবনের সাধনা কাব্য, মননশীল প্রবন্ধ, চিন্তাগর্ভ ব্যাকরণ ও অভিধান, ছাত্রব্রতে নিরত পাঠ্যপুস্তক সবই আজ বিলুপ্তির পথে। অবিলম্বে সেগুলি প্রকাশ ও প্রচার প্রয়োজন।

আমরা তাই বিশিষ্ট কতিপয় ব্যক্তি নিয়ে কবির পুণ্যস্মৃতি রক্ষার্থে 'কবিশেখর কালিদাস রায় স্মৃতিরক্ষা কমিটি' নামে একটি সংস্থা গঠন করেছি। কবিশেখরের স্মৃতিরক্ষার প্রথম পদক্ষেপ রূপে 'কবিশেখর—সঙ্গ ও প্রসঙ্গ' নামে একটি স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করা হল। এতে কবিশেখরের উপর বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের অমূল্য লেখা স্থান পেয়েছে। এই গ্রন্থটি পড়লে আমাদের প্রিয় কবির দীর্ঘ সাহিত্যজীবনের ও সেই সঙ্গে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ও বহুমুখী প্রতিভার অপূর্ব পরিচয় পাওয়া যাবে। সেই সঙ্গে অবিস্মরণীয় সেই মানুষটির একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় প্রকাশিত হবে।

এর পরের পদক্ষেপ হিসাবে আমরা কয়েকটি কর্মসূচী গ্রহণ করেছি। আমাদের মতো সামান্য কয়েকজনার পক্ষে এই সকল কর্মসূচী সফল করা সম্ভব নয়। তাই সকল সুধীজনের কাছে, আমাদের জনপ্রিয় সরকারের কাছে, কবিশেখরের অসংখ্য গুণমুগ্ধ ব্যক্তি ও কৃতী ছাত্রদের কাছে, আমাদের একান্ত আবেদন এই সকল কর্মসূচীকে বাস্তবে রূপায়িত করতে এগিয়ে আসুন ও তাঁর স্মৃতিরক্ষাসূত্রে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির সেবা করুন। সংস্থার পক্ষে যে সকল কর্মসূচী আমরা গ্রহণ করেছি তা নিম্নে বর্ণিত হল —

(১) কবিশেখরের বাসভবনের সামনের পথটিকে কবির নামে নামাঙ্কিত করা ও কোন উপযুক্ত স্থানে কবির একটি আবক্ষ মূর্তি স্থাপন করা।

(২) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কবিশেখরের নামে একটি 'অধ্যাপক পদ' প্রবর্তন করা।

(৩) কবির সমগ্র রচনাবলী গ্রন্থাকারে সত্বর প্রকাশ করা।

(৪) কবির জন্মস্থান বর্ধমানের কড়ুই গ্রামে একটি স্মৃতিফলক স্থাপন করা ও কাটোয়া থেকে কড়ুই পর্যন্ত যে নতুন রাস্তা হচ্ছে তা কবিশেখরের নামাঙ্কিত করা।

(৫) কড়ুই গ্রামে কবিশেখরের নামে একটি আঞ্চলিক পাঠাগার ও অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা।

(৬) কবির রচিত বইগুলি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বিদ্যালয়ে পাঠ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা।

(৭) গরীব ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করার জন্য একটি পাঠ্যপুস্তক গ্রন্থাগার স্থাপন।

(৮) প্রতি বছর একবার করে কবির স্মরণে একটি সাহিত্য সম্মেলনের আয়োজন করা।

(৯) প্রতি বছর কবির জন্মদিনে দেশের সমাজ শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে 'কবিশেখর স্মৃতি পদক' প্রদান।

(১০) সরকারের আনুকূল্যে কবির জীবনী নিয়ে একটি 'তথ্যচিত্র' নির্মাণ।

বিমলকুমার ভট্টাচার্য

কবিশেখর কালিদাস রায় স্মৃতিরক্ষা কমিটির পক্ষে

৭ই আষাঢ় কবিশেখরের পুণ্য জন্মদিনে

আমাদের অন্তরের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই

কবিশেখর কালিদাস রায় স্মৃতিরক্ষা কমিটি

১০/১৩, চারু এভিনিউ, কলিকাতা-৩৩

ফোন : ৪৬-৬৯১০

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

- এই গ্রন্থের লেখক ও লেখিকাগণ।
- বিজ্ঞাপন দাতাগণ।
- কথাসাহিত্য ও বিভিন্ন পত্রপত্রিকা।
- প্রচ্ছদপট—শ্রীভূনাথ মুখোপাধ্যায়।
- শ্রীভূবণ ভট্টাচার্য
- শ্রীপ্রতুল চন্দ্র ঘোষ
- অধ্যাপক তরুণ রায়
- শ্রীদেবব্রত বসু
- শ্রীপ্রশান্ত কুমার বিষ্ণু
- শ্রীশিবকুমার গুহ
- শ্রীবিমল কুমার ভট্টাচার্য
- শ্রীতপন কুমার মুখার্জী
- শ্রীএস. ডি. ব্যানার্জী


বঙ্গ লিপি
বঙ্গ লিপি

কবিশেখর

লহ

প্রণাম

আশোক প্রকাশন
এ-৬২, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

কবিশেখর কালিদাস রায়ের
রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত কাব্য

পূর্ণাহুতি

—পাঁচটাকা—

বিশ্ববাণী প্রকাশনী
৭৯/৯ বি মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০০০৯

"বিধির সৃষ্টি কভু সুন্দর কভু সুন্দর নয়,
তোমার সৃষ্টি চিরসুন্দর পরমানন্দময়



ইণ্ডিয়ান বুক কনসার্ণ
৩, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৯